গবর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া

আইনের ষড়বিংশ

ধারা অনুযায়ী

পার্লামেণ্ট মহাসভার

সমক্ষে প্রদত্ত

হইবার জন্য

উনবিংশ শত উনবিংশ

অব্দে ভারতবর্ষের অবস্থা

সম্বন্ধে মিষ্টার এল্, এফ্

রসব্রুক উইলিয়মস্ প্রণীত

রিপোর্টের

বাঙ্গালা অনুবাদ।

বিষয়				পৃষ্ঠা
পূর্ব্বাভাষ	...	...	...	১
		প্রথম পরিচ্ছেদ।		
ভারতের বৈদেশিক সম্বন্ধ	...	...	...	৩
		দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		
অন্তর্দেশীয় রাজনীতি	...	...	...	২৫
		তৃতীয় পরিচ্ছেদ		
ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা	...	...	...	৬১
		চতুর্থ পরিচ্ছেদ		
উন্নতির ভিত্তি	...	...	...	৯৮
		পঞ্চম পরিচ্ছেদ		
রাজা ও প্রজা	...	...	...	১৪২
		ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ		
শাসন সংস্কার বিধি	...	...	...	১৬৪

চিত্র সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। মহামান্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ	২
২। আমাদিগের ভাবী সম্রাট যুবরাজ প্রিন্স অফ ওএল্‌স্	৫৮
৩। রাজপুত্র, সম্রাটের পিতৃব্য ডিউক অফ্ কনট্	১৮৭
৪। ভারতে সম্রাটের প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরাল লর্ড চেমস্‌ফোর্ড	৩০
৫। আফগানিস্থানের পরলোক গত আমীর হাবিবুল্লা খাঁ।	১১
৬। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ	১৬০

প্রথম স্তবক উপবিষ্ট (বাম হইতে দক্ষিণ)—স্যার দীনসা ওয়াচা; রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর; খাঁ বাহাদুর মীর আসদ-আলী; মিঃ ডব্‌লিউ, এম, হেলী; স্যার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট; স্যার ক্লড্ হিল; এচ্, ই, দি কমাণ্ডার-ইন্-চিফ; এচ্ ই দি ভাইসরয়, স্যার জর্জ্জ লাউণ্ডস্, স্যার জর্জ্জ বারন্স; মিঃ মহম্মদ সফি; মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি; মহারাজা স্যার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী; স্যার গঙ্গাধর চিৎনবীশ; স্যার ট্মাস হলাণ্ড,

দ্বিতীয় স্তবক দণ্ডায়মান)—মিঃ বি, সি, এলেন; স্যার জলফিকার আলী খাঁ; মং বা টু; রাজা স্যার রামপাল সিংহ, মেজর মালিক্ স্যার উমার হায়েত খাঁ; মিঃ এচ্, সার্প; স্যার জন উড; মেজর জেনেরাল্ স্যার এলফ্রেড বিংলি; স্যার উইলিয়ম্ মারীস্; স্যার আর্থার এণ্ডারসন্; কণিকার রাজা; মিঃ সি, এ, ব্যারণ; মিঃ আর, এ, ম্যাণ্ট; মিঃ ই, বর্ডন;

তৃতীয় স্তবক—মিঃ এচ্, মনক্রিফ স্মিথ; মিঃ বি, এন, শর্ম্মা; মিঃ ডব্‌লিউ, ই, ক্রম; মিঃ কে, ভি, আর, আয়াঙ্গার; মিঃ এ এচ্, লি; মেজর জেনেরাল্ স্যার সিড্‌নি ক্রুক শ্যাঙ্ক্; নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী; মিঃ এন্, এফ্, প্যাটন্; রায় সাহেব শেঠ নাথ মল্; মিঃ এচ, আর, সি, ডব্‌স্; মেজর জেনেরাল ডব্লিউ, আর, এডওয়ার্ডস্; মিঃ জি, আর, ক্লার্ক; মিঃ এচ্, ম্যাকফারশন্; মিঃ এ, পি, মডিমান।

পশ্চাৎ স্তবক—মিঃ এন্, ই, মার্জ্জব্যাঙ্কস্, মিঃ কে, ভি, রেডি, মিঃ ললিত মোহন চাটার্জ্জি; মিঃ ই, এম, কুক; মিঃ কে, সি, দে; মিঃ এল এফ মর্সহেড; মিঃ জি, এফ, এস, ক্রিষ্টি; মিঃ জি, এস, খপার্দে; মিঃ এ, ই, নেলসন; খাঁ সাহেব সাহ নওয়াজ ভাটু; হাজি চৌধুরী মহম্মদ ইসমায়েল খাঁ; মিঃ পি, জে, জি, পিপন্; মিঃ সি, এ, কিঙ্কেড; মিঃ সি এফ, ডিলাফস; মিঃ ভি, জে, প্যাটেল; মিঃ এচ, এ, ক্যাসন্।

নির্ঘণ্ট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈদেশিক সম্বন্ধ।

ভারতবর্ষ ও বৃটিশ সাধারণ-তন্ত্র, রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন, উনবিংশ শত সপ্তদশবর্ষের বিংশতি আগষ্টের ঘোষণা, পরিবর্ত্তনের গুরুত্ব প্রথমে উপলব্ধি হয় নাই, বৈদেশিক উপনিবেশে ভারতবাসী, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতে অসন্তোষ, পূর্ব্ব আফ্রিকা, ইউগ্যাণ্ডা, ভারতে অসন্তোষ—বিদেশে উপনিবেশ—বৃটিশ গায়েনা, ফিজিদ্বীপপুঞ্জ, সীমান্ত প্রদেশদিগের সহিত সম্বন্ধ, বলশেভিসম্, মধ্য আসিয়া, আফগানিস্থান, আমীর হাবিবুল্লা, হাবিবুল্লাকে হত্যা, উত্তরাধিকারি সম্বন্ধে বিবাদ, আমীর আমানুল্লা, নূতন আমীরের বিপদ সঙ্কুল অবস্থা, ভারতের অবস্থা, আমীরের সুবিধা, আমীর কর্তৃক খাইবারে শত্রুতা, খাইবার সীমান্ত, সীমান্ত সমরে বর্ত্তমান প্রথা, ওয়াজিরি স্থানের অবস্থা, থালের নিকট যুদ্ধ, দক্ষিণে অবস্থা, স্পিনবলডকে গোলযোগ, সন্ধির প্রস্তাব, যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার সর্ত্ত, আফগানিস্থানের সহিত সীমান্ত প্রদেশের সম্বন্ধ, সংবাদপত্রগণের মতামত, আফগান যুদ্ধের ফল, যুদ্ধ চালাইতে বেবন্দবস্তের অভিযোগ, বেলুচিস্থানের অবস্থা, সীমান্ত গোলযোগ, মাসুদ ও ওয়াজিরিগণের আক্রমণ, শাস্তির ব্যবস্থা, বৈরিতা, সীমান্ত রাজনীতি, অবস্থা পরিবর্ত্তন, সৈন্য সম্বন্ধীয় প্রয়োজন, সামরিক সংস্কার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতি।

মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থীদল, গবর্ণমেণ্টের উপর অবিশ্বাস, কনগ্রেস, অমূলক ধারণা, মুসলমানগণের চাঞ্চল্য, আর্থিক দুরবস্থা, আশঙ্কাজনক অবস্থা, রৌলট আইন, সংস্কার প্রস্তাবদ্বয়, সন্দেহ সঞ্চার, গবর্ণরজেনেরালের বক্তৃতা, রৌলট আইনসংক্রান্ত বাদানুবাদ, সিলেক্ট কমিটিতে প্রথম বিল, সন্ধি, সত্যাগ্রহ, অসন্তোষের চরম অবস্থা, মিথ্যা জনরব রটনা, আন্দোলনের গতি, গোলযোগ, দিল্লী, হিন্দু মুসলমানে একতা, ৬ই এপ্রিলের ঘটনা, প্রথম গোলযোগ, হাঙ্গামার প্রসার, জালিয়ানবাগে হত্যাকাণ্ড, ভীষণ অবস্থা, গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি, সাধা-

রণের মত, আফগান যুদ্ধ, অনুসন্ধানের প্রার্থনা, জনরব ও অসন্তোষ-বৃদ্ধি, গবর্ণমেণ্টের বিপত্তি, সাধারণকে প্রকৃত ঘটনা জানাইবার বন্দোবস্ত, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা, গবর্ণরজেনেরালের বক্তৃতা, অনুসন্ধান কমিটি, পণ্ডিত মালবীয়ের প্রস্তাব, ক্ষতিপূরণ আইনের প্রস্তাব, শাসনবিধিসংস্কার, মধ্যমপন্থীগণের জয়, লর্ড হণ্টার প্রমুখ কমিটি, মুসলমানগণের দুর্ভাবনা, মুসলমানগণও সন্ধির জন্য বিজয়োল্লাস, খিলাফৎ আন্দোলন, ঊনবিংশ শত ঊনবিংশ অব্দের কংগ্রেস, চরমপন্থীদল ও মধ্যমপন্থীদল, যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার পূর্ব্বে করুণা প্রকাশ, তাহার সময় করুণাপ্রকাশ, মধ্যমপন্থীদলের ভাব, চরমপন্থীদলের ভাব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা।

ভারতবর্ষ কর্তৃক ইংলণ্ডকে দেয়, ভারতবর্ষের ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদিগের রাজস্ব, দ্রব্যাদির দুর্মূল্যতা, অনাবৃষ্টির শোচনীয় ফল, ভারতবর্ষে উৎপন্ন খাদ্য শস্য, খাদ্যশস্যের বিদেশে রপ্তানি, যুদ্ধকালে খাদ্যরপ্তানি, দুর্ভিক্ষ দমনের ব্যবস্থা, অধিবাসিগণের উপর উক্ত ব্যবস্থার ফল, অধিবাসিগণের দুর্ভিক্ষের সহিত সংগ্রামের ক্ষমতা, ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা, কাপড়ের দরের দুর্মূল্যতা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় প্রচলনের ব্যবস্থা, ধর্ম্মঘট, পরিবর্ত্তনশীল ব্যবস্থা, নূতন পরিণাম, রাস্তা ঘাটের সুবিধার প্রয়োজনীয়তা, রেলপথ ও যুদ্ধে মাল চালানের উপর কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা, রেলওয়ে ব্যবস্থা, কয়লা, ব্যোমযান, ডাক ও তার বিভাগ, ডাক ঘরের কার্য্যবৃদ্ধি, টেলিফোন, তার হীন বার্ত্তা প্রেরণ, আর্থিক উন্নতি, শ্রমশিল্পের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি, নূতন যৌথকোম্পানীর সৃষ্টি, স্বদেশী, ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা, প্রাদেশিক শ্রমশিল্প, দেশীয় রাজ্য সমূহ, শুল্ক, জএণ্টকমিটির প্রস্তাব, যুদ্ধারম্ভ, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য, গোড়ায় বিপত্তি, মন্দাবস্থা হইতে উদ্ধারলাভ, ভারতবর্ষীয় মিউনিশনস্ বোর্ড, মিথ্যা ধারণা, বাণিজ্যের গতি, ইংলণ্ড, জাপান, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স, কার্পাসজাত দ্রব্যের বাণিজ্য চিন, ধাতু, রেশম কাপড়, খনিজতৈল, মদ্য, বিবিধ রপ্তানি, পাট ও পাটের জিনিস, ভারতবর্ষীয় কলের বৃদ্ধি, তুলা, খাদ্যশস্য, চাউল, গম, ছাল ও চামড়া, চা, তৈলেরশস্য, ধাতু, সামান্তপ্রদেশের সহিত বাণিজ্য, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, উপকূলে বাণিজ্য, রৌপ্য, স্বর্ণ, জাহাজিকাজ, সমুদ্রপথে যাত্রা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উন্নতির ভিত্তি।

আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি, নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীগণের দুরবস্থা, কৃষিজীবিগণের ঋণভার, কোঅপারেটিভ অনুষ্ঠান, নৈতিকফল, ভবিষ্যতের কার্য্য, মান্দ্রাজে, বাঙ্গালায়, পঞ্জাবে, বোম্বাইএ, যুক্তপ্রদেশে, বর্ম্মায়, বিহার ও উড়িষ্যাতে বিজ্ঞান সম্মত কৃষিকার্য্যের অন্তরায়, আশারচিহ্ন, সন্তোষজনক ফল, বর্ষেরকার্য্য, চাউল, গম, তুলা, ইক্ষু, পাট, নীল, তামাক, চা কফি ও রবার, ফলের চাষ, গবাদির খাদ্য, শুষ্ক তৃণাদি, ছত্রকতত্ত্ব, শস্যনাশক কীটতত্ত্ব, কৃষি সম্বন্ধায় ইন্জিয়ারিং, গোবিদ্যা, পূর্ত্তকার্য্য, মান্দ্রাজে, বোম্বাইএ, যুক্তদেশে, বনকাষ্ঠ, বনজদ্রব্যের চাষ, বনজ দ্রব্য তত্ত্বের বিদ্যালয়, মৎস্যের চাষ, বাঙ্গালায়, মান্দ্রাজে, পরস্পর সাহায্য, স্বাস্থ্যরক্ষা, অন্তরায়, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, নগরে স্বাস্থ্য, পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য, কুষ্ঠরোগ, প্লেগ, সমালোচনা, রাজপুরুষগণের উদ্যম, রেডক্রস্‌, স্ত্রীজাতির মধ্যে কার্য্য, প্রাদেশিক উদ্যম, সামাজিক সংস্কার, কতকগুলি সমস্যারবিষয়, অস্পৃশ্যজাতিগণ, স্ত্রীশিক্ষা, অবরোধপ্রথা, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদপ্রথা, ১৯১৯ সালে উন্নতি, ঐবর্ষে শিক্ষার প্রসার, শিক্ষারবর্ত্তমান অবস্থা, ইহার বিপদসঙ্কুল অবস্থা, শিক্ষাপ্রণালীর দোষ, অর্থের অসদ্ভাব, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ, খ্রীষ্টিয় মিশনরিগণের উদ্যম, বেতন বিস্তারের আবশ্যকতা, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন, মাধ্যমিক শিক্ষা, কমিশনের প্রস্তাব, আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন, শিক্ষকগণের শিক্ষা, ইউনিভার্সিটি দত্তশিক্ষা, বর্ত্তমান প্রথা, স্ত্রীশিক্ষা, রিপোর্ট সম্বন্ধে মতামত, রাজপুরুষগণের কৃত অনুষ্ঠান, প্রাথমিকশিক্ষা, যুক্তপ্রদেশে, পঞ্জাবে, বোম্বাইএ, বিহারে, বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা, মুসলমানদিগের শিক্ষা, দেশীয় রাজ্য সমূহে শিক্ষা, ইউরোপিয়দিগের শিক্ষা, অস্পৃশ্য ও পতিত জাতিদিগের শিক্ষা, শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় শিক্ষা, কৃষিসম্বন্ধীয় শিক্ষা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজা ও প্রজা।

শান্তিরক্ষা, পুলিস সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার দোষ, উন্নতি, ১৯১৯ অব্দে পুলিসের উপর গুরুভার, ডাকাতি, বিল্ল, রাজবিদ্রোহ সম্বন্ধীয় অপরাধ, মৈনপুরীতে রাজবিদ্রোহ সূচক ষড়যন্ত্র, জেল ভারতীয় জেল, কমিশন, জেল বিভাগেরকার্য্য, জেল জাত শিল্প, যুবক অপরাধী, দুর্ব্বৃত্ত জাতিগণ, তাহাদিগকে সেটেলমেণ্টে রক্ষণ,

দেশীয় রাজ্যসমূহ, দুর্ব্বৃত্তদমনের জন্য পরামর্শ, স্বায়ত্ত-শাসন, মিউনিসিপালিটি দিগের গঠন, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, উহাদিগের গঠন, উহাদিগের লব্ধ অর্থ ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রষ্ট, স্বায়ত্ত শাসন প্রথার দোষ, পঞ্জাবে, সীমান্ত প্রদেশে, বিহার ও ওড়িষ্যায়, কর, বঙ্গদেশে একটী পরীক্ষা, আইন করণ, প্রাদেশিক সভা, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা, সভ্যগণের পদত্যাগ ও পুনর্নিবাচন, শিমলায় অধিবেশন, মন্তব্য সমূহ, আইন সমূহ, রুবল্ নোট, রাজপুরুষগণ, তাহাদিগের কার্য্য, অবস্থার উন্নতি, রাজপুরুষগণের যুদ্ধসম্বন্ধীয় কার্য্য, পরিবর্ত্তিত অবস্থা, ভবিষ্যতে ভয়, দূরীকরণ, মন্ত্রীগণ, গবর্ণরের কার্য্য, জমীসংক্রান্ত রাজস্ব, বিহারে কৃতদাসপ্রথা, বঙ্গদেশে জমীর রাজস্ব নির্দ্ধারণ, জএণ্টকমিটির মন্তব্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শাসনবিধি সংস্কার।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, পার্লামেণ্ট মহাসভা ও ভারতসচিব, কার্য্যকারি সভা, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গঠন, প্রাদেশিক গবর্ণরগণ, প্রাদেশিক কার্য্যকারি সভা, গবর্ণর, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ও চীফকমিশনারগণ, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, মণ্টেগু চেম্স্ফোর্ড কৃত শাসনবিধি সংস্কারের প্রস্তাব, গ্র্যাণ্ডকমিটি, প্রদেশ গুলির উপর উক্ত প্রস্তাবের ফল, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, আইন করণ, আয় ব্যয় তালিকা, কেন্দ্রীবর্জ্জন, সংস্কার বিধি, সংস্কার ও রাজপুরুষদিগের অনুষ্ঠান, ভোট কমিটি, সমালোচনা, কার্য্য ভাগ করণ কমিটি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে যে যে কার্য্যের ভার দেওয়া হয় তৎসম্বন্ধীয় কমিটি, প্রাদেশিক কার্য্য কমিটি, মন্ত্রিদিগকে যে যে বিভাগের ভার দেওয়া হয় তৎসম্বন্ধীয় কমিটি, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য, উক্ত গবর্ণমেণ্ট ও মণ্টেগু চেমস্ফোড রিপোর্ট, উক্ত গবর্ণমেণ্ট ও ভোট কমিটির রিপোর্ট, প্রতিনিধিপ্রেরণ, জয়েণ্টসিলেক্ট কমিটি, ক্রু কমিটী, গবর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আইন, ভারতসচিব ও তাঁহার মন্ত্রণা সভা, উক্ত সভা, রাজপুরুষগণ, দশবৎসরান্তে কমিশন, শাসন-সংস্কার আইন ও দেশীয় রাজ্যসমূহ।

পূর্ব্বভাষ।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শত ঊনবিংশ অব্দের প্রারম্ভে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও অনেক আশার অঙ্কুর দেখা দিয়া ছিল। তাহার কারণ ও যথেষ্ট ছিল। জগতের ইতিহাসে যে যুদ্ধের তুলনা নাই সেই মহাসমরে ব্রিটিশ সাধারণ তন্ত্র তখন বিজয় লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন। আর এই জয়লাভে ভারত যে অল্প সাহায্য করে নাই, তাহা স্মরণ করিয়া ভারত-বাসিগণ মনে মনে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছিলেন। যে যে দেশ লইয়া ব্রিটিশ সাধারণ তন্ত্র গঠিত, তাহাদের সভায় ভারতের আসন পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে উঠিয়াছে আর যে শাসন বিধি সংস্কারের প্রস্তাব, ভারতবাসিগণের হস্তে দেশের শাসন ভার ক্রমে ক্রমে অর্পণ করণোদ্দেশে প্রস্তুত হইয়া ছিল তাহাও কথা হইতে কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। আবার এই সময় ধনী ও সুশিক্ষিত সম্প্রদায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে নানা বিরাট অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াতে দেশে কল কারখানাদির সমৃদ্ধি এত অধিক হইয়াছিল যে কেহ কখন তাহা কল্পনা করিতেও পারে নাই।

এইত বর্ষারম্ভ সময়ের অবস্থা। কিন্তু যেমন দিন কাটিতে লাগিল, এই দৃশ্যও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ১৯১৮ অব্দে অনাবৃষ্টির কুফলে শস্যাদি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইতে লাগিল। সুশিক্ষিত ভারতবাসিগণ তাঁহাদের রাজনৈতিক আশা ও আকাঙ্খা যত শীঘ্র পূর্ণ হইবে ভাবিয়াছিলেন, তাহা না হওয়াতে দৈর্য্যহীন ও অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন ও অন্যদিকে দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতার দরুণ দরিদ্র অধিবাসিগণের দুরবস্থার সীমা রহিল না। এই দুই কারণে দেশের রাজনৈতিক গগণ এমন আকার ধারণ করিল, যে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা জাগরুক হইল। এই আশঙ্কা অমূলক হয় নাই। একটি মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাতে দারুণ আগুন জলিয়া উঠিল ও তাহার ফলে মার্চ ও এপ্রিল মাসের শোচনীয় ঘটনাবলী ঘটিল।

কেবল যে শুধু দেশের আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া বিনামেঘে ঝটিকার আবির্ভাব হইল তাহা নহে। জর্ম্মানির সহিত যুদ্ধের দুর্দিনে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশবাসিগণ শান্ত ও নিরব ছিল। কিন্তু যখন জর্ম্মানির পরাজয় হওয়াতে, উক্ত প্রদেশে গোলযোগের আশঙ্কা দূরীভূত হইল, ঠিক সেই সময়েই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দেশের অধিবাসিগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। ইহা অবশ্য আফগান যুদ্ধের অবসানের ফল। আজি পর্য্যন্ত তাহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করে নাই। যুদ্ধের এখনও সম্পূর্ণ বিরাম হয় নাই। এইত গেল একটি দুর্ভাবনার কথা। তাহার উপর আর একটি উপসর্গ আসিয়া জুটিল। যে রাজনৈতিক দল রষিয়া দেশে অরাজকতা ও বিদ্রোহ ঘটাইয়া বসিয়াছে এবং শাসন দণ্ড কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাদের নাম বলশেভিক। ইহারা নিজদেশে অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া এখন পৃথিবীর সকল দেশেই বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। ইহারা মধ্য আসিয়া খণ্ড ইতি মধ্যেই করতল গত করাতে তাহাদের সান্নিধ্য হেতু উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গোলযোগের আর একটি কারণের আবির্ভাব হইল। এ পর্য্যন্ত দেশের অবস্থা আশঙ্কাময় থাকা সত্ত্বেও বর্ষের শেষভাগে আশার আলোক দেখা দিল। তখন পার্লামেণ্ট মহাসভা কর্তৃক ভারতের শাসন প্রণালী সংস্কারের উদার আইন অনুমোদিত হইয়াছে। মহামহিমার্ণব ভারত সম্রাটের করুণাপ্রণোদিত ঘোষণাপত্রে ভারতবাসি গণের বিগত নিগ্রহের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ ও ভবিষ্যতে উন্নতির জন্য আশা ও আশ্বাসের কথা থাকাতে, ভারতবাসি, কি দেশীয় কি ইংরাজ, উভয় জাতিই ভারতের মঙ্গলার্থ প্রাণ পণে চেষ্টা করিতে আহুত হইলেন।

এক্ষণে ভারতের সম্মুখে একটি নবযুগ দণ্ডায়মান। আশা করা যায় যে এই নবযুগে ভারতবাসিগণ গোড়ায় নানা বিঘ্ন ও অন্তরাল অতিক্রম করিয়া অবশেষে রাজ্য শাসন ক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিয়া ব্রিটিশ সাধারণ তন্ত্রের এক সমান অংশীদার রূপে গণ্য হইবেন। অর্থাৎ যে সমস্ত দেশ লইয়া এই সাধারণ তন্ত্র গঠিত তাহাদের মধ্যে ভারতের আসন কাহারও অপেক্ষা নিম্নে হইবে না।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারতের বৈদেশিক সম্বন্ধ

যুদ্ধের চারি বৎসরের মধ্যে ভারতের সহিত ব্রিটিশ সাধারণ তন্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ অনেক পরিবর্ত্তিত হয়। যেই জর্ম্মাণির সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিল, অমনি রাজভক্তির এক প্রবল বন্যায় দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত প্লাবিত হইল ও ভারতবাসিগণ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য দলে দলে বদ্ধপরিকর হইয়া সমবেত হইতে লাগিল। রাজনীতি-বিশারদ শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের দেশবাসিগণের সহিত ব্রিটিশ জাতিরও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আন্যান্য দেশবাসিগণের স্বার্থের একতা উপলব্ধি করিলেন। যুদ্ধ উপলক্ষে সাম্রাজ্যের সহায়তার জন্য ভারত যাহা যাহা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহা যেরূপ অসঙ্কুচিত ভাবে পালন করিতে ছিল, তদ্বারা ভারতের রাজ ভক্তির গভীরতা স্পষ্ঠরূপে প্রমাণিত হইল। ইংরাজগণ ভারতের এই রাজ ভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ভারতবাসিগণকে সুনয়নে দেখিতে লাগিলেন। ভারতের যুদ্ধে সহায়তার পরিমাণ যখন ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইতে লাগিল, তখন ইংলণ্ডে ও সমস্ত ইংরাজ উপনিবেশে ভারতের উপর সন্তোষ ও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার স্রোত প্রবাহিত হইল। ইহা দেখিয়া শিক্ষিত ভারত-সন্তানগণ বিশেষ শ্লাঘা অনুভব করিতে লাগিলেন ও তাঁহারা যে অনেক দিন হইতে ভারতকে ইংলণ্ডের উপনিবেশ শ্রেণীর আসনে উন্নীত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে ছিলেন, সেই বাসনা আরও বদ্ধমূল হইল। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে একটি বিষয় অগ্রস্থান অধিকার করিল—সেটি ভারতবাসিগণের হস্তে তাহাদের দেশ শাসনের ক্ষমতা প্রদান। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ও মতি গতি পরি-

বর্ত্তিত হইল। এতদিন গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসিগণের রাজনৈতিক আকাঙ্খা, বর্ত্তমান শাসন প্রণালী যতদিন চলিবে ততদিন পূর্ণ হওয়া অসম্ভব বলিয়া উপহেলা করিতেন। কিন্তু বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে যে সমস্তজাতি জর্ম্মাণির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অতিশয় উদার ও মহৎ ছিল। তাঁহাদের ইহাই লক্ষ্য ছিল যে কোন প্রবলজাতি যেন কোন দুর্ব্বলজাতির উপর বলপূর্ব্বক আধিপত্য না করে। সুতরাং ইংলণ্ড ও ভারতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার চরম পরিণতি কি হইবে। সুদীর্ঘ যুদ্ধের দুর্দ্দিনে ভারতবাসিগণ এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইংলণ্ডের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের যে সম্বন্ধ আছে তাহা ছিন্ন করিবার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করেন নাই। তাঁহাদের ইহাই প্রার্থনা ছিল যে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বন্ধন যেন আরও দৃঢ়ীভূত হয় ও তজ্জন্য ভারতকে সাম্রাজ্যের মধ্যে আত্মশাসনক্ষমতা-প্রাপ্ত উপনিবেশ গুলির দলে যেন ভুক্ত করা হয়। ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন না। উভয় গবর্ণমেণ্টে পরামর্শ চলিতে লাগিল ও অবশেষে উনবিংশ শত সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দের বিশে আগষ্ট তারিখে কমন্স সভায় ভারত সচিব মহামান্য মণ্টেগু মহোদয় ঘোষণা করিলেন যে ভারতের বর্ত্তমান শাসন প্রণালী চিরকালের জন্য নহে উহা কেবল ভবিষ্যতে ভারত বাসি গণের হস্তে শাসন ভার অর্পণ করিবার উপক্রমণিকা মাত্র। অতঃপর এই নূতন রাজনীতি সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে গৃহীত হইল। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার বাহ্যিক চিহ্নের ও অভাব ছিল না। যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রণার মহাসভায় সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের প্রতিনিধি গণের সহিত ভারতের প্রতিনিধিগণ ও একাসনে উপবিষ্ট হওয়াতে ভারতবাসি গণের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। শুধু তাহাই নহে। জর্ম্মানির পরাজয়ের পর সন্ধি প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য ইউরোপিয় জাতি গণের ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি গণ যে চিরস্মরণীয় মহাসভায় নিমন্ত্রিত হন, তথায় ভারতের প্রতিনিধি গণও নিমন্ত্রিত হইয়া আসন গ্রহণ করেন। ভবিষ্যতে যুদ্ধ বিগ্রহাদি নিবারণ করিবার জন্য পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশ লইয়া যে লিগ অফ নেশনস্ নামে মহাসভা গঠিত হইয়াছে, ভারত ও তাহার মধ্যে এক সভ্যরূপে মনোনীত হয়। তাহার পর যখন একজন ভারতের সুসন্তান স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ মহোদয় ভারতবর্ষের সহকারি সচিবের পদে নিযুক্ত হইলেন তখন আর কাহার ও বুঝিতে বাকি রহিল না যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সত্যই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

যদিও এত বড় পরিবর্ত্তন হইল, তথাপি যুদ্ধের জন্য নানাবিধ ভাবনার মধ্যে ইহার গুরুত্ব ইংলণ্ডে সকলে সম্যক অনুভব করিতে পারিলেন না। ভারতবাসিগণ ও তাহাদের

নানা প্রকার অভাব ও অভিযোগের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। নূতন রাজ-নীতির প্রবর্ত্তনা দ্বারা তাঁহাদের রাজনৈতিক আশা ও বাসনা পূর্ণ হইবার যে আশাতীত সুবিধা হইল তাহা তাঁহারা ও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ভারতের রাজ-ভক্তি-প্রণোদিত যুদ্ধে সাহায্য করণ যদিও ইংলণ্ডের ও উপনিবেশ সমুহের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিয়াছিল, যদিও ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট উভয়েই যাহাতে ভারত শাসন প্রণালীর সংস্করণ শীঘ্র সমাধা হয় তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে ছিলেন, তত্রাচ ভারতের সুশিক্ষিত সন্তান গণ, তাঁহাদের আশা সাফল্যে অনিবার্য্য বিলম্ব দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইলেন ও পাছে পুনরায় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যুদ্ধের আগে যাহা ছিল তাহাতে পরিণত হয়, সেই ভয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে এই সময় কতক গুলি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে এরূপ সন্দেহের কারণ ছিল। পঞ্চনদে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হওয়াতে, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বিষম মনান্তর ঘটিল ও লোকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির কথা ভুলিয়া গিয়া বর্ত্তমান নিগ্রহের কথাই ভাবিতে লাগিল।

এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে ১৯১৯ অব্দে কতক গুলি ঘটনা ঘটে যাহাতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি যতদূর হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই, ভারতবাসি গণের এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। যখন ভারতের আত্ম-শাসন-ক্ষমতা-প্রাপ্ত উপনিবেশ পুঞ্জের আসনে উন্নীত হওয়া অনেকটা সাধিত হইতেছিল, উপনিবেশ নিবাসি ভারতীয় গণের দুরবস্থার কথা লইয়া বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। বর্ষের প্রারম্ভে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ক্রুগারসডর্প মিউনিসিপালিটি একটি আইন করিয়া ভারতীয়গণকে কতক গুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে আদেশ দেওয়াতে এই অসন্তোষাগ্নি প্রজ্জলিত হইল। অতঃপর আইন-কারি সভায় এ বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর চলিতে লাগিল, ভারতীয়গণ উক্ত আইন রধ করিবার প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিল ও অবশেষে এই অভিযোগের অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইল। ইহার ফলে ১৯১৯ অব্দে জুন মাসে একটি আইন করা হইল, যদ্দ্বারা ভারতীয় গণ উক্ত বর্ষের মে মাসের প্রথম দিনে যে যে স্থানে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিয়া ছিলেন, তথায় বাণিজ্য করিবার তাঁহাদের অধিকার দৃঢ়ীভূত হইল, কিন্তু অপর পক্ষে ভারতীয় গণের সম্পত্তি লাভ করিবার অধিকার লোপ করা হইল। ১৯১৪ অব্দে ভারতীয় গণের পক্ষে শ্রীযুক্ত গান্ধি মহাশয়ের সহিত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জেনারেল স্মটস সাহেবের যে চুক্তি হইয়াছিল, এই আইনে সেই চুক্তি ভঙ্গ হইল, কারণ উক্ত চুক্তি মতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়া ছিলেন যে বর্ত্তমান আইন গুলি নিরপেক্ষ ভাবে পালন করা হইবে,

ও যাহারা যে যে সত্ব লাভ করিয়াছে তাহাদিগকে উহা হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। কিন্তু নূতন আইনে ভারতীয় গণের মধ্যে যাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাণিজ্য উপলক্ষে অধিবাসী হইয়া ছিলেন তাঁহাদের ভবিষ্যত অবস্থা সঙ্কটময় হইল। অবশ্য যাহাদের স্বার্থে কোন ক্ষতি হইল না, সেই ভারতীয়গণের দুঃখের বা অভিযোগের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষে এ বিষয় লইয়া বিষম আন্দোলন আরম্ভ হইল। ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসি গণের এই অভিযোগ ছিল, যে ইহারা তথায় বাস করিলে দেশের আর্থিক অমঙ্গলের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। এ কথাটা একেবারেই অমূলক নহে, কিন্তু ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই অভিযোগ একেবারেই অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যে ভারত যে উপনিবেশের আসনে-উঠিয়াছে তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়, যখন দেখা যাইতেছে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ উপনিবেশে, ভারতীয় গণের নিগ্রহের জন্য নূতন আইন করা হইতেছে। যাহা হউক ভারতবর্ষে এই তুমুল আন্দোলনের ফলে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন এবং উক্ত কমিটি ভারতীয় গণের দক্ষিণ আফ্রিকায় বাণিজ্যেরও ভূম্যধিকারের বিষয় তদন্ত করিবেন। ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ভারতীয়গণের প্রতি সুবিচার হয় এই উদ্দেশ্যে সার বেনজামিন রবার্টসনকে তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ উক্ত কমিটির সাহায্যার্থে প্রেরণ করিয়াছেন। ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থার সহিত বিশেষ পরিচিত।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় ও ভারতীয় অধিবাসি গণকে লইয়া গোলযোগ বাধিয়াছিল। তথাকার শ্বেতাঙ্গগণ এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতীয়গণকে তথায় বসবাস করিতেদিলে, উক্তস্থানের আদিম অধিবাসি গণের অমঙ্গলের সম্ভাবনা; সুতরাং ভারতীয় গণের তথায় আগমন নিষিদ্ধ হউক। কিন্তু অনেক ভারতীয় ওখানে বহুদিন যাবৎ বসবাস করিতেছেন ও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সম্পত্তি-শালী ও হইয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ গণের এই মন্তব্যে তাঁহারা একান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া তাঁহাদের অবস্থার কথা অবগত করাইয়াছেন। এ বিষয় লইয়া কমন্স সভায় অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার উত্তরে যাহা বলা হইয়াছিল, সে কথাও বিবেচ্য। উত্তর এই যে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসিগণ যাহা ইচ্ছা মন্তব্য করিতে পারেন, কিন্তু তাহার সহিত স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের ত কোন সম্বন্ধ নাই, ও উহা উক্ত গবর্ণমেণ্টের মত ও নহে। আর যে বিলাতের গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে শেষ মীমাংসা করিতে সক্ষম, উক্ত মন্তব্য তাঁহাদের ও মতপ্রকাশক নহে। পূর্ব্ব আফ্রিকার ইংরাজাধিকৃত উপনিবেশের অধিবাসিগণের দেশ শাসনের ক্ষমতা নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বলিলেন যে কোন উপনিবেশে ভারতবর্ষীয় গণকে সম্রাটের অন্য কোন প্রজাপেক্ষা

নিকৃষ্ট মর্য্যাদা প্রদান করা নিতান্ত অন্যায় হইবে। ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট তজ্জন্য বিলাতের গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন যে ভারতীয়গণের বিপক্ষে তাহাদের ক্ষতি জনক যে সমস্ত আইন করা হইয়াছে, তাহা একেবারে পরিত্যক্ত হউক ও ব্যবস্থাপক সভা ও অন্যান্য স্থানীয় সভায় ভারতীয় অধিবাসিগণের প্রতিনিধিগণকে সদস্য নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হউক। এই অনুরোধের ফলে ভারতীয়গণের দুই জন প্রতিনিধি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এই দুই জন মনোনীত না হইয়া নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত তাহার জন্য ও ভারতীয়গণের স্বার্থ যাহাতে উপনিবেশ সচিব লর্ড মিলনারের কর্ত্তৃত্বে যে সভা বসিতেছে তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত হয় তদ্বিষয়ে ভারত সচিব বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন।

আফ্রিকার ইউগাণ্ডা প্রদেশে ও ভারতীয়গণের অবস্থা সন্তোষ জনক নহে। তথাকার গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি তুলার বীজের সহিত অন্যান্য পদার্থ মিশ্রণ রহিত করিবার জন্য স্থানে স্থানে তুলার বীজ ছাড়াইবার কল স্থাপনা করাতে ভারতীয় কলওয়ালাগণের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন ও যাহাতে সার বেনজামিন রবার্টসন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিবার সময় ইউগাণ্ডা গভর্ণমেণ্টের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করেন, তাহা স্থির হইয়াছে।

এই ত মন্দ দিকের কথা—কিন্তু একটা ভাল দিকও আছে। আফ্রিকার উপনিবেশ সমূহে ভারতীয়গণের যেমন অমর্য্যাদা হইতেছে, অন্যদিকে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ডে তাহাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে। এই উপনিবেশ গুলির গবর্ণমেণ্ট গণ ভারতীয় অধিবাসিগণ যে একই সাম্রাজ্যের প্রজা ও তজ্জন্য তাহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করা উচিত ও তাহাদের পরস্পরের উপকার করা উচিত তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ১৯১৮ সালে, সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি গণের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় যে সভার অধিবেশন হয় তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে যদিও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত প্রত্যেক দেশেরই ঐ দেশের কাহারা অধিবাসী হইবেন তাহা মীমাংসা করিবার অধিকার আছে, তত্রাচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতীয় ও অন্যান্য প্রজাগণ যে কোন উপনিবেশেই হউক পরিব্রাজক রূপে প্রবেশ করিতে পারিবে ও যে ভারতীয়গণ কোন উপনিবেশে বাস করিতেছে তাহারা তথায় তাহাদিগের স্ত্রীপুত্র কন্যা গণকে আনিতে পারিবে। তবে বহু বিবাহ প্রথা তথায় চলিবে না।

উপনিবেশে ভারতীয়গণের অবস্থার সহিত তথায় ভারতীয়গণের গমনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের ভারতীয় কুলি গণের বৈদেশিক উপনিবেশে যাত্রা সম্বন্ধে প্রতিকূল মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই। অনেকেই এই বিদেশ যাত্রার বিশেষ বিরোধী, কারণ তাঁহারা বলেন এ ইহাতে বিস্তর অত্যাচার অনিবার্য্য ও যে অবস্থায় ভারতীয় শ্রমজীবি গণ কে তথায় থাকিতে হয় তাহাতে তাহাদের নৈতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। ভারতবাসিগণের এই মত দেখিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উপনিবেশ যাত্রার কথা পুনরুত্থাপন করেন নাই। কিন্তু ফিজি ও ব্রিটিশ গায়ানার গবর্ণমেণ্ট যাহাতে যাত্রা পুনর্ব্বার আরম্ভ হয় তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টকে অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভারতীয় কুলির অভাবে উক্ত উপনিবেশের অধিবাসিগণের অনেক ক্ষতি হইতেছে বলিয়া উভয় গবর্ণমেণ্টই ভারতবর্ষীয়গণকে অনুরোধ করিয়াছেন যে পুনরায় যেন উক্ত উপনিবেশ দ্বয়ে কুলি চালান করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। উভয় গবর্ণমেণ্টই ভারতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষীয়গণ যেমন বন্দবস্তে কুলি প্রেরণে রাজি হইবেন তাঁহারা সেইরূপ বন্দবস্ত করিতে প্রস্তুত আছেন ও ভারতবর্ষীয়গণের মতানুযায়ী কার্য্য হইবে। এক্ষণে উক্ত দুই গবর্ণ-মেণ্টের প্রতিনিধি গণ ভারতের নেতৃবর্গের সহিত তাঁহাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে আন্দোলন করিতেছেন। ইহার কিছুদিন পরে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা উক্ত প্রতিনিধি গণের সহিত পরামর্শ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সঙ্গত প্রস্তাব করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। কিছুদিন হইল ফিজি উপনিবেশে ভারতীয় কুলিগণের অবস্থার কথা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ও ভারতবাসিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। তাহাদের দুরবস্থার কথা প্রকাশ হওয়াতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা একটি মন্তব্য করেন যে ফিজি উপনিবেশে যে সমস্ত ভারতীয় কুলি কাজ করিতেছে, তাহাদিগকে চাকুরি হইতে অব্যাহতি দিয়া ভারতে পাঠান হউক ও এ মন্তব্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। তাঁহাদের অনুরোধে ফিজির গবর্ণমেণ্ট ১৯২০ অব্দের জানুয়ারি মাসের দুই তারিখ হইতে ভারতীয় কুলি গণের চুক্তি ভঙ্গের আদেশ দিয়াছেন। তাহার উপর তাঁহারা কুলি দিগের বাসস্থানের ও চিকিৎসার্থ ডাক্তার খানার অনেক ভাল বন্দবস্ত করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আর ভারতীয় অধিবাসিগণ যাহাতে ফিজির ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি গণকে সদস্য পদে নির্ব্বাচন করিতে পারেন, তাহার ও বন্দবস্ত করিতেছেন। যে সমস্ত কুলি গণকে চাকরি হইতে অব্যহতি দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যাহাতে শীঘ্র এদেশে ফিরিয়া আসিতে পারে তাহারও উপায় করিতে ফিজি গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ভারতের সীমান্তে বৈদেশিক রাজ্যদিগের সহিত ভারতের সম্বন্ধ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে ১৯১৯ অব্দে নানা রূপ ভাবনার কারণ ছিল ও কতক গুলি বড় বড় ঘটনা ঘটিয়া ছিল। জর্ম্মাণ যুদ্ধের অবসানে আশা করা গিয়াছিল যে সীমান্ত প্রদেশে আর শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা নাই। কিন্তু যদিও জর্ম্মাণির পরাজয় সম্পূর্ণ রূপে হইয়াছিল, তত্রাচ মধ্য আসিয়ার যে যে দেশে জর্ম্মাণ চরগণ বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছিল উক্ত দেশ সমূহে সকল গোলযোগ চুকিতে অনেক বিলম্ব হইল। রুসিয়ার পতনে জর্ম্মাণির পক্ষে ভারতবর্ষের সন্নিকটে অগ্রসর হইবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। যদিও জর্ম্মাণি পরাজিত হওয়াতে জর্ম্মাণির দ্বারা কোন বিপদের আশঙ্কা রহিলনা, কিন্তু যে কোন জাতির ভারতের নিকটে আসিবার পথ খোলাই রহিল। সুতরাং বলশেভিকগণের প্রভাব সীমান্তপ্রদেশে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল। বলশেভিকগণের বিপ্লবকারি মত জর্ম্মাণিই তাহার শত্রু দমনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু ফলে উহা দ্বারা জর্ম্মাণি নিজেই ধ্বংশ হইল। এই মত মধ্য আসিয়ার দেশ সমূহে সমাদৃত হইবারই কথা। রুসিয়ায় অরাজকতা, যুদ্ধ উপলক্ষে জনসাধারণের নিগ্রহ ও অন্যান্য কারণে বলশেভিকগণের বিপ্লবকারি মতের প্রচার মধ্য আসিয়ায় শীঘ্রই প্রসার লাভ করিল। বলশেভিকগণের বিপক্ষশক্তির প্রতিযোগিতা ও সভ্য জগতের ঘৃণা সত্ত্বেও ১৯১৯ সালে বলশেভিকগণ রুসিয়াধিকৃত তুর্কিস্থান নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সমর্থ হইল ও এখন তাহারা তথায় সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিয়া আছে। ১৯১৮ সালের প্রারম্ভে তাহারা বোখারার সীমান্তে অনেক সৈন্য সমাবেশ করিয়া বোখারার আমীরকে তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিল। তিনি কিন্তু এখনও একপ্রকার স্বাধীন নরপতি ভাবেই আছেন, ও তাঁহার বশ্যতাস্বীকার বোধ হয় মৌখিক মাত্র। ঘারগাণা প্রদেশের অধিবাসী মুসলমানগণকে বলশেভিকগণ বলপূর্ব্বক তাহাদের সৈন্যদলে যোগ দিতে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রধান আড্ডা তাসখন্দে, যেখান হইতে তাহাদের বিপ্লবকারি মত আসিয়ার অন্যান্যদেশে প্রচার করিবার বন্দবস্ত করিতেছে। এখানে তাহাদের চরগণের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় খুলিয়াছে, ও তাহারা আশা করিতেছে যে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত তাহাদের চরেরা শীঘ্রই পারস্যে, আফগানিস্থানে, ভারতবর্ষে ও পূর্ব্ব আসিয়ার দেশসমূহে তাহাদের মত প্রচার করিতে সমর্থ হইবে। তাহাদের চরেরা যে ইতিমধ্যে ছদ্মবেশে ভারতবর্ষে আসিয়া বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহার প্রমাণ এই যে বলশেভিক নোট এদেশে অনেক আমদানি হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট এদেশে তাহার প্রচলন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

বলশেভিকদিগের দ্বারা এদেশে গোলযোগের সৃষ্টি করার পথ, সাইবিরিয়ায় বলশেভিকগণ জয়ী হওয়ায় ও ওরেনবর্গ-তাসখন্দ রেলের দ্বারা তুর্কিস্থানে বলশেভিক সৈন্য প্রেরণের সুবিধা হওয়ায়, আরও প্রসর হইয়াছে। বর্ষের শেষে বলশেভিকদিগের বিপুল বাহিনী ক্যাসনভডস্ক নগর অধিকার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল।

কিন্তু তুর্কিস্থান হইতে ভারত আক্রমণের পথে প্রকৃতিদেবী এত নৈসর্গিক অন্তরাল স্থাপনা করিয়াছেন, যে আফগানিস্থানের আমীর যদি ইংরাজদিগের বন্ধু হইতেন তাহা হইলে বলশেভিকগণের কৃতকার্য্য হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না। দুর্ভাগ্যক্রমে আফগানিস্থানের বর্ত্তমান আমীর ইংরাজের মিত্র নহে। যত দিন মৃত আমীর হাবিবুল্লা কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ততদিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বেশ জানিতেন যে কোন শত্রু আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া ভারত আক্রমণ করিলে আমীর তাহাদের আগমন প্রাণপণে প্রতিরোধ করিবেন। জর্ম্মাণ যুদ্ধের প্রারম্ভেই আমীর হাবিবুল্লা ইংরাজদিগকে বলিয়াছিলেন যে এযুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন জর্ম্মাণ কিম্বা বলশেভিক চরগণের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি তখন বিষম সমস্যায় পড়িয়াছিলেন। ১৯১৮ সালে ভারতের গবর্ণর জেনেরাল লর্ড চেমসফোর্ড আমীরের সম্বন্ধে এই বক্তৃতা করিয়াছিলেন—"আফগানিস্থানে, ভারতবর্ষের ন্যায় অনেক অশিক্ষিত কুসংস্কারাপন্ন ও অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা চালিত মানুষ আছে। ইহারা বাজেকথায় ভুলিয়া গিয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই লোকেদের দোষে রাজ্য সুশাসন করা অনেক সময় দুর্ঘট হইয়া উঠে। সুতরাং এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য হইতেছে যে কোন প্রকারে আমীর হাবিবুল্লাকে সাহায্য করা। ইনি আফগানিস্থানের মঙ্গলোদ্দেশে ও স্বীয় অঙ্গীকার প্রতিপালনার্থ বরাবর নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এ অবস্থায় আমীরকে সাহায্য করিতে হইলে, আমাদিগের দুইটী কার্য্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ আমাদিগের শত্রুগণকে দেখাইতে হইবে যে সমগ্র ভারত একতাসূত্রে আবদ্ধ, দলাদলি নাই এবং এখানে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলিয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। যদি সে চেষ্টা করা হয়, তাহাহইলে আমাদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা সে আগুণ নির্ব্বাণ করিতে সময় লাগিবেনা। দ্বিতীয়তঃ যদি আমাদের কোন শত্রু আফগানিস্থান দিয়া ভারত আক্রমণের চেষ্টা করে তাহা হইলে আমরা অর্থ সাহায্য, সৈন্য সাহায্য, যুদ্ধের উপকরণ সাহায্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাহায্য আমীরকে দান করিয়া তাঁহাকে দেশ হইতে বহিঃশত্রু বিতাড়িত করিতে সক্ষম করিব। আমরা তাঁহাকে এই সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়াছি ও

তাহা অবশ্য পালন করিব। আর আমরা আমাদের সমস্ত বল লইয়া আমাদের নিজ রাজ্য রক্ষা করিব।"

আমীর হাবিবুল্লা যতদিন জীবিত ছিলেন, আফগানিস্থানে গোলযোগের কোন আশঙ্কা ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বিংশ দিবসে জেলালাবাদের নিকট তাঁবুর মধ্যে গুপ্তভাবে আমীরকে হত্যা করা হয়। আসিয়া খণ্ডের সর্ব্বত্রই এরূপ হত্যার কথা গোপন থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অদ্যাপি কে যে আমীরকে হত্যা করিল ও কেন করিল, তাহা প্রকাশ হয় নাই। কেহ কেহ বলেন যে হয় ত কোন প্রভূত্ব-লোলুপ দেশীয় দলের দ্বারা এই হত্যা কাণ্ড হইয়াছিল। অথবা বোধ হয় জর্ম্মাণ ষড়যন্ত্র ইহার মূলে ছিল। কিন্তু এই হত্যার যাহাই কারণ হউক না কেন, ইহার ফল যে বহুদূরব্যাপী হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হাবিবুল্লার হত্যাকাণ্ডের পর সিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। হাবিবুল্লার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইনায়েতউল্লা সিংহাসনের উপর নিজ দাবী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পিতৃব্য নসরুল্লা খাঁকেই আফগানিস্থান রাজ্যের উত্তরাধিকারি স্বীকার করিলেন। দেশের ধর্ম্মযাজকগণ নসরুল্লার পক্ষপাতী ছিলেন ও আফগানিস্থানে তাঁহাদের ক্ষমতা অল্প নহে। অতঃপর জেলালাবাদে প্রকাশ্য দরবারে নসরুল্লা আফগানিস্থানের আমীরের পদে অভিষিক্ত হইলেন, হাবিবুল্লার দুই পুত্র হায়াৎ ও আমানুল্লা তখন কাবুলে ছিলেন। তাঁহারা পিতৃব্যের সিংহাসনারোহণে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা হাবিবুল্লাকে কে হত্যা করিল, তাহাকে ধরিবার চেষ্টা হউক বলিয়া বিষম আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন। আমানুল্লা কাবুলে যে সৈন্য ছিল তাহাদিগের নায়ক থাকায় কাবুলে যত সৈন্য ছিল, তাহারা সকলেই আমানুল্লার দলে যোগ দিল। তাঁহার হস্তে রাজকীয় কোষাগার ও যুদ্ধোপকরণের গুদাম ছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহারই দল পুষ্ট হইতে লাগিল ও জেলালাবাদে যে সৈন্য ছিল তাহারা ও আমানুল্লার দলে যোগ দিল। অতঃপর আমানুল্লা প্রচার করিলেন যে খুব সম্ভব তাঁহার পিতৃব্য নসরুল্লাই তাঁহার পিতা হাবিবুল্লাকে খুন করিয়াছেন। তাহার পর তিনি দেশের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কারাগারে নিবদ্ধ করিলেন। নসরুল্লাও এখন দেখিতে পাইলেন যে অনেকেই তাঁহার শত্রু আমানুল্লার পক্ষপাতী হইয়াছে। বেগতিক দেখিয়া তিনি নিজেই সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আমানুল্লার হস্তে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। আমানুল্লা সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার রাজ্যাভিষেকের কথা জানাইলেন। তাঁহার পত্রে ভারতবর্ষের সহিত আফগানিস্থানের দীর্ঘকাল স্থায়ী বন্ধুত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়া এমন আভাস দিলেন যে অতঃপর বৈদেশিক রাজন্যবর্গের সহিত আফগানিস্থানের

সম্বন্ধ নিরূপণে অথবা সংস্থাপনে তিনি আর ইংরাজদিগের মত লইবেন না, স্বয়ংই এই কার্য্যের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের এ বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না। তিনি কিন্তু এই স্বাধীনতা গ্রহণ করিলেন।

রাজ্যলাভ করিয়া নূতন আমীর রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় কতকগুলি সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিলেন। বেগার অর্থাৎ বলপূর্ব্বক খাটাইয়া লইবার প্রথা ও বলপূর্ব্বক সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিবার প্রথা উঠাইয়া দিলেন, ও ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিয়োগ করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার নানারূপ বিপদ ঘটিল। আফগানিস্থানে একটি প্রবল দল আছে, যাহারা পছন্দ করে না যে আফগানিস্থানের সহিত ভারত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়। ইহাদের উত্তেজনায় মাঝে মাঝে আবদুররহমন ও হাবিবুল্লার ন্যায় প্রবল প্রতাপ আমীরকেও বেগ পাইতে হইয়াছিল। আমানুল্লা সৈন্যদিগের দ্বারাই সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন ও তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই দলভুক্ত ছিল। সুতরাং আমানুল্লার রাজ্যারোহণের পর এই দলের প্রতাপ বর্দ্ধিত হইল ও আমীর ও তাহাদের করতলগত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু দেশে আরও অন্য দল ছিল ও তাহারা আমানুল্লার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। সুতরাং আমীরকে এই সব দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইল। এখন তিনি পিতার হত্যাকারিদিগকে ধরিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে মুক্তিদান করিলেন। প্রকাশ্য দরবারে এই আদেশ ঘোষিত হইল। অবশেষে একটা নগণ্য লোককে হত্যাকারি সাব্যস্ত করা হইল ও তাহার প্রাণদণ্ড করা হইল। নসরুল্লা ও ইনায়েৎউল্লা কিন্তু অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু প্রজাগণ এ বিচারে সন্তুষ্ট হইল না। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, যে প্রকৃত হত্যাকারিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সৈন্যগণ যেসব সম্ভ্রান্ত পরিবারগণকে ধৃত করা হইয়াছিল ও পরে দরবারে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের মুক্তিদানে অসন্তুষ্ট হইল। তাহাদিগের ভাব গতিক দেখিয়া আমীর তাহাদিগকে কাবুল হইতে স্থানান্তরিত করিলেন। ধর্ম্মযাজকগণ নসরুল্লাকে কারাগারে বন্দীকরায় বড়ই ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইল। এই সময়ে আমীর কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

ঠিক্ এই সময়ে ভারতবর্ষে রৌলাট আইনের বিপক্ষে ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল ও উহার ফলে পঞ্জাব প্রদেশে ঘোর অশান্তির আবির্ভাব হইল। সময় বুঝিয়া কতকগুলি আফগান চরও ভারতে আগমন করিল। তাহাদের দলপতি ছিল পেশোয়ারের আফগান পোষ্টমাষ্টার। ইনি আফগানিস্থানের সর্ব্বত্র মিথ্যা সম্বাদ পাঠাইলেন যে ভারতবাসিগণ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে। রৌলট আইনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মেরই প্রতি হস্তক্ষেপ হওয়াতে হিন্দু মুসলমান উভয়েই ইংরাজে

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে ও আফগানসৈন্য ভারত আক্রমণ করিলেই উহারা তাহাদিগের সহিত যোগ দিবে। পঞ্জাবে স্থানে স্থানে যে অশান্তি হইয়াছিল, আমীরকে তাহা বিদ্রোহ বলিয়া বুঝান হইল। এই সব কারণে আফগানিস্থানে যে দল ভারতের সহিত বন্ধুত্বের বিপক্ষ, তাহাদের অনেকটা বল বাড়িল। আমীর ভাবিলেন যে যদি তাঁহার সৈন্যগণকে বিদেশীয় কোন ব্যাপারে লিপ্ত না করেন তাহা হইলে উহারা অচিরে তাঁহাকেই আক্রমণ করিবে। তাহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার এক মাত্র উপায় ভারত আক্রমণ করা, ও তাহা হইলে তাহারা দেশের কথা ভুলিয়া যাইবে ও তাঁহার সিংহাসন ও নিরাপদ হইবে। এখন তিনি ইংরাজের পরাক্রমের কথা ভুলিয়া যাইলেন। জর্ম্মাণি যে মৃতপ্রায় হইয়াছে তাহাও ভুলিয়া যাইলেন। তিনি বোধ হয় আশা করিয়াছিলেন যে বলশেভিকরা তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে, যদি তিনি ভারত আক্রমণ করেন। এই সব ভাবিয়া আমীর স্থির করিলেন যে ভারত আক্রমণ করা উচিত। ২৫ শে এপ্রিল তারিখে আফগানসৈন্য ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে ইংরাজের গ্লানিসূচক অনেক বৃত্তান্ত—যাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা—ভারতে প্রচারিত হইতে লাগিল। মে মাসের তিন তারিখে জার সাহের অধীনস্থ একদল আফগানসৈন্য খাইবার গিরিপথে তথাকার ইংরাজ বেতন-ভোগী সৈন্যদিগের সহিত বিবাদ বাধাইবার উপক্রম করিল। জার শাহ প্রকাশ করিল যে তাহার সহিত যে সৈন্য আসিয়াছে, উহারা অগ্রগামী মাত্র, পশ্চাতে বিপুল বাহিনী আসিতেছে। সে একখানি কাগজ দেখাইল যাহাতে আমীর বলিতেছেন যে ইংরাজগণ ভারতবাসিগণের উপর অত্যাচার করাতে তিনি ভারতবাসিগণের উদ্ধারার্থ ভারত আক্রমণ করিতেছেন। ডাকা নগরে আফগান সেনাপতি আসিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করিতে উক্ত নগরবাসিগণকে উত্তেজিত করতে লাগিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট জার শাহের ও আফগান সেনাপতির কার্য্য আমীরকে জানাইলেন। আমীর তাহার উত্তরে বলিলেন যে উহারা তাঁহার আদেশ ক্রমেই ঐরূপ কার্য্য করিয়াছে ও তিনি উহাদের কার্য্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি ইংরাজগণকে শীঘ্রই অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। ইতি মধ্যে খাইবার সীমান্তে আফগানসৈন্য যুদ্ধ যাহাতে বাধে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। মে মাসের পাঁচ তারিখে আফগান সেনাইংরাজাধিকৃত একস্থান আক্রমণ ও দখল করিল। এদিকে পেশোয়ারে গোলাম হায়দার খাঁ নগরবাসিগণকে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ গোলাম হায়দারের উদ্দেশ্য পূর্ব্বাহ্ণে জানিতে পারিয়া তাহাকে ও তাহার অনুচরগণকে বন্দী

করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন ও এই সঙ্গে বিদ্রোহের চেষ্টা ও বন্ধ হইল।

আফগান নায়ক দিগের মৎলব ছিল, অল্প সংখ্যক সৈন্য সীমান্ত প্রদেশে প্রেরণ করিয়া ভারতের মধ্যে যাহারা ইংরাজ-দ্বেষী তাহাদিগকে আফগান দিগের সহিত যোগ দিতে উত্তেজিত করা। সীমান্ত বাসিগণের মধ্যে যাহারা ইংরাজ দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে আফগান সেনাপতি যুদ্ধের উপকরণাদি বিতরণ করিতে লাগিলেন। আমীর তাহাদিগের নিকট অনেক আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে বড়ই নিরাশ হইলেন ও যখন পরে উহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল, তখন আফগান সমরের অবসান হইয়াছে ও আমীরের কোন লাভ হইল না। সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে ইংরাজ পক্ষে তারহীন সংবাদ প্রেরণ ব্যোমযান ও বিদারণশীল পদার্থ ব্যবহৃত হওয়াতে সীমান্ত সমরের পুরাতন প্রথা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আফগানগণ ইহা দেখিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। আমীরের সুশিক্ষিত সৈন্যগণও ব্যোমযানের ব্যাপারে বড়ই বিপন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ এই যুদ্ধে ব্যোমযান ব্যবহারে বড়ই সুফল লাভ হইয়াছিল। কি কাবুলে কি জেলালাবাদে কিম্বা যেখানেই অধিক সংখ্যক আফগান সৈন্য সমবেত হইয়াছিল সেই সকল স্থানের উপরই ইংরাজের ব্যোমযান অজস্র বোমা বর্ষণ করিয়াছিল।

আফগান সমরের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভারতীয় সৈন্যগণ এত শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইল যে তাহা দেখিয়া আফগানগণ বিস্মিত হইয়া গেল। যুদ্ধারম্ভ হইতে দশ দিনের মধ্যে আফগান সৈন্য সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া, খাইবার প্রদেশের যে যে স্থান পূর্ব্বে দখল করিয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল, ও বিজয়ী ভারতীয় সৈন্যগণ ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া ডাকা নগর অধিকার করিল। এই ডাকা-নগরে আফগানগণ তাহাদের যুদ্ধার্থে ব্যবহৃত জিনিষ পত্রের গুদাম করিয়াছিল। এই যুদ্ধে আফগান সেনাপতি স্বয়ং আহত হইলেন। মে মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে সেনাপতি যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করিয়া ইংরাজদিগকে পত্র লিখিলেন। পত্রের সুর কিন্তু কিঞ্চিৎ কড়া ছিল। তাঁহাকে উত্তরে বলা হইল যে যদি আমীর আমানুল্লা সন্ধির প্রার্থনা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে স্বয়ং ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিতে হইবে। দক্ষিণ অঞ্চলে কিন্তু আফগান দিগের অবস্থা মন্দ ছিল না। আফগান সেনাপতি নাজির খাঁ খোস্ত প্রদেশের রাজধানীতে সদলে আগমন করিয়া, তথাকার অধিবাসী মাশুদ ও ওয়াজির জাতি দিগের মধ্যে বিষম গোলযোগ বাধাইয়া দিল। ২৪শে মে আফগানদিগের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সৈন্যগণ সম্মিলিত হইয়া ইংরাজ সৈন্য আক্রমনার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইংরাজগণ তখন তাঁহাদের উক্ত অঞ্চলে যত সৈন্য ছিল তাহা একত্র করিবার জন্য কতক গুলি স্থান যাহা তাহাদের দখলে ছিল তাহা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এই কার্য্যের ফল বড়ই অমঙ্গল জনক হইল। ইহা দুর্ব্বলতার লক্ষণ ভাবিয়া মাসুদ্ ও ওয়াজিরগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল ও ইংরাজাধিকৃত যে জেলাগুলি ওয়াজিরস্থানের সংলগ্ন ছিল তাহা আক্রমণ করিতে লাগিল। এই সময়ে কতকগুলি আফগানসৈন্য ও এই অঞ্চলে দেখা দিল। অনন্তর আফগান সেনাপতি নাদির খাঁ থল্‌প্রদেশ আক্রমণ করিবার উদ্দেশে তাহার নিকটে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া উহার পশ্চিমে ও দক্ষিণে যে পর্ব্বত শ্রেণী আছে তাহা অধিকার করিয়া থল প্রদেশের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার বিরুদ্ধে অবিলম্বে কোহাট হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল। তখন এ অঞ্চলে গ্রীষ্মের আধিক্য হেতু উক্ত সৈন্যগণ. অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া তবে থলের নিকট পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহারা দেখিল যে দক্ষিণ দিক হইতে যে পথে থলে যাওয়া যায় উক্ত পথ আফগান সৈন্যগণ দখল করিয়া রহিয়াছে। ইংরাজ সেনার বাহুবলে ও পরাক্রমে আফগানগণ করম্ নদীর অপর পারে বিতাড়িত হইল। পরে থলের উত্তর দিকে যে আফগান সৈন্য ছিল তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইল ও তাহারা পরাভূত হইয়া অনেক যুদ্ধের উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

যদিও নাদির খাঁ প্রথমে কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই পরাভূত হওয়াতে উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে কোন গোলযোগ হয় নাই। খাইবার অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বেই আফগানসৈন্যদল বারম্বার পরাভূত হইয়াছিল। দক্ষিণ অঞ্চলে কিন্তু স্পিন্‌বলডক্ নামক স্থানে আফগানদিগের একটি দুর্গ ছিল তথা হইতে চামান প্রদেশের রেলপথ আক্রমণ করা সম্ভব ছিল। অতঃপর ইংরাজসৈন্য এই দুর্গ আক্রমণ করিল ও তাহাদের গোলাগুলির সাহায্যে জয়লাভ করিল। আফগানদিগের সৈন্য সংখ্যা ছয় শত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিংশ জন পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল ও একশত উনসত্তর জন ইংরাজসেনার হস্তে বন্দী হইল। আফগানিস্থানের মধ্যে এই দুর্গটি একপ্রকার অজেয় বলিয়া প্রবাদ ছিল। কিন্তু ইংরাজসেনা উহা অধিকার করাতে ইংরাজদিগের রণদক্ষতার খ্যাতি আফগানস্থানের সর্ব্বত্র প্রচার হইল। অল্পদিনের মধ্যেই আফগান দিগের ইংরাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গেল। আমীর ইতি মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইংরাজ সৈন্যকে পরাভব করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু তিনি আশা করিয়াছিলেন যে যদিও তাঁহার সৈন্য ইংরাজ সৈন্যদলকে হারাইতে না পারে, ইংরাজ ও তাহাদিগকে হারাইতে পারিবে না। তিনি আরও আশা করিয়াছিলেন যে সীমান্তবাসিগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাতে, তাঁহাকে হারাইয়া

ইংরাজদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে না। কিন্তু যখন দেখিলেন যে তাঁহার কোন আশাই সিদ্ধ হইল না, তখন তাঁহার সন্ধির প্রস্তাব করা ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না। ২৮এ মে তারিখে তিনি পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিয়া মহামান্ত ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরাল বাহাদুরকে এক পত্র লিখিলেন ও উহার সহিত তিনি তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতিগণকে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য যে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন তাহার ও একখানি প্রতিলিপি প্রেরণ করিলেন। গবর্ণরজেনেরাল বাহাদুর আমীরের পত্রের উত্তরে লিখিলেন যে যতদিন না আফগানগণ নানা প্রকারে ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন ততদিন ইংরাজ তাঁহাকে শাস্তিদিবার জন্য রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু তত্রাচ আমীর যদি কতকগুলি সর্ত্ত পালন করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে বড়লাট সাহেব সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন। এই সর্ত্তগুলি নিম্নে লিখিত হইল। প্রথমতঃ আফগান সৈন্য, ইংরাজাধিকৃত ভারতের সীমা হইতে দশ ক্রোশ তফাতে হটিয়া যাইবে। যে সমস্ত সীমান্তবাসিগণকে ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে আমীর যেন অবিলম্বে জানান যে তিনি যুদ্ধের বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন ও তাহারাও যেন ইংরাজের শত্রুতা সাধন করিতে বিরত হয়। ইংরাজদিগের ব্যোমযান সমগ্র আফগানিস্থানের উপর অবাধে গতিবিধি করিতে লাগিল, তবু এই ব্যোমযানগুলিকে গুলিকরিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। কিন্তু যদিও আমীর ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন তত্রাচ তিনি তৎক্ষণাৎ সন্ধির সমুদয় সর্ত্তে অঙ্গীকার করেন নাই। ১৮ই জুন তারিখে আমীর এক পত্র পাঠান যাহাতে সন্ধির জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন কিন্তু কতকগুলি সর্ত্ত সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন। ইংরাজগণ আমীরকে সন্ধি করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, যে তিনি যদি মোটামুটি সর্ত্ত পালনে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে রাউলপিণ্ডিতে আফগান দূতদিগের সহিত ইংরাজ প্রতিনিধিগণের সাক্ষাৎ হইবার বন্দবস্ত করা যাইতে পারে। ২৯শে জুন তারিখে আমীরের নিকট হইতে উত্তর পাওয়া গেল। তিনি লিখিলেন যে সর্ত্তগুলি সমস্তই ইংরাজদিগের স্বার্থ-পোষক ও তন্মধ্যে কতকগুলি পালন করা তাঁহার পক্ষে এক প্রকার সাধ্যাতীত। তিনি আরও লিখিলেন যে সন্ধির উদ্দেশ্যে তিনি ইতিমধ্যেই যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়াছেন ও আরও কতকগুলি আদেশ দিয়াছেন, সুতরাং তিনি যে বাস্তবিকই সন্ধির প্রার্থী, তাহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। গবর্ণরজেনারেল লর্ড চেমস্‌ফোর্ড উত্তরে লিখিলেন, যে যুদ্ধ আরম্ভ করা ও আফগানদিগের দ্বারা হইয়াছে ও এখন সন্ধির প্রস্তাব ও আফগানদিগের দ্বারা উত্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ত্তগুলি ইংরাজদিগের অনুকূল হইবারই কথা। যাহা

হউক আফগান দূতগণ যেন জুলাই মাসের শেষে ইংরাজ প্রতিনিধিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন, ইহা প্রস্তাব করিলেন।

২৬এ জুলাই তারিখে রাউলপিণ্ডি সহরে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণ মিলিত হইলেন। ইংরাজ প্রতিনিধিগণের নায়ক ছিলেন সার হ্যামিলটন গ্রাণ্ট। অনন্তর ৮ই আগষ্ট তারিখে নিম্নলিখিত সর্ত্তে সন্ধিপত্র উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করিলেন।

১। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের দিন হইতে ভারতবর্ষের সহিত আফগানিস্থানের কোন বিবাদ বিসম্বাদ হইবে না।

২। যে অবস্থায় ভারতবর্ষের সহিত আফগানিস্থানের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে আফগানিস্থানের আমীরকে ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া আফগানিস্থানে যুদ্ধের উপকরণ অর্থাৎ গোলা গুলি বন্দুক প্রভৃতি লইয়া যাইবার আদেশ রহিত করিলেন।

৩। মৃত আমীরকে বর্ষে বর্ষে যে অর্থ সাহায্য করা হইত তাহার বক্রী টাকা দেওয়া হইবে না ও ভবিষ্যতে কোন আমীরকে বার্ষিক অর্থ সাহায্য করা হইবে না।

৪। ভারতবর্ষের সহিত আফগানিস্থানের পুরাতন বন্ধুত্ব পুনঃ স্থাপিত করিতে ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট যত্নবান হইবেন, যদি তাঁহারা দেখেন যে আমীরের ইচ্ছাও সেইরূপ। আমীর যদি তাঁহার কার্য্যের দ্বারা তাঁহার বন্ধুত্বের পরিচয় দেন, তাহা হইলে ছয়মাস পরে রাউল পিণ্ডিতে পুনরায় আফগান প্রতিনিধিগণের সহিত ইংরাজ প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া যাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে মনোমালিন্যের কোন কারণ না থাকে তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

৫। ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের মধ্যে যে সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়া ছিল, ও যাহা মৃত আমীর হবিবুল্লা অনুমোদন করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান আমীরকে ও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। খাইবারের পশ্চিমে যে অংশের সীমা নির্দ্দেশ করা হয় নাই, ও যাহা আফগানগণ আক্রমণ করেন, তাহার সীমা ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ চিহ্নিত করিবেন ও আমীরকে উক্ত সীমার চিহ্ন অনুমোদন করিতে হইবে। যতদিন উক্ত সীমা নির্দ্ধারণ না হয়, ততদিন ইংরাজ সৈন্য যেখানে আছে, সেইখানেই থাকিবে।

এই সর্ত্তের সহিত আফগান প্রতিনিধিগণকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক পত্র দেন যাহাতে আমীরকে বৈদেশিক রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়। ইহার পূর্ব্বে ইংরাজদিগের অনুমতি ভিন্ন উক্ত সম্বন্ধ স্থাপনের অধিকার কোন আমীরের ছিল না। তখন তুরস্কাধিকৃত দেশসমূহে যেরূপ বিপ্লব চলিতেছিল তাহাতে আমীর ইংরেজ দিগের উপদেশ না যাচ্ঞা করিলে, তাঁহাকে কোনরূপ পরামর্শ দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে

বিবেচিত হইয়াছিল। আর ভূতপূর্ব্ব আমীরগণ ও এবিষয়ে ইংরেজের পরামর্শ না লইয়া অনেক সময় কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই জন্ম ইংরাজগণ যখন দেখিলেন যে আমীর এই সর্ত্ত ভঙ্গ করিলে তাঁহারা কিছুই করিতে পারিবেন না, তখন এই সর্ত্ত উঠাইয়া দেওয়াই ভাল বিবেচনা করিলেন। আমীরকে বৈদেশিক দেশ সমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে স্বাধীনতা দেওয়ার বিপক্ষে ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্রগণ তুমুল আন্দোলন করেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্রগণ একবাক্যে এই রাজনীতির পোষকতা করিয়াছিলেন। সার হ্যামিল্টন গ্রাণ্ট কিছুদিন পরে প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আমীরকে উক্ত স্বাধীনতা প্রদান করিতে পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিলেন ও আমীর যদি ভদ্রতার ভাষায় এই প্রার্থনা করিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

আফগান যুদ্ধের ফলে অন্যান্য যুদ্ধ যাহা হইয়াছিল তাহা নগণ্য মাত্র। তবে অন্যদিকে ইহার ফল গুরুতর হইয়াছিল। প্রথমতঃ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নামে এই অভিযোগ আনীত হয় যে তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আহতগণের চিকিৎসা ও সৈন্যগণের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাত্রার জন্য গাড়ীর বন্দবস্ত যাহা করিয়াছিলেন তাহা সন্তোষকর হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই যুদ্ধের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে অশান্তির আগুণ জ্বলিয়া উঠে তাহা এখনও একেবারে নিবিয়া যায় নাই।

প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কতদূর দোষী ছিলেন, তাহা বিচার করিতে যে যে কাগজপত্র দরকার, তাহা সমস্তই মুদ্রিত করিয়া পার্লামেণ্ট মহাসভায় প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে অভিযোগগুলি অতিরঞ্জিত, গভর্ণমেণ্টকে যত দোষী বলা হইয়াছিল, বাস্তবিক তাঁহারা সে পরিমাণে দোষী ছিলেন না। প্রথমে যে কতকগুলি ত্রুটি ছিল, তাহা সত্য। কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব উহাদিগকে শোধরাইয়া লওয়া হইয়াছিল। কাগজপত্রগুলি ভাল করিয়া পড়িলে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর এক কথা এই যে তখন ভীষণ জর্ম্মান সমরের সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে। যখন উক্ত যুদ্ধ চলিতে ছিল, তখন আফগানিস্থানের সহিত যুদ্ধের কিঞ্চিৎ আশঙ্কা ছিল বটে, কিন্তু যখন ইংরাজ বিজয়ী হইলেন, তখন তাঁহাদের সহিত আফগানিস্থানের প্রায় একটি সামান্য রাজ্য যে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে, একথা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় সামরিক বিভাগ, আফগানদিগের সহিত হঠাৎ যুদ্ধ করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলনা। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ এই যুদ্ধ আমীর ইচ্ছা করিয়া বাধাইলেন। জর্ম্মান যুদ্ধে ভারত হইতে বিস্তর রেল গাড়ী, মাল গাড়ী ভারবাহী জন্তু

প্রভৃতি ইউরোপীয় রণাঙ্গনে প্রেরিত হইয়াছিল। এইগুলি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় আড়াই লক্ষ সেনা ও যুদ্ধোপকরণ ও তাহাদের রসদ ইত্যাদি একস্থান হইতে অন্যত্র যতশীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিতে ইংরাজ সেনাপতিগণকে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইয়াছিল, ও পথের যথেষ্ট অসুবিধা থাকায় কার্য্যের কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহা অনিবার্য্য হইয়াছিল। এইরূপ নানাবিধ প্রতিবন্ধক থাকা সত্বেও সৈন্য প্রেরণ, অস্ত্রাদি প্রেরণ খাদ্য প্রেরণ প্রভৃতি ব্যাপার এত শীঘ্র ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, যে তাহা স্মরণ করিলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিচক্ষণতা ও কার্য্যতৎপরতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। যে যে স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, তথায় তাপমাত্রা ১১৪ ডিগ্রি হইতে ১১৯ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিত। সে হিসাবে পীড়ায় মৃত গণের সংখ্যা অল্পই হইয়াছিল। তবে প্রথমে প্রকৃত অবস্থা প্রচারের প্রয়াস গবর্ণমেণ্টের না থাকায় অনেক অতিরঞ্জিত কথা ভারতবর্ষীয় ও বিলাতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়াতে লোকের একটা ধারণা হয় যাহা নিতান্ত অমূলক। নিম্নে একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল। বিগত আফগান যুদ্ধে পীড়ায় মৃত সৈনিকের সংখ্যা গোরা সৈনিকের পক্ষে হাজার করা ২·৮ ও দেশীয় সৈনিকের পক্ষে হাজার করা ১·৩। শীত প্রধান ইউরোপে যুদ্ধে পীড়ায় মৃত সৈনিকের সংখ্যা হাজার করা ৩। সে তুলনায় পীড়ায় মৃত সৈন্যের সংখ্যা আফগান যুদ্ধে অনেক অল্প হইয়াছিল। কিন্তু সংবাদপত্রের ভিত্তিহীন আক্রমণে জনসাধারণের মধ্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনেকটা সুনামের ও মানের ক্ষতি হইল। ইহার কি ফল হইয়াছিল তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

সীমান্তপ্রদেশে আফগানযুদ্ধের ফল অনেক দূর গড়াইয়া গেল। এই অসভ্য দেশের সীমানারেখার স্থানে স্থানে কতকগুলি অল্পসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য দ্বারা রক্ষিত থানা আছে। যখন যুদ্ধ বিগ্রহাদি ছিল না, তখন এই সৈন্যগণ এক প্রকার প্রহরীর কার্য্য করিত ও অধিবাসিগণকে শত্রুকর্তৃক লুণ্ঠন হইতে রক্ষা করিত। কিন্তু যখন যুদ্ধ বাধিল, সংখ্যায় তাহারা এত অল্প ছিল যে শত্রু হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা তাহাদের অসাধ্য হইয়া উঠিল। তখন হয় তাহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনা অথবা তাহাদের রক্ষার্থ বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। সমরাভিজ্ঞগণের মতে শেষোক্ত পন্থা অসমীচীন বলিয়া স্থিরীকৃত হওয়াতে সৈন্যগণকে দেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইল। ভারতবর্ষীয় সৈন্যগণের দেশে প্রত্যাগমনে সীমান্তবাসী অসভ্যগণ সিদ্ধান্ত করিল যে এটা ইংরাজের নিতান্ত দুর্ব্বলতার চিহ্ন।

আর একটী কুফল ফলিল। সীমান্ত পথগুলি দস্যু হইতে নিরাপদ রাখিবার জন্য

স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে কতকগুলিকে সংগ্রহ করিয়া এক একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিযুক্ত করা হইত। শান্তির সময় ইহারা অনেক আবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয় কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত।

এই দলে সাহসী যুবকগণ ভর্ত্তি হইয়া বেতন ভোগ করিত। এই দল গঠনের উদ্দেশ্য শুভ ছিল। যে দেশে জমির অনুর্ব্বরতা নিবন্ধন অধিবাসিগণের অনেকেরই দেশের সীমানার বাহিরে না যাইলে আহার মিলিবার সম্ভাবনা অল্প, ও যাহারা অনতিদূর বিদেশে গিয়া ডাকাতি করা ভিন্ন জীবিকানির্ব্বাহের অন্য উপায় জানে না তাহাদিগকে ডাকাতি পরিত্যাগ করিয়া সাধু জীবিকা অবলম্বনে প্রবর্ত্তিত করাও একটি উদ্দেশ্য ছিল। একেত ইহারা স্বভাবতঃই রণপ্রিয় ও রণকুশল। তাহার উপর ইহারা ইংরাজনায়কদিগের দ্বারা শিক্ষিত। সুতরাং সীমান্তদেশে ইহাদের যথেষ্ট সুনাম ছিল ও অসভ্যগণ ইহাদিগকে ভয় করিত ও অবাধে শান্তিরক্ষা হইত। কিন্তু যখন আফগানদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিল, তখন ইহারা দলে দলে চাকরি ছাড়িয়া বিপক্ষ দলের সহিত যোগ দিল। সুতরাং ভারতবর্ষীয় সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরণ করিয়া এই সব ভাঙ্গাদল পুনর্গঠিত করিতে হইল।

এই দুই কারণে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বেলুচিস্থানে পূর্ব্বোক্ত সময়ের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যাইবে। যখন মে মাসে আফগানিস্থানের সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হইল, তখন বেলুচিস্থানে কোন গোলযোগের চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। সীমান্তপ্রদেশে অসভ্যগণ ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত হইবার একটু সম্ভাবনা ছিল বটে কিন্তু অন্য কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেই ইংরাজাধিকৃত সীমান্ত জেলার অন্তর্গত ওয়ানা ও অন্যান্যস্থানে সংস্থিত ভারতীয় সৈন্যদল স্থান পরিত্যাগ করিয়া হটিয়া যাইবার সম্ভাবনা জনরব হইতে লাগিল, অমনি বিপদের অঙ্কুর দেখা দিল। যদিও সেই সময় বেলুচিস্থানে রক্ষিত ইংরাজসৈন্য চামানে সমবেত হইয়া আফগানগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের স্পিনবলডক্ কেল্লা অধিকার করিলেন, তত্রাপি ওয়ানা হইতে ইংরাজ সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তনে জোব প্রদেশে অবস্থা সঙ্কটময় হইয়া উঠিল। দক্ষিণ ওয়াজিরস্থান হইতে ইংরাজাধীন স্থানীয় সেনাগণ দলভঙ্গ হইয়া জোব প্রদেশে উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে আক্রমণার্থ তাহাদের পশ্চাতে দলে দলে মামুদ ও ওয়াজিরগণ আসিয়া পড়িল। তখন জোব প্রদেশস্থ ইংরাজ সৈন্য দলে হুলুস্থুলু বাধিল। তিনটি সৈন্য নিবাস হইতে অধিবাসি সৈন্যগণ চলিয়া গেল ও পরে দলের অধিকাংশ সৈন্য দল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল—ইহারা স্থানীয় অসভ্য জাতি। শিরানি জাতি প্রকাশ্য বিদ্রোহ

ঘোষণা করিল। বেলুচিস্থানের প্রধান নগর ফোর্টস্যাণ্ডিমান হইতে লোরেলাই যাইতে একটি সুদীর্ঘ ও সহজে আক্রমণ করা যাইতে পারে এরূপ পথ আছে। সামরিক উপকরণ যাহা কিছু তাহা সমস্তই লোরেলায়ে রক্ষিত হইত। শিরানি বিদ্রোহের ফলে ফোর্ট স্যাণ্ডিমান হইতে লোরেলাইএর পথ বন্ধ হইল। অতঃপর শিরানিগণ মাসুদ ও ওয়াজিরগণের সহিত মিলিত হইয়া লুণ্ঠন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। ফোর্ট স্যাণ্ডিমানের বাজারের কিয়দংশ অগ্নিসংযোগে ধ্বংশ করিয়া লুঠ করিল। গবর্ণমেণ্টের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া দিল। পথে রক্ষী সৈনিক দল যাইবার সময় তাহাদের আক্রমণ করা হইতে লাগিল। যত কিছু গোলযোগ হইল তাহার মূল মাসুদ ও ওয়াজিরদল যাহারা ওয়ানা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারি সৈন্যগণের পশ্চাতে জোব প্রবেশ করিয়াছিল। যদি এই লজ্জাজনক প্রত্যাবর্ত্তন না ঘটিত, তাহা হইলে বোধ হয় জোব প্রদেশে শান্তিভঙ্গ বা বিদ্রোহ নাও হইতে পারিত। স্থানীয় ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ লোরেলাই জেলার মধ্যে যাহাতে কোন গোলযোগ না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করিতেই তাঁহাদিগের সকল চেষ্টা ও উদ্যম নিয়োজিত করিতে ছিলেন, কেন না যদি ওই বিদ্রোহবহ্নি ধনপূর্ণ কোয়েটা জেলায় কিম্বা সিবি জেলায় কিম্বা রেলপথে জ্বলিয়া উঠিত তাহা হইলে ব্যাপার ভীষণ আকার ধারণ করিত। কিন্তু যখন আগষ্ট মাসে আফগানিস্থানের সহিত সন্ধি হয় তখন এই আগুণ আপনি নিবিয়া গিয়াছিল ও তখন স্থানীয় অধিবাসিগণের সহিত একটা বন্দবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজগণ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া জোব প্রদেশে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপনের জন্য প্রভূত আয়াস ও পরিশ্রম করিয়া আসিতে ছিলেন চল্লিশ দিনের মধ্যে তাহার সুফল বিনষ্ট হইয়া গেল। এখন তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করা সময়, সাহস, সহিষ্ণুতা, ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ।

সীমান্ত প্রদেশে অন্যান্য নানা জাতীয় অসভ্যগণ যে আগুন জ্বালাইয়া ছিল, তাহা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে আফ্রিদি জাতিই সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। ইহারা প্রথমে শান্ত ছিল কিন্তু পরে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের সঞ্চার করণে চেষ্টা করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ইংরাজ বিদ্বেষী কয়েকজনকে শাস্তি দিবার জন্য দণ্ডবিধানের অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল। কেবল তাহা নহে। আফ্রিদিদিগের অজেয় দুর্গ চোরা ইংরাজ সেনা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। আফ্রিদিদিগের পক্ষে এই শাস্তি ও শিক্ষা যথেষ্ট হইয়াছিল। পরে মাসুদ ও ওয়াজিরগণ প্রকাশ্যভাবে ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। ইহাদের দেশের পূর্ব্বে বান্নু ও দেরা ইসমাইল খাঁ জেলা। পশ্চিমে আমীরের রাজ্য ও

ইংরাজাধিকারের সীমানা। ইহাদের মধ্যে আমীরের চরগণ কিছুদিন হইতে ইংরাজ বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া আসিতেছিল। ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রিংশ সহস্র যোদ্ধা সমবেত করিতে পারে ও তাহাদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর জন নূতন আবিষ্কৃত ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রধারী। সুতরাং সমরে তাহারা সহজে পরাজিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। তাহারা এত উত্তেজিত হইয়াছিল যে যখন আফগানিস্থান ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিল তখনও ইহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাসনা পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুকতা দেখাইয়াছিল। এদিকে আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে মাসুদ ও ওয়াজিরগণ যখন তখন ইংরাজাধিকৃত দেশ আক্রমণ করিতে লাগিল। ইহার ফলে বান্নু ও দেরা ইসমাইল খাঁ জেলার লোকের প্রাণ ও ধন নিরাপদ রহিলনা ও অবশেষে এই দৌরাত্ম্য অসহ্য হইয়া উঠিল। অক্টোবর মাসে এই আপদ নিবারণের জন্য ওয়াজির ও মাসুদগণকে শাস্তি দেওয়া সাব্যস্ত হইল। তাহাদিগকে এক মন্ত্রনা মজলিসে নিমন্ত্রণ করা হইল ও বলা হইল যে তাহারা যে ইংরাজাধিকৃত স্থান আক্রমণ ও লুট করিয়া ক্ষতি করিয়াছে, তাহা পূরনার্থে তাহারা কি প্রস্তাব করে তাহা শুনিবার জন্যই উক্ত মন্ত্রণা মজলিস আহুত হইয়াছে। তাহাদিগকে আরও জানান হইল, যে ইংরাজগণ তাহাদের দেশের মধ্যে পথ নির্ম্মাণ করিতেও স্থানে স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন ও যদি তাহারা ইংরাজগণ যে যে প্রস্তাব করিতেছেন তাহাতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে ইংরাজগণ তাহাদিগকে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণকে স্থানান্তরিত করিবার সময় দিয়া পরে আকাশ হইতে ভাষণ গোলাবৃষ্টি করিয়া তাহাদের দেশ ধ্বংশ করিয়া দিবেন। আফ্রিদগণ ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে, তাহাদের দেশের উপর গোলাবৃষ্টি করা হইল কিন্তু যখন তাহাতেও তাহারা সম্মতি দান করিল না, তখন অগত্যা তাহাদিগকে দমনার্থে একদল সৈন্য দাতাখেল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। টোচি ওয়াজিরগণ, যাহাদের বিরুদ্ধে ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হয়, এখন বশ্যতা স্বীকার করিল। অনন্তর ইংরাজ সৈন্য দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া জন্দোলা নামক স্থানে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইল। ডিসেম্বর মাসে আঠার তারিখে ইংরাজসৈন্য যাত্রা আরম্ভ করেন। প্রথমে দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় ও উভয় পক্ষেই অনেকে যুদ্ধে নিহত হয়। কিন্তু যদিও অসভ্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচুর বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারা কিছুতেই ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিল না। তাহারা সভা করিয়া স্থির করিল যে ইংরেজের প্রস্তাব স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা অল্পবয়স্ক তাহারা উহাতে সম্মত হইল না, ও এখনও তাহাদের সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। তাহাদের শত্রুতাচরণের

কারণ এই যে আফগান চরগণ ইতিপূর্ব্বেই তাহাদিগকে ইংরাজবিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল ও তাহারা আশা করিয়াছিল যে যদিও আমীর সন্ধি করিয়াছেন তত্রাচ অবিলম্বে তাহাদের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিবেন। কিন্তু তাহাদের এই আশা পূর্ণ হয় নাই ও এখন আশা করা যায় যে তাহারা অচিরে ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইবে। কেননা, এই যুদ্ধে উহারা যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে সেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত আর কখন হয় নাই। সুতরাং আশা করা যায় যে এই অসভ্যগণ সভ্যতার সহিত সংগ্রাম করা তাহাদের পক্ষে অসাধ্য বুঝিতে পারিয়া ইংরাজের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে।

অতঃপর সীমান্ত প্রদেশে কি রাজনীতি অবলম্বন করা উচিত তাহা ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের বিবেচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে অনুসৃত পন্থা আর এখন চলিবে না। প্রথমতঃ এই রাজনীতি যুদ্ধ বিগ্রহের সময় বিফল হয়। দ্বিতীয়তঃ বিগত পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধের ফলে সীমান্তবাসি অসভ্যগণের ও মতিগতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এমন কি বেলুচিস্থান, যাহা ইতিপূর্ব্বে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া সীমান্ত ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিত, এখন তথায় ও এভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই প্রদেশ ভারতবর্ষ ও পশ্চিম আসিয়ার মধ্যে অবস্থিত। সম্প্রতি আফগানিস্থানে ও পারস্যে রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়াতে, এখানেও সেই পরিবর্ত্তনের ঢেউ আসিয়া লাগিয়াছে। এখন আর এদেশের লোকেরা অশিক্ষিত নাই ও তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, যে নিকটস্থ অন্যান্য দেশের অবস্থার উপর তাহাদের নিজের দেশের অবস্থা অনেকটা নির্ভর করিতেছে। কেবল বেলুচিস্থানে কেন, সমগ্র সীমান্ত অঞ্চলের সম্বন্ধে এই কথা খাটে। এখনও কিছুদিন যে তথায় শান্তিরক্ষার্থ অনেক সৈন্য রাখিতে হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই রাজনীতি সফল করিতে হইলে তথায় রাস্তা নির্ম্মাণও সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে বিপুল অর্থব্যয় করিতে হইবে। এ অঞ্চলে শান্তিরক্ষা করিতে হইলে দুইটি বিষয় আবশ্যক। প্রথমতঃ শীঘ্র আক্রমণ করা ও দ্বিতীয়তঃ গোলযোগের চিহ্ন প্রকাশ হইবামাত্র তাহার প্রতিবিধানের জন্ম যুদ্ধারম্ভ করা। কাজেই রাস্তা ভাল করা ও যথেষ্ট সৈন্য রাখা অনিবার্য্য। যদিও এই দুইটিই বহুব্যয় সাপেক্ষ ও তাহা ভারতবর্ষকেই বহন করিতে হইবে, তত্রাচ যাঁহারা ভারতরক্ষার বর্ত্তমান অবস্থার সহিত সম্যকরূপে পরিচিত আছেন, তাঁহারা কেহই এই বিপুল অর্থ ব্যয় স্বীকারে আপত্তি করিবেন না। এখন ভারতবর্ষে স্বায়ত্বশাসন মূলক নূতন রাজনীতি প্রবর্ত্তিত হইতে চলিল, সুতরাং এখন সীমান্তপ্রদেশে গোলযোগ লইয়া ব্যাপৃত থাকা চলিবেনা। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কাহার কাহার

ধারণা যে সীমান্ত সম্বন্ধীয় রাজনীতি ইংলণ্ডেরই বিবেচ্য বিষয় উহার সহিত ভারতবর্ষের কোন সম্পর্ক নাই। এই ধারণার মূল যাহাই হউক না কেন, ইহা নিশ্চয় যে যতদিন ইহা পরিত্যক্ত না হয়, ততদিন এই আশঙ্কা থাকিবে যে যখন ভারতবাসিগণের হস্তে রাজ্য শাসনভার ন্যস্ত হইবে, তখন হয়ত তাঁহারা সীমান্তপ্রদেশে শান্তিরক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি না করিয়া উক্ত বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন।

জর্ম্মাণ যুদ্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা হইয়াছে তাহার ফলে ও নানাবিধ নূতন অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হওয়াতে ভারতবর্ষের সামরিক বিভাগের সংস্কার যে একান্ত আবশ্যক হইয়াছে, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। মেসোপটেমিয়ায় ও সীমান্তপ্রদেশে যুদ্ধে যে সকল বিশৃঙ্খলা ও বেবন্দবস্ত দেখা গিয়াছে, তাহাতে ও উক্ত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আরও প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হওয়াতে ও যুদ্ধার্থ সংগৃহীত সৈন্যদল ভঙ্গের আদেশ হওয়াতে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে কত সৈন্য রাখা হইবে এই প্রশ্নের আশু মীমাংসা আবশ্যক হইয়াছে। তজ্জন্য লর্ড এশারের সভাপতিত্বে এই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য বর্ষের শেষে এক কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই কমিটি ভারতবর্ষীয় সামরিক বিভাগ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই বিবেচনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। অতঃপর প্রধান সেনাপতি গবর্ণর জেনেরালের কার্য্যকারি সভার সভ্য থাকিবেন কিনা, তাহাও বিবেচিত হইবে। এই কমিটির সভ্যগণ যোদ্ধা ও অযোদ্ধা উভয় দল হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তবে যোদ্ধা সভ্যের সংখ্যা অধিক। দুইজন ভারতবর্ষীয়—সার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত ও সার ওমারহায়ৎ খাঁ ও ইহার সভ্য ছিলেন। কিসে ভারতবর্ষের সৈন্যদল ভবিষ্যতে জাতীয় সৈন্যরূপে বিবেচিত হয় ও ভারতবাসিগণ উহাকে একটি গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করেন, ও স্বদেশ রক্ষার্থ সম্যক প্রকার সক্ষম বিবেচনা করেন এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসার ভারও উক্ত কমিটির হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্তর্দেশীয় রাজনীতি।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এমন ছিল যে তাহাতে সহজেই সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইউরোপীয় মহাসমরের ফলে ভারতবর্ষের নানাজাতির মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে একটা মোটামুটি একতা সাধিত হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে রাজনৈতিক দলাদলিরও সৃষ্টি হয়।

গতবর্ষের বিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড প্রণীত সংস্কার প্রস্তাব লইয়া মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী দলে বিষম মতভেদ হইয়াছিল। প্রথম দল বলেন যে যদিও উক্ত সংস্কার প্রস্তাব কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে আরও উদার হওয়া উচিত ছিল, তথাচ ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর রাজনৈতিক উন্নতি লাভের পক্ষে ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিবে। অপর পক্ষে চরমপন্থীগণ বলেন যে উক্ত সংস্কার প্রস্তাব অসন্তোষকর ও আশাপ্রদ নহে ও উহা দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে না।

যাহা হউক বর্ষের প্রারম্ভে যখন ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হওয়াতে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখন মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় দলের মধ্যেই ভাবগতিক ও অন্য প্রকার হইল। তখন বিপদের দিন চলিয়া গিয়াছে, তখন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে রাজ্যের কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা ছিল না। বোধ হয় সেই কারণেই দেশীয় সংবাদপত্রগণ এখন গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি কার্য্যের বিপক্ষে প্রচণ্ড মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। উভয় দলেরই মধ্যে একটা সন্দেহ হইল যে এখন যুদ্ধ মিটিয়া যাওয়াতে যখন ইংরাজগণ নিরাপদ হইয়াছেন, তখন হয়ত তাঁহারা ভারতবাসিগণকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিবার অঙ্গীকার না ও পালন করিতে পারেন। ১৯১৭ অব্দের বিংশ আগষ্টের ঐতিহাসিক ঘোষণা দ্বারা উক্ত অঙ্গীকার দৃঢ়ীভূত হওয়াসত্ত্বেও এই সন্দেহ উভয় দলের মধ্যেই উদয় হইল। বোধ হয় এই সন্দেহ দ্বারা চালিত হইয়াই উভয় দলে সংস্কার প্রস্তাবে যাহা ছিল তাহা ব্যতীত আরও অনেক অধিকার প্রার্থনা করিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত তিলক সার ভ্যালেণ্টাইন্ চিরল নামক একজন বিলাতী সংবাদপত্র লেখকের নামে মানহানির দাবি করিয়া যে মকর্দ্দমা করিয়াছিলেন, তাহা হার হওয়াতে, দেশের লোকে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, এবং ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক আন্দোলনকারিদের মধ্যে যাঁহারা এখনও শ্রীযুক্ত তিলকের সহিত একমত হয়েন নাই তাঁহারাও সন্দেহ করিতে

লাগিলেন যে হয়ত দেশে রাজদ্রোহের সঞ্চার হইয়াছে এই অজুহাতে ইংরাজগণ শাসন সংস্কার প্রস্তাব স্থগিত রাখিবেন।

বিগত বর্ষের বিবরণীতে উক্ত হইয়াছে যে মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড প্রণীত শাসন সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও চরমপন্থীগণ কিছু অস্থির ও উত্তেজিত হইয়াছিলেন। উক্ত প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় কন্‌গ্রেস মহাসভার একটি বিশেষ অধিবেশন হয় ও তথায় স্থিরীকৃত হয় যে দুই চারিটি বিষয়ে মধ্যম পন্থীগণের মত সম্মানার্থ উহা আংশিক গ্রহণ করা হউক, কারণ কন্‌গ্রেস মহাসভা উভয় পন্থী লইয়া গঠিত। ১৯১৮ সালে দিল্লীতে উক্ত মহাসভার যে অভিবেশন হয় তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মীমাংসা পরিত্যক্ত হইল ও চরমপন্থীমতেরই প্রাধান্য স্থাপিত হইল। শুধু তাহাই নহে। কন্‌গ্রেস শ্রীযুক্ত তিলক ও আর কয়জনকে তাঁহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ ইউরোপে শান্তি স্থাপনোদ্দেশে গঠিত মহাসভায় প্রেরণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। আমাদের ভাবী সম্রাটের ভারতে আগমন উপলক্ষে তাঁহাকে রাজভক্তির সহিত অভিনন্দনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। এই সব কারণে চরমপন্থীদলের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। বিবি বেসাণ্ট এখন কন্‌গ্রেস পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হোমরুল লিগ নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। উহার উদ্দেশ্য রাজ্যশাসন ভার ভারতবাসীগণের হস্তে অর্পণ করা। কিন্তু সেখানে আর তাঁহার প্রাধান্য না থাকায় তিনি ন্যাসানাল হোমরুল লিগ নামে একটি নূতন সভার সৃষ্টি করিলেন। ইহার সুর অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ নরম ছিল। বিশেষতঃ রৌলাট বিল সম্বন্ধে চরমপন্থীদিগের সহিত এই নূতন সভার মতের মিল ছিল না।

মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড প্রণীত শাসন সংস্কার প্রস্তাব সম্বন্ধে ইংরাজ-সম্পাদিত এদেশীয় সংবাদপত্র সমূহে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইতে লাগিল, উক্ত প্রস্তাব প্রবর্ত্তিত হইলে নানাবিভাগীয় রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যেরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, গত কয় বৎসরের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে যে রাজনৈতিক মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ইংলণ্ডীয় জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার দেখিয়া রাজনীতি অনুশীলনকারি ভারতীয়গণ বড়ই চিন্তাকুল হইলেন। তাঁহারা আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে ইউরোপীয় যুদ্ধ স্থগিত হওয়াতে এদেশীয় ইংরাজবৃন্দ প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারের বড় একটা অনুকূলতা করিবেন না। এই আশঙ্কা শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়েরই মনে উদিত হইল। আবার ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণের মধ্যে তুরস্কের সুলতানের খালিফত্ব ও মুসলমানদিগের পবিত্র তীর্থস্থানগুলি নিরাপদ থাকা সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন হইতে লাগিল। যদি ১৯১৯ সালের প্রারম্ভে তুরস্কের সহিত সন্ধির সর্ত্ত প্রকাশ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে প্রকৃত

অবস্থা অবগত হইয়া মুসলমানগণ এত অধিক উত্তেজিত হইতেন না। কিন্তু বিলাতের সংবাদপত্রগণ তুরস্কের অপরাধের জন্ম নানারূপ শাস্তি ও নিগ্রহ হইবে ইহা প্রচার করাতে, এদেশীয় মুসলমানগণ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে হয়ত তুরস্কের সহিত সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারণে তাহাদিগের মত ও অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে। শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলমানগণ সকলেই ভাবিতে লাগিলেন যে এখন যখন ইংরাজগণ বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের রাজভক্তি ও সাহায্যদান বিস্মৃত হইবেন। তাহার উপর খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি দারুণ দুর্ম্মূল্য হওয়াতে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে যারপর নাই অভাব ও কষ্ট হইতে লাগিল। ভারতবর্ষের জনসাধারণের এই সংস্কার যে তাহাদের যাহা কিছু অভাব বা অসুবিধা হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা মোচন করিবেন। তজ্জন্য তাহারা গবর্ণমেণ্টকেই পূর্ব্বোক্ত দুর্ম্মূল্যতার জন্ম দায়ী সাব্যস্থ করিল। এই সব কারণে দেশের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে তাহাতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল।

গবর্ণমেণ্ট শত চেষ্টা করিলেও এই আশঙ্কা মোচন করিতে সমর্থ হইতেন না। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড প্রণীত সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশিত হইলে ও তৎসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার জন্ম লর্ড সাউথবরো-প্রমুখ কমিটি নিযুক্ত হইলে, দেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায় ও রাজকর্ম্মচারিগণ একটু ভীত হইলেন। তাঁহারা প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। নরম পন্থী ও চরমপন্থী উভয় দলই উক্ত প্রস্তাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না, কেননা তাঁহারা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হয় নাই। এই সময় প্রকাশ হইল, যে প্রস্তাবিত সংস্কার তাঁহাদিগের প্রার্থনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এ দেশীয় আন্দোলনকারিগণ শাসন কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভের কোন সুবিধা পান নাই। সুতরাং প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিবার পথে যে সমস্ত অন্তরায় ছিল তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে অক্ষম ছিলেন। উক্ত প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পর পার্লামেণ্ট মহাসভা কর্তৃক উহা বিবেচিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। এজন্য গবর্ণমেণ্টের সাধু অভিপ্রায়ের উপর তাহাদের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল।

ফলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আন্দোলনকারিগণ, যাহাতে তাঁহাদের মতানুসারে শাসনসংস্কার প্রস্তাব পরিবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। মুসলমান সমাজে তুরস্কের সহিত সন্ধি সম্বন্ধীয় আন্দোলন ও দ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্যতা সাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষ ভাবের সৃষ্টি করিল।

শিক্ষিত সম্প্রদায় যে আশঙ্কা করিতেছিলেন যে তাঁহাদিগের রাজনৈতিক উন্নতির আশা পূর্ণ না হইতে পারে, তাহা আর একটি কারণে বদ্ধমূল হইল। সে কারণ, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় রৌলাট আইন নামক দুইটি আইনের প্রবর্ত্তনা। ১৯১৮ সালে সার সিড্‌নি রৌলাট প্রমুখ একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি দেশের অনেকাংশে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় যে বিপ্লবকারি আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধীয় ঘটনাবলী পরীক্ষা ও বিবেচনা করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের মন্তব্যে তাঁহারা দেখাইলেন যে কেবল বাঙ্গালাদেশেই ১৯০৬ হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৩১১টি রাজনৈতিক আন্দোলন ঘটিত হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অত্যাচার হইয়াছে। তাহাদিগের সহিত সংলিপ্ত সন্দেহে একসহস্র ব্যক্তি অপরাধিরূপে বিচারালয়ে অভিযুক্ত হয়। তন্মধ্যে কেবল ৮৪ জন দোষী বলিয়া সাব্যস্ত ও দণ্ডিত হয়। তাহাদের বিপক্ষে অভিযোগ গুলি বড়ই ভয়ানক, তাহারা নানাবিধ লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি গুরুতর পাপ করিয়াছিল। আর সরকারী ডিটেকটিব (টিক্‌টিকি) বিভাগ অনুসন্ধান করিয়া যে সব গুপ্ত ব্যাপারের সন্ধান পাইলেন, ও যাহা রৌলাট কমিটির সদস্য গণকে দেখান হইয়াছিল, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে বিপ্লবকারিগণ দেশের সর্ব্বত্র ছাইয়া পড়িয়াছিল ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে তাহা দিগের রাজদ্রোহী মতের যথেষ্ট প্রচার হইয়াছিল। জর্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুলিস কর্ম্মচারিগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও দোষিগণকে ধরিতে অনেক সময় অকৃতকার্য্য হইয়াছিল, কেননা খুন ডাকাতির ভয়ে কেহই তাহাদের বিপক্ষে পুলিসকে কোন সংবাদ দিতে সাহসী হইত না। কিন্তু যুদ্ধারম্ভের পর যেই ভারতরক্ষা আইন পাস হইল ও উক্ত আইনের দ্বারা যাহারা রাজদ্রোহ সূচক অপরাধে দোষী তাহা দিগের উপর কতক গুলি বাঁধাবাধি নিয়ম করা হইল, অমনি উক্ত অপরাধির সংখ্যা কমিয়া গেল। ইহা দেখিয়া রৌলাট কমিটি সিদ্ধান্ত করিলেন যে যখন ভারত রক্ষা আইনের দ্বারা এই সব অত্যাচার দমন করা সম্ভব হইয়াছে তখন ভবিষ্যতে ও সেইরূপ কোনে একটা আইন করা উচিত যাহা যত দন না উঠাইয়া দেওয়া হয়, ততদিন বাহাল থাকিবে। ভারতরক্ষা আইন যুদ্ধান্তে শান্তির পর ছয় মাস মাত্র বাহাল থাকিবে। তাহার পর যদি পূর্ব্ব অত্যাচার পুনরায় ঘটিতে থাকে তখন কোন আইনের বলে তাহা দমন করা যাইবে? আবার যে বিপ্লবকারিগণ পুনরায় অত্যাচার করিতে আরম্ভ না করিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? সুতরাং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত দুইটি আইন ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনুমোদনার্থ আনয়ন করিলেন। এই দুই আইন লইয়া দেশে ভীষণ ও বিভীষিকাময় আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। সুতরাং এসম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তখন যুদ্ধাবসানে শান্তির সূচনা দেখা দিয়াছে। সুতরাং ভারত রক্ষা আইন উঠিয়া যাইবার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। উহা উঠিয়া গেলে রাজদ্রোহ সূচক অত্যাচার দমনে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অবশ্যই খর্ব্ব হইবে। যাহাতে সেই ক্ষমতা খর্ব্ব না হয় ও অপ্রতিহত থাকে তাহার ব্যবস্থা করাই প্রথম আইনের উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ ভারতরক্ষা আইন উঠিয়া গেলে যত রাজদ্রোহি তখন কারাবদ্ধ ছিল তাহাদিগের সকলকেই তৎক্ষণাৎ কারামুক্ত করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই নানাবিধ লোমহর্ষণ কার্য্য করিয়াছে। তাহারা মুক্ত হইয়া যে একেবারে সকলে শান্ত ও নিরীহ হইবে, তাহা অনুমান করা সঙ্গত হইত না। সুতরাং প্রথম আইনের দ্বারা রাজদ্রোহজনিত মামলা বিচার করিবার জন্য একটি নূতন বিচারালয় গঠন করিবার প্রস্তাব করা হয়। এই বিচারালয়ে তিন জন হাইকোর্টের জজ বিচারক হইবেন কিন্তু এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না। কিন্তু রাজদ্রোহসূচক প্রত্যেক মকর্দ্দমার বিচারের জন্য এই আদালত গঠিত হইবে না। কেবল যখন গবর্ণরজেনারেল বাহাদুরের বিশ্বাস হইবে যে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে রাজদ্রোহ মূলক অত্যাচারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন সেই প্রদেশে এই প্রকারের মকর্দ্দমার বিচারের জন্য উক্ত আদালত গঠিত হইবে। আবার যখন গবর্ণরজেনেরালের ধারণা হইবে যে কোন প্রদেশে এমন সব অনুষ্ঠান ও আন্দোলন হইতেছে যে তথায় রাজদ্রোহ সংক্রান্ত অত্যাচারের সম্ভাবনা তখন তিনি সেই প্রদেশের গবর্ণরকে কতকগুলি নূতন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, যথা, যাহারা উক্ত আন্দোলনে সংলিপ্ত তাহাদিগের নিকট শান্তি রক্ষার জন্য জামীন লইতে পারিবেন, অথবা তাহাদিগকে স্থান বিশেষে বাস করিতে বাধ্য করিতে পারিবেন অথবা তাহাদিগকে কোন কার্য্য বিশেষ হইতে নিরত হইতে হুকুম দিতে পারিবেন। যাহাতে যথেষ্ঠ প্রমানাভাব সত্বে ও কোন ব্যক্তির উপর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য এই আইনে ইহা নির্দ্দিষ্ট হয় যে কোন ব্যক্তির উপর পূর্ব্বোক্ত হুকুম জারি করিবার পূর্ব্বে তাহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত কাগজ পত্র আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট প্রমান আছে দেখিয়া তবে হুকুম জারী করা হইবে। এই পরীক্ষা একজন জজ ও একজন বেসরকারি দেশীয় ব্যক্তি করিবেন। কিন্তু যদি গবর্ণরজেনেরাল দেখেন যে কোন প্রদেশে রাজদ্রোহ সংক্রান্ত অত্যাচার এত অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে, যে শান্তি ভঙ্গের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে উক্ত প্রদেশের গবর্ণর যাহাদিগকে উক্ত অত্যাচারে লিপ্ত সন্দেহ করিবেন তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে ও ইচ্ছামত যে কোন সর্ত্তে কারাবদ্ধ রাখিতে পারিবেন। এই আইনে আবশ্যক বোধ হইলে কোন কারাবদ্ধ বা নজরবন্দী ব্যক্তির কারাবরোধের সময় বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা

ও প্রদত্ত হয়। অর্থাৎ এই আইনের উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টকে ভারতরক্ষা আইন উঠিয়া যাইলে পর রাজদ্রোহ দমন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা। অর্থাৎ ভারতরক্ষা আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যেমন রাজদ্রোহ দমনে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, পাছে উক্ত আইন উঠিয়া গেলে পুনরায় সেইরূপ অক্ষম না হন তাহারি ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয় রৌলাট আইনের উদ্দেশ্য ফৌজদারি আইনের পরিবর্ত্তন। অতঃপর যদি কাহারও নিকট রাজদ্রোহ উত্তেজক কোন কাগজ পাওয়া যায়, ও যদি ইহা প্রমান হয় যে উক্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য উক্ত কাগজ প্রচার করা, তাহা লইলে তাহার কারাদণ্ড হইবে। যদি কোন অপরাধী নিজ দোষ স্বীকার করে ও অন্যান্য অপরাধীর বিপক্ষে গবর্ণমেণ্টকে খবর দিয়া সাক্ষী হয় তাহা হইলে তাহাকে তাহার সঙ্গীদিগের প্রতিহিংসা-মূলক অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইতে পারিবেন। এপর্য্যন্ত কতকগুলি অপরাধে প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হইতে পারিত না। নূতন আইনে এই ব্যবস্থা হইল যে প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি আর দরকার হইবে না এবং জেলার কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বাহ্নে পুলিসের দ্বারা তদন্ত করিয়া কাহাকেও দোষী মনে করিলেই তাহার বিরুদ্ধে মকর্দ্দমা রুজু হইবে। কোন ব্যক্তি রাজদ্রোহ অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহার কারাবাসের সময় ফুরাইয়া যাইলে উক্ত আদালত তাহার নিকট দুই বৎসরের অধিক কালের জন্য মুচলেখা লিখাইয়া লইতে পারিবেন।

যে সময় পূর্ব্বোক্ত দুইটি আইনের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট উত্থাপিত করেন, তাহার পূর্ব্বেই সাধারণের মনে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় উক্ত আইন দ্বয়ের ভীষণ প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে গবর্ণমেণ্ট যে ভারতবর্ষের প্রতি সুবিচার করিতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহারা যুদ্ধের সময় যে শাসন সংস্কার সম্বন্ধে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা যে তাঁহারা পালন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা যে ভারতবর্ষের উন্নতির পথে বিষম অন্তরায় নিক্ষেপ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, উক্ত দুই আইনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সব কারণে দেশের মধ্যে ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হইল।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ফেব্রুয়ারি মাসে যে অধিবেশন হয়, উক্ত দুই আইন লইয়া আলোচনা করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া ছিলেন যে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড প্রণীত শাসন প্রণালী সংস্কার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে এদেশে শান্তি রক্ষার জন্য প্রথমোক্ত আইনটি পাশ হওয়া উচিত। তাঁহাদের কোন দুরভিসন্ধি না থাকাতে তাঁহারা এই দুই আইনের বিপক্ষে কেন যে
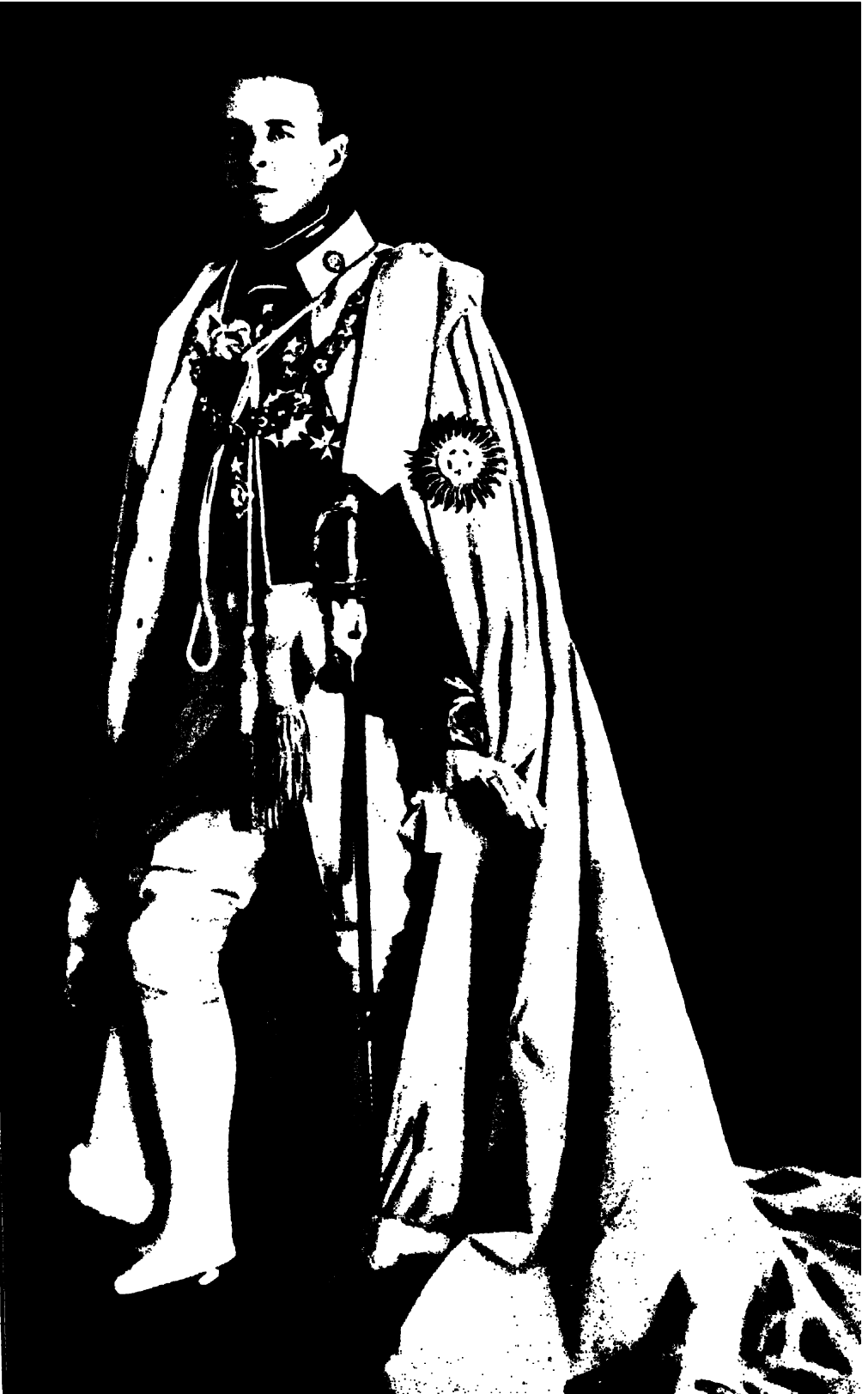
এত প্রচণ্ড প্রতিবাদ হইতেছে তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। যে আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে, দেশের প্রতিনিধিগণ যে সে আইন অনুমোদন করিতে পারেন না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু প্রতিবাদ এরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল যে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ছিলেন। সত্যবটে আইনে এমন কিছু ছিল না যাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ জন্মাইতে পারে। কিন্তু সাধারণের মধ্যে এই সন্দেহ জন্মিয়াছিল, যে এই আইনদ্বয় অপব্যবহার করা হইবে ও গবর্ণমেণ্ট যে ভারতীয়গণের উন্নতির প্রতিকূল তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে। যদিও মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার প্রস্তাব ১৯১৮ অব্দের শেষে প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু উহা বিবেচনা করিবার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মত তখন ও প্রকাশ হয় নাই ও যে আইন পার্লামেণ্ট মহাসভা পাশ করিলে উক্ত সংস্কার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা ও তখন প্রস্তুত হয় নাই। এই সব কারণে গবর্ণমেণ্ট শতচেষ্টা সত্বে ও সাধারণের মন হইতে পূর্ব্বোক্ত সন্দেহ নিষ্কাশিত করিতে পারিলেন না। যদি গবর্ণমেণ্ট উক্ত দুই আইনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্য উক্ত সন্দেহ দূর হইত। কিন্তু তাঁহাদের ও রৌলাট কমিটির বিশ্বাস ছিল যে উক্ত আইনদ্বয় দেশে শান্তিরক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। সুতরাং প্রতিবাদের ভয়ে উক্ত আইন দ্বয় পাশের বাসনা পরিত্যাগ করিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করাহইত।

ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের আরম্ভে গবর্ণরজেনেরাল বাহাদুর দেশের অবস্থা আলোচনা করিয়া এক বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু ঐ বক্তৃতার যে অংশে রাজকীয় বিভাগ সমূহের উল্লেখ ছিল, সেই অংশ লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ তীব্র সমালোচনা করিলেন। কিছুদিন হইতে দেখা যাইতে ছিল যে কি বিদেশীয় কি দেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণ শাসনসংস্কার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে তাঁহাদিগের অবস্থা ভবিষ্যতে কিরূপ দাঁড়াইবে তৎসম্বন্ধে ঘোর সন্দিহান হইয়াছেন। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য গবর্ণরজেনেরাল বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতায় দেখাইলেন যে রাজকর্ম্মচারি গণের উক্ত আশঙ্কার কোন কারণ নাই কেননা তাঁহাদিগের ভবিষ্যতে উন্নতির পথে কোন বিঘ্ন হইবেনা ও তাঁহাদিগকে কোন রূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে না। এই বক্তৃতা দ্বারা রাজকর্ম্মচারিগণের সন্দেহ অনেকটা দূর হইল ও তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় ইতি পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্টের সাধু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন, ও তাঁহাদিগের সন্দেহ এই বক্তৃতায় আরও বৃদ্ধি হইল। তাঁহারা বড়লাট সাহেবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক অন্যায় কথা রটনা করিলেন ও গবর্ণমেণ্ট যে

শাসন সংস্কারে আন্তরিক অভিলাষী নহেন তাহাও সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম আইনটি লইয়া যে তর্ক বিতর্ক হইল তাহা হইতে দেখাগেল যে আইনের বিরোধীগণ উহার একদিক দেখিতেছেন ও উহার পক্ষে যাঁহারা তাঁহারা ইহার অন্য দিক দেখিতেছেন। সার ভার্ণি লভেট্ যিনি রৌলাট কমিটির একজন সদস্য ছিলেন, কমিটি যে সমস্ত ঘটনার কাগজ পত্র দেখিয়া তাঁহাদিগের সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তাহার বর্ণনা করিলেন। সার উইলিয়াম ভিনসেণ্টের হস্তে আইন পাস করাইয়া লইবার ভার দিল। তিনি রাজবিদ্রোহিগণের কতকগুলি চিঠি, যাহা কোন প্রকারে গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিয়াছিল, পাঠ করিয়া এক প্রকার প্রমাণ করিলেন যে বাঙ্গালা প্রদেশের বিপ্লবকারিগণ ভারতরক্ষা আইন উঠিয়া গেলে, রাজবিদ্রোহ অপরাধে যাহারা কারাবদ্ধ ছিলেন, তাহাদিগের মুক্তি লাভের প্রতীক্ষা করিতেছিল ও তাহারা খালাস হইলেই, তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় রাজদ্রোহসূচক অত্যাচারাদি আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রাজকর্ম্মচারিগণ বারম্বার বলিলেন যে এই আইন কেবল রাজদ্রোহিগণের দমনার্থ ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই আইনের বিরোধিগণের সন্দেহ দূর করিতে পারিলেননা। আইনের সমর্থনকারিগণ সত্য ঘটনার বিবরণ আবৃত্তি করিয়া আইনের আবশ্যকীয়তা দেখাইতে প্রয়াস পাইলেন। বিরোধিগণ কেবল তর্কের উপর নির্ভর করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে এই আইন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসিগণের রাজভক্তির উপর কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন ইত্যাদি। বেসরকারি দেশীয় সদস্য গণের আপত্তি মাননীয় প্যাটেল নামক মহারাষ্ট্রী সদস্যের বক্তৃতা হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলেন—"যখন গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসিগণের হস্তে দেশের শাসনভার অর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ও যদ্দারা দেশের নানাবিধ মঙ্গল সাধিত হইবার আশা আছে, ঠিক সেই সময় এই প্রকারের একটি আইন পাস করিতে তাঁহারা ইচ্ছুক হইয়াছেন দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইয়াছি। আমি এই আইন ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিনা। আমার প্রধান আপত্তি এই যে আইন সময়োপযোগী নহে। এখন দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে, কিন্তু এই আইন পাশ হইলে এমনি তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইবে যে তাহার পরিণাম ভাবিতে আমি ভীত হইতেছি।"

যাহা হউক ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে আইনটি পরিশোধনার্থ সিলেক্ট কমিটির হস্তে অর্পিত হইল। উক্ত কমিটিতে বাদানুবাদের ফলে আইনটি

কতক বিষয়ে পরিবর্ত্তিত হইল। আইন মোটে তিন বৎসর মাত্র বাহাল থাকিবে এরূপ ব্যবস্থা করা হইল। যখন বিবেচনা করা যায়, যে এই আইনের দ্বারা গবর্ণমেণ্টকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহাপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতা ভারতরক্ষা আইন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যখন বিবেচনা করা যায় যে এই আইনের প্রয়োগ করিতে হইলে গবর্ণরজেনেরালের সম্মতি দরকার এবং অন্য অনেক বিষয়ে ও আইন পরিশোধিত হইয়াছিল, তখন যে উক্ত আইনের দোষ অনেকটা বর্জ্জিত হইয়াছে ও উহাতে আর কাহারও আপত্তি থাকা উচিত নহে, এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কেহ কেহ এই মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সৎসাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ দেশীয় রাজনৈতিকগণের মত অন্যরূপ ছিল। আইন প্রথমে প্রস্তাবিত হইবার ও সিলেক্ট কমিটিতে অর্পিত হইবার ও পাস হইবার মধ্যে উহার আন্দোলন আরম্ভ হয়। এরূপ তুমুল আন্দোলন এদেশে ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এপর্য্যন্ত এই আইন কাহারও বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় নাই। সুতরাং সাধারণে যে আশঙ্কা করিয়াছিল তাহা নিতান্ত অমূলক। দ্বিতীয় আইনটি পরিত্যাগ করিতে গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার সম্মত হইয়াছিলেন। মার্চ্চ মাসের আরম্ভে কিন্তু আন্দোলনকারিগণ প্রকাশ করিলেন যে যদি আইন পরিত্যাগ না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আর গবর্ণমেণ্টের কোন আইন বা আদেশ মান্য করিবেন না। আইন পাশ হইলে পর শ্রীযুক্ত গান্ধি এই আন্দোলনের নায়ক হইলেন।

গান্ধি একজন ঋষিকল্প হিন্দু। তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা, তাঁহার নিঃস্বার্থ দেশ হিতৈষিতা ও তাঁহার সাধুউদ্দেশ্যের জন্য ভারতবাসিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসিদিগের জন্য তিনি যে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ।

তিনি যখন হইতে আহমেদাবাদ নগরে বাস করিতে থাকেন, তখন হইতেই সমাজের মঙ্গলকারী নানাবিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া আছেন। তাঁহাকে যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, তাহারা কেবল হিন্দু নহে, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ ও তাঁহার ভক্ত। বিশেষতঃ যখনই কোন ব্যক্তি বা জাতি অত্যাচারিত হয়, তখনই তিনি তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন ও তজ্জন্য জন সাধারণে তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। তাঁহার বিশ্বাস যে আত্মার বলের নিকট বাহুবলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাখণ্ডে তিনি যে উপায়ে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, রৌলাট আইনের বিরুদ্ধে ও সেই অস্ত্র প্রয়োগ করা তাঁহার কর্ত্তব্য এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। সে অস্ত্রটি, গবর্ণমেণ্টের

আইন অমান্য করা ও তজ্জন্য ইচ্ছা করিয়া রাজদণ্ড ভোগ করা। ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি প্রচার করিলেন যে যদি উক্ত আইন পাশ হয়, তাহা হইলে এখানেও তিনি উক্ত উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। এ সংবাদে কি গবর্ণমেণ্ট কি দেশের জনসাধারণ উভয়ই কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় কোন কোন মধ্যমপন্থী সদস্য আশঙ্কা করিলেন যে ইহার পরিণাম বড়ই ভয়ানক হইবে। বিবিবেশান্ত ভারতবর্ষীয়গণের মতিগতি বেশ বুঝিতে পারেন। তিনি গান্ধী মহোদয়কে বলিলেন যে আপনি যে পথে চলিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, সে পথ অবলম্বন করিলে বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, কারণ উহা দ্বারা সাধারণের মনে বিদ্বেষবহ্নির উদ্রেক হইবে ও তখন তাহাদিগকে শান্ত করা ও অত্যাচারকরণ হইতে নিবৃত্ত করা মানুষের সাধ্যাতীত হইয়া উঠিবে। কিন্তু গান্ধি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে কোন দোষ ছিল না, যদিও উহা কার্য্যে পরিণত হইলে ভীষণ গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং যতক্ষণ উহা কার্য্যে পরিণত হইয়া বিষময় ফল প্রসব না করে, ততদিন গান্ধির বিপক্ষে কিছু করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব ছিল না। গান্ধি স্বয়ং তাঁহার মতাবলম্বীগণকে কোনরূপ অত্যাচার যাহাতে না হয়, তজ্জন্য বারম্বার সতর্ক করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে যদি তাঁহার মতাবলম্বীগণ কেবল আইন লঙ্ঘন করিয়াই ক্ষান্ত হয় ও কোনরূপ উপদ্রব না করে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া রৌলাট আইন পাশের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হইবে। মার্চ মাসের প্রথম তারিখে তিনি এক প্রতিজ্ঞা পত্র প্রকাশ করিলেন। ইহার মর্ম্ম এই—"যেহেতু দুইটি নূতন প্রস্তাবিত আইন, যাহা রৌলাট আইন নামে বিখ্যাত, ন্যায়বিরুদ্ধ ও উহারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিতেছে, আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ঐ আইনদ্বয় যদি পাশ হয় ও যতদিন বাহাল থাকিবে, ততদিন আমরা গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি আইন মান্য করিব না, কিন্তু কোনরূপ অত্যাচারও করিব না।" অতঃপর উত্তর ভারতে স্থানে স্থানে এই মত প্রচারার্থ কমিটি নিযুক্ত হইল। জন সাধারণ, কিরূপে এই প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত, তদ্বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে ও অত্যাচারাদি হইতে বিরত হয়, ইহাই কমিটিগুলির উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশ হওয়াতে ও রৌলাট আইনের বিপক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারি দেশীয় সভ্যগণ যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে দেশব্যাপী এমনি এক ভয়ানক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যে সেরূপ আন্দোলন কখন দেখা যায় নাই। ইতিপূর্ব্বেই দেশে তখন অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার উপর গান্ধির এই প্রতিজ্ঞাপত্র প্রকাশে, ভীষণ অমঙ্গলের সূত্রপাত হইল। কি শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়,

কি মুসলমান সম্প্রদায় সকলেই রৌলাট আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। শীঘ্রই এই আইনদ্বয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানারূপ মিথ্যা কথা প্রচার হইতে লাগিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত করিলেন, যে এদেশে যে উদার রাজনীতি অবলম্বনের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবে না, এখানে যে প্রজাপীড়ণ চলিবে, এই দুই আইনেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। দেশের দরিদ্রগণ, যাহারা খাদ্য বস্ত্রাদির দুর্ম্মূল্যতানিবন্ধন কষ্টভোগ করিতেছিল, ভাবিল যে তাহাদিগের দুরবস্থার জন্য রৌলাট আইন সম্পূর্ণ দায়ী। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মন্ত্রের চোটে দর কমান যে অসম্ভব, ইহা তাহারা ধারণা করিতে পারিল না। রৌলাট আইন সম্বন্ধে নানারূপ মিথ্যাকথার প্রচার হইতে লাগিল, যথা এই আইন পাশ হইলে যে যাহা রোজগার করে, তাহার অর্দ্ধভাগ গবর্ণমেণ্ট কররূপে আদায় করিবেন, শ্রাদ্ধ বিবাহাদি উপলক্ষে বিস্তর টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে, এইবার পুলিশের অত্যাচারের আর সীমা থাকিবে না, পুলিস যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে ও তাহার কোন প্রতীকার করা সম্ভব হইবে না। যদি কোন গ্রামে তিনজনমাত্র লোক একত্রে সমবেত হইয়া কোন বিষয়ের চর্চ্চা করে তাহা হইলে পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে। জমিদারগণকে বুঝিতে হইবে যে তাহাদিগের জমিদারিতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি ও গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই তাহা বিনামূল্যে গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ নানাবিধ মিথ্যা কথা প্রচারিত হইতে লাগিল ও সেই সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণের বিদ্বেষ ও বর্দ্ধিত হইল। যদি দেশে অন্নবস্ত্রের কষ্ট না থাকিত, তাহা হইলে হয়ত এই সব মিথ্যা কথা প্রচারে বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আইনে এমন কিছু ছিল না যাহার জন্য সাধারণের এত অসন্তুষ্ট হইবার কথা। কিন্তু আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছাড়িয়া দিয়া একটা অপ্রকৃত স্বকপোল কল্পিত উদ্দেশ্য উহাতে আরোপিত হওয়াতেই লোকে ভীত হইয়া আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান হইল। মিথ্যা কথার সহিত সংগ্রাম চলে না। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অশান্তি হইতে দেশকে রক্ষা করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া পড়িল। প্রকৃত আইন্ কি তাহা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ইহা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতে লাগিলেন। প্রকাশ্য দরবারেও আইনের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা ও আইন দ্বয়ের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা আপত্তির যোগ্য ইহা বুঝাইবার অনেক প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। কিছুতেই লোকের ভ্রান্ত সংস্কার দূর হইল না।

আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, গন্ধীর নেতৃত্বে ইহা ভীষণ আকার ধারণ করিল। দেশের সর্ব্বত্র সভা করিয়া আইনের প্রতিবাদ

চলিতে লাগিল, ও সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এরূপ "ভয়ানক" আইন যাহাতে এক মিনিটও বাহাল না থাকে তজ্জন্য দেশীয় সংবাদপত্রে তীব্র মন্তব্য বাহির হইতে লাগিল। বোম্বাই প্রদেশে ও উত্তর ভারতবর্ষে অগ্নিময়ী বক্তৃতা দ্বারা সাধারণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। অনেক সদ্বিবেচক ব্যক্তি এই আন্দোলনে বিষময় ফল প্রসব করিতে পারে এই আশঙ্কায় গন্ধিকে বলিলেন যে ব্যাপার বড়ই গুরুতর দাঁড়াইতেছে ও তিনি যেন স্মরণ রাখেন যে দেশের আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহার ন্যায় সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী নহে। বঙ্গদেশে ইতিপূর্ব্বে এই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। সুতরাং ইহা হইতে ভবিষ্যতে কি ফল ফলিতে পারে তাহা বাঙ্গালিগণ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া এই আন্দোলনে যোগ দিতে অসম্মত হইল। বাঙ্গালাদেশে মধ্যমপন্থীদল প্রবল ছিলেন। তাঁহারা আইনের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু যেটুকু সঙ্গত তাহা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। তবে চরমপন্থীগণ গান্ধি প্রবর্ত্তিত সত্যগ্রহ অবলম্বন করিয়া যাহাতে তাহার প্রচার হয় তজ্জন্য বন্দবস্ত করিতে লাগিলেন। এই আন্দোলনের যে এত তেজ ও বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার কারণ এই চরমপন্থীদলের পোষকতা। তাহাদিগের চেষ্টাও উদ্যমের ফলে ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাহাদিগের বিপক্ষে কোন কথা বলিতে হইলে অসাধারণ সাহসের প্রয়োজন হইত। যাহা হউক এই আন্দোলনের ফলে নানাস্থানে উত্তেজিত জনবৃন্দের সহিত শান্তিরক্ষাকারি পুলিসের বিবাদ ঘটিতে লাগিল। এই বিবাদ হর্ত্তাল অর্থাৎ কাজকর্ম্ম দোকানপাঠ বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতে উৎপত্তি হইল। ভারতবর্ষে যখন সাধারণের উত্তেজনা বশতঃ শান্তিভঙ্গের উপক্রম হয়, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ এই যে দোকানিগণ লুটের ভয়ে দোকান বন্ধ করে। এই প্রাচীন ব্যবস্থানুসারে গন্ধি আদেশ দিলেন যে অমুক অমুক দিনে দোকানপাঠ বন্ধ করা হউক ও তদ্দ্বারা সাধারণের মত গবর্ণমেণ্টকে জানান হউক। পুলিসের সহিত প্রথম সংঘর্ষ দিল্লীনগরে ৩০ এ মার্চ্চ তারিখে ঘটে। ঐ দিনে সত্যগ্রহীগণ তথায় দোকান পাঠ সব বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করে ও দোকানীদিগকে আন্দোলনকারিগণ দোকান বন্ধ করিবার প্রস্তাব করে। কাজকর্ম্ম সব এক প্রকার বন্ধ থাকাতে পথের স্থানে স্থানে অনেক লোক জমা হয়। ছুটির দিনে সর্ব্বত্রই এই রূপ হইয়া থাকে। দুই ব্যক্তি ষ্টেসনস্থ একজন খাবার ওয়ালাকে খাবার বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে দেখিয়া পুলিশ উক্ত দুইব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। অমনি অনেকলোক সমাগত হইয়া পুলিসের হস্ত হইতে উক্ত দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিল। তাহাদের বলাধিক্য বশতঃ তাহারা অনায়াসেই সেই দুই ব্যক্তিকে পুলিসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ

হইল। তখন সমবেত জনবৃন্দ ক্রোধে ও উত্তেজনায় একপ্রকার উন্মাদ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা অনবরত লোষ্ট্র নিক্ষেপ করাতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ শান্তিরক্ষার্থ সৈন্য আনয়ন করিলেন। অবশেষে সৈন্যগণ আদিষ্ট হইয়া গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করিলে ভিড়ের মধ্যে পাঁচ জন লোক মারা পড়ে ও বিশ পঁচিশ জন আঘাৎ প্রাপ্ত হয়।

দিল্লীর এই কাণ্ড লইয়া আন্দোলনের বেগ ও খাতা আরও বাড়িয়া উঠে। দিল্লীতে যে পাঁচ জন প্রাণ হারাইয়াছিল তাহারা যেন দেবতার মত কার্য্য করিয়া গিয়াছে, সাধারণে এই কথা বলাবলি করিতে লাগিল। অতঃপর আন্দোলনকারিগণ বিজ্ঞাপন দিলেন যে ৬ই এপ্রিল তারিখে আর একটি হর্ত্তাল হইবে। ঠিক এই সময় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এমন সদ্ভাব স্থাপিত হইল, যে সে রকমটি পূর্ব্বে কখন দেখা যায় নাই। চরম পন্থীগণ বহুদিন হইতে এই সদ্ভাব স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে ছিলেন। যাঁহাদিগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই জানেন যে যদিও শিক্ষিত ও রাজনীতি-চর্চ্চাকারি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা সম্ভব কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সাধারণ জনবৃন্দের মধ্যে উহা সংস্থাপন করার পথে যথেষ্ট প্রতিবন্ধক আছে। কিন্তু এই সময় অশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানগণও তাহাদের পরস্পরের প্রতি পুরাতন বিদ্বেষ বিস্মৃত হইল। দিল্লীনগরে পুলিসের সহিত দাঙ্গায় হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই আহত হইয়াছিল। ৬ই এপ্রিল তারিখে যে হর্ত্তাল হয় তাহাতে দেখাগেল যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে, যে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। হিন্দুগণ মুসলমানদিগের হস্ত হইতে জল গ্রহণ করিয়া পান করিতে লাগিল ও মুসলমান গণও হিন্দুর হস্ত হইতে জল গ্রহণ করিল। দলে দলে অসংখ্য জনবৃন্দ পথ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ও তাহাদিগের নিশান দেখিয়া প্রতীতি হইল যে বাস্তবিকই এখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে ও অন্ততঃ রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহারা উভয়েই এক হইয়া গিয়াছে। কোন বিখ্যাত মুসলমান মসজিদে, উপাসনা ও বক্তৃতার জন্য একজন হিন্দু নিমন্ত্রিত হইয়া ধর্ম্মযাজকের আসন অধিকার করিল। দেশে দেশে নগরে নগরে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিপ্লবকারি বক্তৃতার স্রোত প্রবাহিত হইল। কতকগুলি আন্দোলনকারি গর্ব্ব করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে তাহারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে, যদিও কেহ তাহাদিগের প্রাণ নাশ করিতে ইচ্ছুক বা প্রয়াসী ছিলনা। যাহারা দোকান পাট বন্ধ করিতে অসম্মত ছিল তাহাদিগের উপর আন্দোলনকারিগণ ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিল। ট্রাম গাড়ীর পথের উপর বড় বড় কাষ্ঠ রাখিয়া গাড়ীচলা বন্ধ করিল। গাড়ী হইতে আরোহিগণকে বল পূর্ব্বক নামাইয়া হাঁটিয়া পথ চলিতে বাধ্য করা হইল। উত্তর

ভারতে যে ভাবে আন্দোলন চলিতেছিল, তাহার পরিণাম ভাবিয়া গান্ধি কিছু ভীত হইয়া, বোম্বাই হইতে পঞ্জাব প্রদেশ যাত্রা করিলেন। রাজপুরুষগণ ভাবিলেন যে একেইত পঞ্জাবে শান্তিরক্ষা করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর যদি আন্দোলনের নেতা গান্ধি তথায় উপস্থিত হন, তাহা হইলে শান্তিরক্ষা আরও গুরুতর ব্যাপার-- এমন কি এক প্রকার অসাধ্য হইবে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা গান্ধিকে পথ মধ্যে ধৃত করিয়া তাঁহার পঞ্জাবে আগমন বন্ধ করিলেন ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বোম্বাই এ ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। গান্ধির গ্রেপ্তারের কথা শীঘ্রই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল ও তাহাহইতে ভীষণ আগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

পঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশে যে সমস্ত লোমহর্ষণ কাণ্ড হইয়াছিল, তাহার তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটির মন্তব্য এখনও প্রকাশিত না হওয়ায় এই গোলযোগের সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া কিম্বা গবর্ণমেণ্ট এই গোলযোগ দমন করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়া ছিলেন তাহা প্রকাশকরা এখন অসম্ভব ও আশাকরা সঙ্গত নহে। তবে ঘটনাবলীর একটি তালিকা এখানে দেওয়াগেল। প্রথম হর্ত্তাল অপেক্ষা দ্বিতীয় হর্ত্তাল অধিকতর স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে কোন গুরুতর ঘটনা ঘটে নাই বটে, কিন্তু কলিকাতা ও বোম্বাইএ ছোট খাট হাঙ্গামা হইয়াছিল। কলিকাতায় ও বঙ্গদেশের অনেক জেলাতেই হর্ত্তাল হইয়াছিল, কিন্তু যুক্ত প্রদেশের বড় বড় সহরে ও পঞ্জাবে প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা হইয়াছিল। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে কেবল পাটনা ও গুটিকতক সহরে হইয়াছিল, কিন্তু ব্রহ্মদেশে, মধ্য প্রদেশে কুর্গে ও উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে ইহা অনুষ্ঠিত হয় নাই। মাক্সাজ প্রদেশে, নিজ মাক্সাজ ও অন্যান্য দুই একটি সহরে দোকান পাঠ বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু জনসাধারণে এই ব্যাপার লইয়া বিশেষ উত্তেজিত হয় নাই। যদিও ৬ই এপ্রিল তারিখের হর্ত্তালের উপলক্ষে কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটে নাই, কিন্তু দেশময় অসন্তোষের বিস্তার হইয়াছিল। পঞ্জাবের অধিবাসিগণের দ্বারা গান্ধির আইন অমান্য করিবার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়। রৌলাটকমিটি পঞ্জাবের শিখজাতির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ইহারা একবার উত্তেজিত হইলে শীঘ্রই কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া একটা কিছু করিয়া বসে। পঞ্জাববাসি অন্যান্য জাতিদের সম্বন্ধেও এই কথা বিলক্ষণ খাটে।

অমৃতসর সহরে প্রথমে হাঙ্গামা বাধে। তথায় গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার কিচলু ও সত্যপাল নামক দুইজন আন্দোলনকারিগণের নেতাকে স্থানান্তরিত করাতে, অধিবাসিগণ একত্র হইয়া প্রথমে ইংরাজগণ যেখানে বাস করেন, সেইস্থান আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিয়া টেলিগ্রাফ আপিস ও

রেলওয়ের মালগুদাম ভাঙ্গিয়া ফেলে, একটি ব্যাঙ্ক অগ্নিযোগে ভস্মে পরিণত করে, কতকগুলি সরকারি আফিসগৃহ দগ্ধ করে ও আমেদাবাদে পাঁচজন ইংরাজকে হত্যা করে। মিস্ শেরউড্ নামক একজন মিশনারি স্ত্রীলোককে সাংঘাতিক প্রহার করে ও অন্যান্য অনেক অত্যাচার করে। এই উত্তেজনার বাতাস লাগিয়া লাহোর নগরের অধিবাসি-গণকে ও উত্তেজিত করে। সেখানে সহরের বাহিরে অনেক লোক একত্রিত হইয়া সহরের যে অংশে ইংরাজগণ বাস করেন তদভিমুখে ধাবিত হয়। অগত্যা পুলিস বাধ্য হইয়া গুলি করিতে থাকে ও কতকগুলি লোক আহত হয়। তাহার পর পঞ্জাব প্রদেশে অনেক টেলিগ্রাফ আফিস ও রেলওয়ে ষ্টেসন ভাঙ্গিতে থাকে বা পোড়াইয়া দেয়। বোম্বাই প্রদেশ হইতেও এইরূপ সংবাদ আসে। তথায় গান্ধি গ্রেপ্তার হইয়াছেন শুনিয়া লোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া টেলিগ্রাফ আফিস ও অন্যান্য সরকারি বাড়ী আক্রমণ করে ও কয়েকজন ইউরোপীয় ও দেশীয় রাজকর্ম্মচারিকে হত্যা করে। এখানে ও রেলওয়ে ষ্টেসন ভঙ্গ করিয়া ফেলে ও টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া-দেয়। ১২ই এপ্রেল তারিখে বীরাঙ্গম ও নাদিয়াদ নগরে হাঙ্গামা হয়, ও বোম্বাই সহরেও গোলযোগের উৎপত্তি হয়। যে সৈন্যগণ ও পুলিস তথায় পাহারা দিতে ছিল, তাহাদিগের উপর লোষ্ট্রবৃষ্টি হইতে থাকে। পঞ্জাব প্রদেশে উত্তেজনার স্রোত ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। লাহোর নগরের রাজপথে অধিবাসিগণকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার অনুরোধ করিয়া ইস্তাহার মারা হইল। সেখানেও পুলিসের সহিত জনসঙ্ঘের আবার একটি বিবাদ হয় কিন্তু সুখের বিষয় বেশীলোক আহত হয় নাই। সেইদিনেই অর্থাৎ ১২ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতা হইতে খবর আসে যে তথায় পথে শান্তিরক্ষাকারি সৈন্যগণের সহিত অধিবাসিগণের দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এখানেও সৈন্যগণকে গুলি করিতে হইয়াছিল ও তাহার ফলে পাঁচ ছয় জন মৃত ও দ্বাদশজন লোক আহত হয়। পরদিবস হাঙ্গামাকারিগণ টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়াতে, পঞ্জাব হইতে অন্যস্থানে খবর পাঠান অসম্ভব হইয়া পড়িল, কিন্তু সিমলায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তারহীন টেলিগ্রাফযোগে সংবাদ পাইলেন যে কাসুর ও অমৃতসহরের মধ্যে রেলওয়ে ষ্টেসনগুলি হাঙ্গামাকারিগণ লুট করিয়াছে, কাসুরে একজন ইংরাজ সৈনিককে হত্যা করিয়াছে ও দুইজন ইংরাজ সেনাধ্যক্ষকে আহত করিয়াছে ও স্থানে স্থানে গিয়া নানারূপ অত্যাচার করিতেছে এবং লাহোর ও অমৃতসহরের মধ্যে প্রকাশ্য বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্থানীয় সেনাপতি ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া প্রস্তাব করেন যে তথায় সামরিক আইন প্রচলন করা

নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কেননা তাহা না করিলে বিদ্রোহদমন করা অসাধ্য। ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তখন বিশেষ বিবেচনা করিয়া প্রথমে অমৃতসর ও লাহোর জেলায় ও পরে গুজরানওয়ালা গুজরাট ও লায়ালপুর জেলায় ঘোষণা করিয়া সামরিক আইন প্রচলিত করিলেন। অমৃতসরে ইহার পূর্ব্বেই সামরিক আইন প্রচলিত হইয়া ছিল, কারণ ১০ই এপ্রেলের হাঙ্গামার পর স্থানীয় রাজপুরুষগণ হাঙ্গামাকারিগণকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়া সেনাবিভাগের হস্তে শান্তি রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া ছিলেন। এই সহরেই হত্যাকাণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া ছিল। ১৩ই এপ্রিল তারিখে সেনাধ্যক্ষ ঢেঁড়া পিঠিয়া জানাইলেন যে কেহ কোন সভা করিতে পারিবেন না। এই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া হাঙ্গামা কারিগণ জালিয়ান ওয়ালা উদ্যানে অপরাহ্নে এক সভা করিল।

অমৃতসরের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনেরাল্ ডায়ার তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণকে—যাহাদিগের সংখ্যা একশতের ও অল্প ছিল—একত্র সমবেত করিয়া সভাস্থানে গমন করিলেন ও যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল তাহাদিগের উপর গুলি করিতে আদেশ দিলেন। তাহাদিগের সংখ্যা অনেক সহস্র ছিল ও সুতরাং অনেকেই আহত হইল ও যতদূর জানা গিয়াছে ৩৭৯ জন প্রাণত্যাগ করিল। এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার এবং যে কারণে গুলি করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এই দুইটী বিষয় হাণ্টার প্রমুখ কমিটী কর্ত্তৃক বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়াছিল। সামরিক আইন প্রচলনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে যে সব জেলায় হাঙ্গামা হইতেছিল, তথায় যাহা যাহা করিতে হইয়াছিল তাহার ফলে সমগ্র পঞ্চনদে শীঘ্রই শান্তি পুনস্থাপিত হইল। বোম্বাই প্রদেশে হাঙ্গামা আরও শীঘ্র থামিয়া গেল। গান্ধি সাহেব হাঙ্গামাকারিগণের কৃত অত্যাচারের কথা ভাবিয়া একান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন ও শান্তি পুনঃস্থাপোনোদ্দেশ্যে রাজ কর্ম্মচারিগণকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি স্বীকার করিলেন যে রাজকীয় আইন অমান্য করিবার প্রস্তাব করিয়া তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া ছিলেন। দুষ্ট লোকে এই সুযোগে নানারূপ অত্যাচার করিয়াছে। অগত্যা তিনি উক্ত প্রস্তাব প্রকাশ্য ভাবে প্রতিহার করিলেন। অমৃতসরের হত্যাকাণ্ডের পরও পঞ্জাব প্রদেশে কিছুদিন হাঙ্গামা চলিয়াছিল। রেলওয়ে লাইন ভঙ্গ করাই এখন দুর্ব্বৃত্ত গণের প্রধান কার্য্য হইয়া পড়িল। ১৪ই তারিখে তাহারা গুজরান ওয়ালা ষ্টেসন আক্রমন করিল ও টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিল। খৃষ্টান দিগের গির্জা, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারি ও অন্যান্য সরকারি গৃহ ভঙ্গ বা অগ্নি সংযোগে ভস্মে পরিণত করিল। বিদ্রোহিগণ রেল পথ নষ্ট করিয়া দেওয়াতে কেবল মাত্র এয়ারোপ্লেন দ্বারাই গুজরান ওয়ালা নগরে পৌঁছিবার উপায় ছিল। সুতরাং এখানে এয়ারোপ্লেন প্রেরণ ভিন্ন অন্য উপায় না

থাকাতে অগত্যা এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, ও ইহা দ্বারা বিদ্রোহ ও দমিত হইয়া ছিল। তাহার পর ইংরাজসৈন্যদল এক জেলা হইতে অন্য জেলায় পদব্রজে যাত্রা করিতে লাগিল। কিন্তু ২১শে এপ্রিলের পুর্ব্বে রেলপথ নষ্ট করা ও টেলিগ্রাফের তার কাটা বন্ধ হয় নাই। তাহার পর ও দুই এক স্থানে এই অত্যাচারের চেষ্টা হইয়া ছিল।

এদেশে এইরূপ হাঙ্গামা খুব শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, আর পুর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে সাধারণের মধ্যে অসন্তোষের কারণ ও বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এই বিদ্রোহ বহ্নি বিস্তৃত হইতে বিলম্ব হয় নাই। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে দৃষ্ট হইয়াছে, যে এইরূপ বিদ্রোহ ঘটিলে খুব শীঘ্র দমন করা উচিত নতুবা ভয়ানক কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ব্যাপারটি যেরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। ১৪ই এপ্রিল তারিখে তাঁহারা এক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে শান্তি রক্ষার্থ যত বল প্রয়োগ করা আবশ্যক তাহা করিতে তাঁহারা কৃত সংকল্প হইয়াছেন। উক্ত মন্তব্যে গভর্ণমেণ্ট বলিলেনঃ—"রৌলাট আইনের বিপক্ষে আন্দোলনের যে শোচনীয় ফল ফলিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই ও লাহোর নগরে যে সব হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহাদিগের সকলেরই মধ্যে একটি বিষয় সাধারণ দেখা যায়। সেটি এই যে, যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ শান্তি রক্ষাকরণে নিযুক্ত তাঁহাদিগকে অন্যায় রূপে ও বিনা কারণে কর্ত্তব্য পালনে বাধা দেওয়া। কিন্তু অমৃতসরে ও আমেদাবাদে ব্যাপার আরও গুরুতর হইয়াছিল। সেখানে বিনা কারণে নির্দ্দোষী ও নিরস্ত্র লোক হত্যা ও সরকারি ও বেসরকারি অট্টালিকা ভঙ্গ করা হইয়াছিল। গভর্ণরজেনেরাল বাহাদুর বিবেচনা করেন যে এখানে উল্লেখ করা উচিত যে হাঙ্গামাকারিগণ যাহাদিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যদি তাহাদিগকে রাজভক্ত বেসরকারি দেশীয়গণ আশ্রয় দান করিয়া রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে অমৃতসরে মৃত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা আরও অধিক হইত। গভর্ণর জেনেরাল বাহাদুর সেই ব্যক্তিগণকে তাঁহাদিগের রাজভক্তি ও দয়াশীলতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছেন। উপসংহারে বক্তব্য যে ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ লোকহত্যা ব্যাপার না ঘটে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন ও প্রয়োজন হইলে কঠোরতম ব্যবস্থা করিবেন ইহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা যাইতেছে।"

পাঞ্জাবে ও বোম্বাই প্রদেশে হাঙ্গামার প্রকৃত কথা প্রকাশ হইলে, দেশের লোকদিগের মধ্যে যাঁহাদের কিছু দায়িত্ব বোধ আছে, তাঁহারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বিশ্বাস জন্মিল যে রৌলাট আইনের ন্যায় আপত্তিকর আইনের বিরুদ্ধে ও এত বাড়াবাড়ি আন্দোলন

করা বড় ভাল হয় নাই! শিক্ষিত ও ধনশালী ব্যক্তিগণ আশঙ্কা করিলেন যে হয় ত হাঙ্গামাকারিগণের স্পর্দ্ধা এত বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে যে তাহাদিগকে দমন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। যাহা হউক হাঙ্গামা ক্রমে ক্রমে চুকিয়া যাইলে সকলে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু যে উপায়ে অশান্তি তিরোহিত হইয়া শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইল, কিছুদিন পরে তাহার বৈধতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন বলিয়া উঠিলেন যে যেহেতু অমৃতসরে কিরূপে রাজ কর্ম্মচারিগণের সহিত হাঙ্গামাকারিগণের বিবাদের সূত্রপাত হইয়া ছিল সেবিষয়ে মত ভেদ হইতেছে, উহা তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করা হউক। যাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে নিশ্চেষ্ট প্রতিরোধ পন্থা অবলম্বন করিলে পরিণামে হাঙ্গামা ঘটিবার সম্ভাবনা, তাঁহাদিগের আশঙ্কা অমূলক হইল না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ ধারণা জন্মিল যে যদিও হাঙ্গামাকারিগণ বড় বাড়াবাড়ী করিয়াছিল, তথাপি তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা প্রয়োজনাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। চরমপন্থীদলের কতকগুলি সংবাদপত্র এই কঠোর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল, যে তাহাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইন তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় কতকগুলি নির্ভীক ও স্পষ্ট বক্তা ব্যক্তি সৎসাহসের পরিচয় দিয়া তাঁহাদিগের মনোগতভাব প্রকাশ করিলেন। ১৮ই এপ্রিল তারিখে কুমারি বেসান্ত এইরূপ লিখিলেন—"পঞ্জাবে মৃত ও আহত ব্যক্তিগণের সংখ্যা বহুশত হইয়াছে। বোধ হয় এমন কথা কেহই বলিবেন না যে যখন হাঙ্গামাকারিগণ ইংরাজ হত্যা করিতে লাগিল, ব্যাঙ্ক গৃহ ভগ্ন করিয়া দিল, রেলওয়ে ষ্টেশন অগ্নি যোগে দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন গবর্ণমেণ্ট ইহা দেখিয়া চুপ করিয়া ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন। কেহ কি মনে করেন যে হাঙ্গামার সূত্রপাত হইলেই দুর্ব্বৃত্তগণকে দমন করা অপেক্ষা তাহাদিগকে প্রথমে প্রশ্রয় দিয়া, পরে যখন অত্যাচার ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন দমনের চেষ্টা অধিক দয়ালুতার কার্য্য? প্রথমে দমন করিলে হয়ত দশ বিশটি লোক হত্যা হইত। প্রথমে প্রশ্রয়ের ফলে মৃত ও আহতের সংখ্যা বহুশত হইল। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের দমন ব্যবস্থার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা কি আমাকে বলিয়া দিবেন যে কোন সময়ে গবর্ণমেণ্টের দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা উচিত? আমি বলি যে যখন মুষ্টিমেয় সৈন্য ও পুলিসের বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইল ও ইট ছুড়িতে লাগিল, তখনই তাহাদিগকে গুলি করাই দয়ালুতার কার্য্য। কারণ তাহা না করিলে হাঙ্গামাকারিগণের ক্রমে সাহস ও অত্যাচার বৃদ্ধি হইত, ও তখন হয় তাহাদিগের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া

তাহাদিগের হস্তে সহরটি ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িতে হইত, না হয় গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে অনেককেই সংহার করিতে হইত। শেষোক্ত পন্থা কঠোরতার পরাকাষ্ঠা, কিন্তু আবশ্যক হইলে, সকল গবর্ণমেণ্টকেই ইহা অবলম্বন করিতে হয়।” কুমারি বেসান্ত আরও লিখিলেন—“আমরা সকলেই ভারতে স্বায়ত্ব শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী। শান্তি রক্ষার্থ সাহায্য করা আমাদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য। এই দারুণ বিপদের দুর্দ্দিনে আমাদিগের উচিত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের বিপক্ষে আলোচনা সমালোচনা হইতে ক্ষান্ত হওয়া, ও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বিদ্রোহ দমনে প্রাণপণে সাহায্য করা। কারণ বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিলে দেশে ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইবে ও বিদেশ হইতে শত্রু আসিয়া দেশ আক্রমণ করিবে।” অতি অল্প দিনের মধ্যেই কুমারি বেসান্তের দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গেল। আফগানিস্থানের আমীর ভারত আক্রমণ করিলেন—ভারতে হাঙ্গামার কথা অতিরঞ্জিত হইয়া আফগানিস্থানে প্রচারিত হওয়াতেই আমীর এদেশ আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। তবে এই আক্রমণের জন্য একটি সুফল ফলিয়াছিল। যে সব শিক্ষিত ভারতীয়গণের দায়িত্ব বোধ ছিল, তাঁহারা সকলেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তবে ইহা একটি কুফল ও প্রসব করিয়াছিল। আফগান কর্ত্তৃক আক্রমণের হেতু পঞ্জাবে সামরিক আইন তুলিয়া দিতে কিছু বিলম্ব হইল। এই বিলম্বে চরমপন্থীদল গবর্ণমেণ্টের উপর চটিয়া উঠিলেন ও বলিতে লাগিলেন যে পঞ্জাবে গোলযোগের ছুতা করিয়া গবর্ণমেণ্ট সমগ্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অবশ্য একথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অমূলক।

দুর্ভাগ্যের বিষয় পঞ্জাবে হাঙ্গামা ও উহা দমনের প্রকৃত বিবরণ দেশের অনেক লোকেরই অজ্ঞাত ছিল। সামরিক আইন কিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সত্য সংবাদ না জানা থাকাতে অনেক আজগুবি গুজবের রটনা হইতে লাগিল। রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণ পঞ্জাবী হাঙ্গামা তদন্তের জন্য কমিশন নিয়োগের প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ উত্থাপিত করিতে লাগিল। সামরিক আইনের বলে তথায় যে বিচারালয় গুলি গঠিত হইয়াছিল, তাহারা অপরাধিগণকে অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করাতে এই প্রার্থনা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হইল না। চরমপন্থীগণ এখন সাব্যস্ত করিলেন যে কেবল উক্ত হাঙ্গামা তদন্তের জন্য নহে, ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী তদন্তের জন্য ও কমিশন নিযুক্ত হওয়া উচিত। মধ্যমপন্থীগণ যদিও অতদূর যাইলেন না, কিন্তু তাঁহারা ও পঞ্জাবী হাঙ্গামা তদন্তের জন্য কমিশন নিয়োগের প্রার্থনায় যোগদান করিলেন। এই সময় ভারতবর্ষ হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছিলেন

বা তথায় গমনার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। হাউস অফ লর্ডস ও হাউস অফ কমন্স নামক দুই সভার সভ্যগণের মধ্যে কয়েক জনকে লইয়া একটি কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, উহার উদ্দেশ্য ভারত শাসন সংস্কার বিষয়ক নূতন আইন সম্বন্ধে বিবেচনা ও আলোচনা করা। পূর্ব্বোক্ত ভারতীয় প্রতিনিধিগণ এই কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্য তখন ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তখন মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী উভয় দলেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে হয়ত পঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশে হাঙ্গামার উপলক্ষ করিয়া গবর্ণমেণ্ট উক্ত আইনের প্রবর্ত্তনা কিছুদিনের জন্য স্থগিত করিবেন। সৌভাগ্যবশতঃ তখন ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র সমূহের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে এই সব হাঙ্গামা হইতে কেবল ইহা প্রমাণ হয় যে উক্ত আইন যতশীঘ্র সম্ভব প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। কিন্তু যদিও উক্ত আইন ভারতবর্ষীয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে পঞ্জাবী হাঙ্গামা লইয়াই দেশে অধিক আন্দোলন হইতে থাকে। ২০এ মে তারিখে পঞ্জাবের কতক অংশ হইতে সামরিক আইন উঠিয়া গেল। ১১ই জুন তারিখে, রেলওয়ের জমী ভিন্ন অপর সর্ব্বত্র উক্ত আইন উঠিয়া গেল। যখন উক্ত আইন বহাল ছিল তখন যেন পঞ্জাব প্রদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ হইতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে যেন পুনরায় সংযুক্ত হইল। মধ্যে পঞ্জাব রেলপথে গমনাগমন কতকটা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত নিষেধ তিরোহিত হওয়ায় সামরিক আইনের বলে পঞ্জাব কি প্রকারে শাসিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে নানাবিধ জনরবের প্রচার হইতে লাগিল। জালিয়ানবাগের হত্যাকাণ্ড লইয়া তুমূল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে শুদ্ধ দেশীয়গণকে অবমান করা ও তাহাদিগকে মর্ম্মান্তিক যাতনা দিবার জন্যই কতকগুলি শাস্তির বিধান হইয়াছিল। চরমপন্থীগণ এখন কেবল তদন্তের জন্য কমিশন নিয়োগের প্রার্থনা করিয়া ক্ষান্ত হইল না। তাহারা তদুপরি গবর্ণরজেনেরাল লর্ড চেমসফোর্ডকে পদচ্যুত করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে। পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার মাইকেল ওডয়ার যাহাতে বিচারালয়ে অপরাধিরূপে আনীত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগের জন্য জবাব দিতে বাধ্য হয়েন, তাহার জন্যও প্রার্থনা করিতে লাগিল। অতঃপর চরমপন্থীদলের সংবাদ পত্র সমূহ গবর্ণমেণ্টকে ভীষণ আক্রমণ করিতে লাগিল।

ক্রমে বুঝিতে পারা গেল যে উহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য পঞ্জাব হাঙ্গামার তদন্তের প্রার্থনা উপলক্ষ করিয়া গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যেই দোষারোপ করা। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে সময় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ প্রকাশ করিয়া স্বকৃত কার্য্যের সমর্থন করা অসম্ভব হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে তখন গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই তদন্ত করিবার জন্য কমিটি

নিয়োগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যখন কমিটী দ্বারা সমস্ত ঘটনা তদন্ত করা হইতে চলিল, তখন কমিটীর মুখ হইতেই প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ হইয়াছিল। গবর্ণমেন্টের গোড়া হইতেই এইরূপ একটী কমিটী নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা ছিল, ও কমন্‌স্‌ মহাসভায় ভারতসচিব মণ্টেগু মহোদয় ও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তদন্তের জন্য কমিটী শীঘ্রই নিযুক্ত হইবে, ও উক্ত কমিটী কেবল হাঙ্গামার মূল কারণ স্থির করিবেন না, তাঁহারা হাঙ্গামা দমনের জন্য গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছিলেন তাহারও আলোচনা করিবেন। এ অবস্থায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মৌনাবলম্বন করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। এদিকে ইংরাজ ও ভারতীয়গণের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষের মাত্রা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কেহ কেহ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে এই কমিটি নিয়োগের ফলে উক্ত জাতি ঘটিত বিদ্বেষ ও বৈরিতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ১৯১৯ সালের সমগ্র গ্রীষ্ম কালে সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টকে প্রচণ্ড আক্রমণ দৈনন্দিন ঘটনা হইয়াছিল। দেশীয় সংবাদপত্রে পাঞ্জাব হাঙ্গামা দমন লইয়া গবর্ণমেণ্টের আচরণের যথেষ্ট নিন্দা ও গবর্ণমেণ্টকে প্রচণ্ড আক্রমণ করা হইতে লাগিল। সাহেবি সংবাদপত্রে গবর্ণমেণ্টের আফগান রাজনীতির তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহার উপর যখন মণ্টেগু চেমসফোর্ড প্রণীত শাসন সংস্কার প্রস্তাবের উপর এদেশের সর্ব্বোচ্চ রাজপুরুষগণের মতামত ও সাউথবরো কমিটির মন্তব্য প্রকাশিত হইল, তখন গবর্ণমেণ্টের উপর আর এক নূতন অভিযোগ আনীত হইল। মধ্যম পন্থী ও চরমপন্থী উভয় দলেরই সংবাদপত্রগণ তীব্র ভাষায় প্রকাশ করিল যে রাজ পুরুষ দিগের ও সাউথবরো কমিটির হস্তে প্রথম প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি অনেকটা মন্দের দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে যখন দেশীয় সংবাদ পত্র কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট আক্রান্ত হন তখন সাহেবি সংবাদ পত্র গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে ফল বিপরীত হইল। পাঞ্জাব হাঙ্গামা ও সংস্কার প্রস্তাবের পরিবর্ত্তন লইয়া দেশীয় সংবাদ পত্রগণ ও সীমান্ত প্রদেশের যুদ্ধে বেবন্দবস্তের জন্য সাহেবি সংবাদ পত্র সমূহ, উভয় দল হইতেই গবর্ণমেণ্টের উপর আক্রমণ চলিল। ইহাতে যে গবর্ণমেণ্টের অনেকটা অপযশ হইল, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। অগত্যা গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন বোধে সত্য ঘটনা প্রকাশ দ্বারা সাধারণের মন হইতে মিথ্যা ধারণা দূর করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের সময় সাধারণকে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা অবগত করাইবার জন্য স্থানীয় কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই কমিটি গুলি অনেক ভাল কার্য্য করিয়াছিলেন। যুক্ত প্রদেশ, মান্দ্রাজ ও পঞ্জাবে প্রচার সমিতি গুলি

কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া যুদ্ধান্তেও বর্ত্তমান থাকে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ও এই পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ কালে প্রকৃত ঘটনা প্রচারের যে বন্দবস্ত করিয়া ছিলেন, তাহা যুদ্ধান্তে উঠিয়া যায়. কিন্তু অচিরে নূতন ও অবস্থানুসারে বন্দবস্ত করেন। কিন্তু যখন ইহার অত্যধিক আবশ্যক ছিল, তখন উক্ত বন্দবস্ত অল্পই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে ইহার অভাবে গবর্ণমেণ্ট বিষম ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন সুতরাং এখন আর তাঁহাদিগের সত্যকথা প্রচারোপযোগী বন্দবস্তের প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিলনা। যদিও থাকিত, তাহা ভারতবর্ষীয় শাসন সংস্কার আইনের পাণ্ডুলিপি সংশোধনার্থ যে জএণ্ট কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার মন্তব্যে দূর হইয়া গেল। উক্ত কমিটী লিখিয়াছেন যে কিদেশীয় কি ইংরাজ অনেক সাক্ষীই তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আক্ষেপের সহিত বলিয়াছে যে শুদ্ধ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদিগের ও উচিত তাঁহারা তাঁহাদিগের বক্তব্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহসের সহিত ও পুনঃ পুনঃ প্রয়োজন মত প্রকাশ করেন। কেন যে গবর্ণমেণ্ট কোন কার্য্য বা ব্যবস্থা করিয়াছেন বা কোন আদেশ দিয়াছেন ও কেন যে কোন প্রস্তাব দেশের অমঙ্গলকর বোধে পরিত্যক্ত করিয়াছেন, সে সমস্ত কারণ সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা ভবিষ্যতে আরও অধিক প্রয়োজনীয় হইবে, ও সুতরাং কি ভারতবর্ষীয় কি প্রাদেশিক সকল গবর্ণমেণ্টেরই উহা প্রকাশের যথোপযুক্ত বন্দবস্ত করা একান্ত বিধেয় হইয়াছে। এখন গবর্ণমেণ্টর কৃত কার্য্যের বা ব্যবস্থার পোষক কারণ গুলি সাধারণের অজ্ঞাত, কিন্তু তাহার বিপক্ষ কারণ গুলি সংবাদ পত্রের সাহায্যে দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। সুতরাং এখন উক্ত প্রকারের বন্দবস্তের আবশ্যকতা সহজেই উপলব্ধি হইবে। কিন্তু ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে উক্ত বন্দবস্তের অভাবে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য বিবরণী দৃষ্টে প্রতীত হইবে।

সকলে উৎসুক হইয়া উক্ত সভার সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনের প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। কেননা সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে তখন গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদিগের বক্তব্য কিছু না কিছু প্রকাশ করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে জানাছিল, যে গবর্ণমেণ্ট একটী নূতন আইন প্রস্তাব করিবেন, যাহার উদ্দেশ্য এই যে পাঞ্জাবে হাঙ্গামা দমন করিবার উদ্দেশে যে সব রাজপুরুষ কোন না কোন বিষয়ে আইন সঙ্গত নহে এখন কার্য্য— দুরভিসন্ধি বশত নহে—কেবল কর্ত্তব্য পালন বোধে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বেআইনি কার্য্য করার দরুন দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া। মধ্যম পন্থী ও চরমপন্থীদল উভয়েই ভাবিলেন যে যখন গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে অত্যাচারি রাজপুরুষগণকে

তাঁহাদিগের স্থায্য দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবার জন্ম আইন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তদন্তের যাহা ফল হইবে তাহাত পূর্ব্বেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই সন্দেহ দ্বারা পরিচালিত হইয়া এবং গবর্ণমেণ্ট কিছু করিবার পূর্ব্বেই পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় তাঁহার কতিপয় সহকর্ম্মী লইয়া তদন্তের জন্ম স্বাধীন ভাবে একটি বেসরকারি কমিটী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু দেশময় একটা উৎকণ্ঠার স্রোত প্রবাহিত হইল। তাহার উপর ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণ এতাবৎকাল রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে একপ্রকার উদাসীন ছিলেন, কিন্তু তুরস্কের সহিত শান্তির ব্যাপার লইয়া বড়ই উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন, কেন না তাঁহাদিগের ধারণা হইয়াছিল, যে এই সন্ধির সর্ত্তগুলি মুসলমানগণের হৃদয়ে কিরূপ মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়াছিল, তাহা বোধ হয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্যক উপলব্ধি করণে অক্ষম হইয়াছেন।

যাহা হউক ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মহামতি গবর্ণর জেনেরল যে বক্তৃতা করিলেন তাহা দ্বারা এই সন্দেহ অনেকটা দূরীভূত করিলেন। তিনি বলিলেন যে ভারতবর্ষীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের তুরস্কের সহিত সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে যে মত তাহা কেবল ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট কেন সমস্ত মহাসভার সমক্ষে ও নিবেদন করা হইয়াছে। তিনি আর ও বলিলেন যে ভারত সচিবের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পরামর্শ করিয়া তদন্তের জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত করিতে স্থির করিয়াছেন। এই কথা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিল। কমিটির সদস্যগণের মধ্যে থাকিবেন, লর্ড হণ্টার যিনি সভাপতি হইবেন, কলিকাতা হাইকোর্টের জজ র‍্যাণকিণ সাহেব, রাইস্ সাহেব যিনি ব্রহ্মদেশের একজন প্রবীণ ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, জেনেরাল ব্যায়ো যিনি সৈনিক বিভাগে উচ্চ পদাভিষিক্ত নেতা, স্যার চিমনলাল শীতল বাড় ও সাহেবজাদা সুলতান আহ্মদ, যিনি গোয়ালিয়ার রাজ্যের একজন সর্ব্বোচ্চপদস্থ কর্ম্মচারি। পরে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মতানুসারে লক্ষ্ণৌএর পণ্ডিত জগত নারায়ণ নামে একজন উকিল ও একজন বেসরকারি সাহেব ও উক্ত তদন্ত কমিটির সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি কানপুরের স্মিথ সহেব ও ইহাঁরা উভয়েই যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। সভ্য গণের মধ্যে কেহ কেহ আক্ষেপ করিলেন যে রয়াল কমিসন নিযুক্ত না হইয়া একটী কমিটি নিযুক্ত হইল। পণ্ডিত মদনমোহন কমিটির পরিবর্ত্তে রয়াল কমিশন নিয়োগ করিবার জন্ম সভার সমক্ষে এক প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। উহা লইয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত চরমপন্থীগণের একটী সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মদনমোহন তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থনার্থ এই তর্ক উত্থাপন করিলেন যে এই তদন্তের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার দায়ী ও অভিযুক্ত, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে এ কমিটী নিযুক্ত করা অসঙ্গত, কেননা কমিটীর মন্তব্য গবর্ণমেণ্টের নিকট

শেষ করা হইবে। কিন্তু সভার অধিকাংশ সভ্যের মতে এই তর্ক সারবান বোধ হইল না। তবে এই প্রস্তাবের পক্ষে কোন কোন সভ্য যে বক্তৃতা করিলেন, তাহা হইতে বুঝা গেল যে তাঁহারা পঞ্জাবের হাঙ্গামা ব্যাপার লইয়া বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এমন কি তাঁহারা ইংরাজহত্যাকেও ইতরলোকদিগের অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। যে সৈন্যগণ ও পুলিশপ্রহরীগণ এই হাঙ্গামা দমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে নৃশংস অত্যাচারি বলিয়া প্রকাশ্যভাবে অভিযোগ করিলেন। প্রায় সকল বেসরকারি সভ্যই দুইটী বিশেষ অনুরোধ করিলেন, প্রথমতঃ আর একজন বেসরকারি দেশীয় ব্যক্তি ও একজন বেসরকারি ইংরাজ উক্ত কমিটীতে নিযুক্ত করা, ও দ্বিতীয়তঃ সামরিক আইনের বলে হাঙ্গামাকারিরূপে যাহাদিগকে জড়িত করা হইয়াছে, তাহাদিগের দণ্ড লাঘবার্থ পুনরালোচনা করা। গবর্ণমেণ্ট এই দুইটী অনুরোধই রক্ষা করিলেন। পণ্ডিত মদনমোহনের প্রস্তাব, সভ্যগণের ভোট না লইয়াই পরিত্যক্ত হইল। ইহা দ্বারা সভ্যগণ এক প্রকার গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের অনুমোদন করিলেন। কিন্তু ১৮ই সেপ্টম্বর তারিখের অধিবেশনে ব্যাপার কিছু গুরুতর দাঁড়াইল। উক্ত দিবসে সার উইলিয়াম ভিনসেণ্ট, যিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আভ্যন্তরিক বিভাগের কর্ত্তা, পূর্ব্বোক্ত দণ্ড নিষ্কৃতি আইনের প্রস্তাব সভার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। এই আইনটী এরূপভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছিল, যে উহা দ্বারা তদন্ত কমিটীর কার্য্যের পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। প্রথমতঃ যে রাজপুরুষগণ প্রকৃতই কর্ত্তব্য পালনের জন্য কোন বেআইনি কার্য্যকরা একান্ত আবশ্যকীয় বোধ করিয়াছিলেন, এই আইনের দ্বারা তাঁহাদিগকে আইন মত শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া ছিল বটে কিন্তু তাঁহাদিগের উপরিতন কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে বিভাগীয় যে শাস্তি দেওয়া উচিত বোধ করিবেন সে শাস্তি হইতে তাঁহারা অব্যাহতি পাইবেন না। দ্বিতীয়তঃ রাজ পুরুষগণ যে সরল ভাবে দুরভিসন্ধি শূন্য হইয়া ও একান্ত আবশ্যক বোধ করিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার বিচার সাধারণ আদালতের উপর ন্যস্ত হইল। অর্থাৎ যাহারা কোন দুরভিসন্ধি বশতঃ বেআইনি কার্য্য করে নাই কেবল সেই সব রাজপুরুষ দিগকেই এই আইন দ্বারা অব্যাহতি দিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু যদি কোন রাজপুরুষ বিভাগীয় শাস্তির যোগ্য বোধ হয়, অর্থাৎ যাহারপক্ষে কর্তৃপক্ষ পদচ্যুতি, বেতন হ্রাস বা ভৎর্সনা করণ বিধেয় বোধ করিবেন, এই আইন তাহাকে সেই বিভাগীয় শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দিবে না। এই আইন লইয়া গবর্ণমেণ্টকে প্রচণ্ড আক্রমণ করা হইয়াছিল ও গবর্ণমেণ্টের সৎউদ্দেশ্যের উপর ও অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সার উইলিয়ম ভিন্‌সেণ্ট বক্তৃতা করিয়া বেসরকারী সভ্যগণকে অনেকটা আশ্বস্ত করিতে পারিয়া ছিলেন। পঞ্জাবের প্রতিনিধিগণ বলিলেন যে তাঁহারা আইন সমর্থন করিতে প্রস্তুত

আছেন। আইনের বিপক্ষদলের নেতা হইয়াছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন। তিনি এক চারি ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলেন যে কেবল রাজপুরুষগণের নিবুদ্ধিতার ও অত্যাচারের ফলেই পঞ্জাবের অধিবাসিগণ উত্ত্যক্ত হইয়া এই হাঙ্গামায় মাতিয়া ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে সব বক্তৃতা হইল তাহা হইতে সভ্যগণ অনেকটা প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক পাঞ্জাবের বাহিরে লোকে এই হাঙ্গামার বিষয় ভাল জানিত না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে মান্দ্রাজ ও আসামের ন্যায় অনেক দূর প্রদেশের সভ্যগণও রাজপুরুষগণের কার্য্য কলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে সমস্ত নিরপেক্ষ বক্তৃতা হইয়াছিল তাহাদ্বারা অনেক সভ্যেরই ভ্রম দূর হইয়াছিল। সার দিনশা ওয়াচার ন্যায় এক জন নির্ভীক ও স্বাধীন চেতা সভ্য বলিলেন যে তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে এই আইন আনয়ন করিয়া গবর্ণমেণ্ট ঠিক কার্য্যই করিয়াছেন। আইন এখন স্থগিত থাকুক এই প্রস্তাবের পক্ষেকেবল দুই তিনজন সভ্য মত দিয়াছিলেন ও আইনের বিবেচনা আরম্ভ হউক এই প্রস্তাব বিনা আপত্তিতে গৃহীত হইল। ২৪শে তারিখে যখন আইন শেষ অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থিত করা হয় তখন ও পণ্ডিত মদনমোহন তাহার বিপক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন ও তিনি পূর্ব্বে যেমন আইনের বিপক্ষ ছিলেন এখন ও সেইরূপ রহিলেন। কিন্তু অতি অল্প সভ্যই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন।

এবারকার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে এই আইন লইয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাদানুবাদ হইয়াছিল। আরও দুইটি আইন ও এই সভা দ্বারা বিবেচিত হইয়াছিল কিন্তু তাহারা সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এই দুইটি আইনের সহিত ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থার কোন সম্বন্ধ ছিলনা। প্রথমটির উদ্দেশ্য কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক তিনটীর সম্মিলন। এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য ভারতবাসিগণকে বাণিজ্যার্থ টাকা ধার করিবার সুবিধা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রদান করা। দ্বিতীয় আইনের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে চামড়া সংস্করণের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য এদেশ হইতে জন্তুর চামড়া ও ছাল, যাহা বিদেশে রপ্তানি হয় তাহার উপর শুল্ক স্থাপন করা। কিন্তু যদিও এই দুই আইন দ্বারা দেশের অনেক উপকারের সম্ভাবনা ছিল, তত্রাচ কেহই উক্ত দুই বিষয়ে মনোযোগ করিলনা। ইহা দ্বারা দেখা গেল যে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই ভারতবাসিগণের মনোযোগ আবদ্ধ থাকে।

অতঃপর নূতন শাসন সংস্কার বিধির উপর লোকের দৃষ্টি পড়িল। এই আইন সমালোচনার ভার পার্লামেণ্ট মহাসভার কতিপয় সভ্য লইয়া গঠিত একটী কমিটীর উপর

অর্পিত হইয়াছিল। উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন লর্ড সেলবোর্ণ। এই কমিটী বিলাতে ভারত হইতে আগত অনেক সাক্ষীর মত গ্রহণ করিলেন। প্রায় ভারতীয় প্রত্যেক সংবাদ পত্রেই এই সাক্ষ্যের বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছিল। যে সমস্ত সাক্ষ্য চরমপন্থীগণের মতের বিপক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল উক্তদলের সংবাদ পত্রে তাহার উপর ঘোর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হইল ও মধ্যমপন্থী গণেরও যথেষ্ট নিন্দাবাদ চলিতে লাগিল। বাস্তবিক মধ্যম পন্থীগণ শাসন সংস্কার আইন সম্বন্ধে যেরূপ নিপুণতার সহিত মত প্রকাশ করিলেন, ও তাঁহাদিগের মন্তব্য যেরূপ ন্যায় সঙ্গত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারা বিলাতের রাজনৈতিক-গণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। চরমপন্থীগণ অন্যদিকে বিলাতের শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বিলাতে তখনও বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন নাই। যখন লর্ড সেলবোর্ণ কমিটীর ভারত শাসন সংস্কার আইনের উপর মন্তব্য প্রকাশিত হইল তখন মধ্যমপন্থীগণ ও বিবি বিশান্তের দল সাদরে উহার প্রশংসা করিলেন ও বলিলেন যে ইহা ভারতবাসিগণের পক্ষে একটী জয়ের কথা। বাস্তবিকই তাঁহারা যে মতামত দিয়াছিলেন, উক্ত আইনের সংশোধনের সময় তাহা অনেকটা গৃহীত হইয়াছিল। অবশ্য মধ্যমপন্থীগণের সকল প্রস্তাবই গ্রাহ্য হয় নাই, কিন্তু অনেকগুলি হইয়াছিল। সংশোধিত আইন যাহা পার্লামেণ্ট সভার সমক্ষে অনুমোদনের জন্য আনীত হইয়াছিল, তাহা কোন কোন অংশে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড আইন অপেক্ষা ভারতবাসিগণের পক্ষে অধিকতর মঙ্গল জনক হইয়াছিল। যখন আইন অনুমোদিত হইল তখন মধ্যমপন্থীগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও বলিলেন যে এই আইন যাহাতে সফল হয় তজ্জন্য তাঁহারা সানন্দে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু চরমপন্থীগণ কিছুতেই সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহাদিগের বিপক্ষদলের অর্থাৎ মধ্যমপন্থীগণের জয় হওয়াতে, তাঁহারা বড়ই অসুখী হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছিলেন যে ভারত-শাসন-সংস্কার-আইন যদি পার্লামেণ্ট মহাসভা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের কোন ক্ষতিই হইতনা। তাঁহারা প্রথম হইতেই গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয়গণের শাসন ক্ষমতা ভাগাভাগি করিবার প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিলেন ও জএণ্ট কমিটীর হস্তে আইন যে অনেকটা সংশোধিত হওয়া হেতু উহা শীঘ্রই পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে ইহা ভাবিয়া আনন্দ অনুভব করিলেন না। যদিও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনেক আপত্তিকর প্রস্তাব উক্ত কমিটী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তথাপি ইঁহারা বলিতে লাগিলেন যে আইন আদৌ সন্তোষকর হয় নাই। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন এক্ষেত্রে তাঁহাদের কি করা উচিত। তাঁহারা কি এই আইনের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবেননা, না তাঁহারা ইহার

প্রতিবাদ করিয়া লোকের মতি গতি এমন পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন যে এই আইন কার্য্যে পরিণত হইলে বিফল হইবে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ কিন্তু প্রকাশ করিলেন যে দেশীয়দিগের সহিত মিলিয়া যাহাতে আইন সফল হয় তজ্জন্য তাঁহারা যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিবেন। এদিকে মধ্যমপন্থীগণও স্থির করিলেন, যে তাঁহারা ইংরাজদিগের সহিত একযোগে কার্য্য করিবেন। কিন্তু তখন অন্যান্য গুরুতর বিষয়ে ভারতবাসিগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াতে শাসন সংস্কার আইন লইয়া বড় বেশী আন্দোলন হইল না। হণ্টার কমিটী তদন্ত আরম্ভ করিলে, অনেকের মনোযোগ সেই দিকে ধাবিত হইল। সাক্ষীগণের সাক্ষ্য বড় বড় অক্ষরে হেডিং দিয়া দেশীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল। একটী দৈনিক সংবাদ পত্র জালিয়ানবাগ ব্যাপারের হেডিং দিলেন—"ডায়ারের রক্তপান"। যাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে এই তদন্তের ফলে ইংরাজ ও দেশীয় গণের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ আরও বর্দ্ধিত হইবে, এ আশঙ্কা অমূলক হইল না।

আবার এই সময়ে তুরস্কের বিষয় লইয়া মুসলমান সমাজে ঘোর আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইল। যদি শীঘ্রই তুরস্কের সহিত সন্ধির সর্ত্তগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হইত তাহা হইলে আর এ আন্দোলন বর্দ্ধিত হইতে পারিত না, ও মুসলমানগণ অদৃষ্টের লিখন বলিয়া অগত্যা ইহাতে সম্মত হইয়া অনর্থক আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেন না। কিন্তু সন্ধিসর্ত্ত প্রকাশে বিলম্ব হওয়াতে পূর্ব্বের নিশ্চেষ্ট ভাবের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টকে তাঁহাদিগের মতানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ১৯১৯ সালের শেষ ছয়মাসে মুসলমানগণের মধ্যে আন্দোলন বৃদ্ধি হইল। শ্রীযুক্ত গন্ধি বিপন্ন বা অত্যাচারিত দিগের সাহায্যার্থ সদাই প্রস্তুত, তিনি হিন্দু হইয়াও মুসলমান দিগের ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপার ঘটিত এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর ও তৎপরবর্ত্তী কয় দিন শান্তি উৎসবের জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন ও এই উপলক্ষে মুসলমান গণের মধ্যে অশান্তির চিহ্ন দেখা গেল। তাঁহারা বলিলেন যে তুরস্কের দুর্দ্দশায় তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা কি রূপে এই উৎসবে যোগ দিতে পারেন? গন্ধি এই সময় পুনরায় একটি হর্ত্তাল অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিলেন। মুসলমান গণের প্রার্থনা যে যুদ্ধের পূর্ব্বে তুরস্কের অধীনে যে যে দেশ ছিল তাহা যেন এখনও সেইরূপ থাকে, ও সুলতান যেমন মুসলমান ধর্ম্মের নেতা ছিলেন তাঁহার সেই পদ যেন পূর্ব্ববৎ অক্ষুন্ন থাকে। এই প্রার্থনা পূর্ণ না হওয়ার জন্য তাঁহারা উৎসবের সময় আনন্দ না করিয়া শোক প্রকাশ করিবেন ইহাই আন্দোলনের নেতাগণ স্থির করিলেন। দেশের সর্ব্বত্র যুদ্ধাবসানের জন্য উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, কিন্তু আন্দোলনকারিগণের চেষ্টায় অনেক মুসলমান—বিশেষতঃ দিল্লী সহরে—ইহাতে যোগ দিল না। এই সময়

হইতে তুরস্কের পূর্ব্বাবস্থা যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তাহার পক্ষে ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হইল ও এই আন্দোলনের সঙ্গে অনেক মিথ্যাকথা প্রচারিত হইল। তুরস্কের সুলতানের উপর খ্রীষ্টিয়ানগণ বিবিধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ভারতবর্ষীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে বদ্ধমূল করিবার জন্য যত্ন করা হইতে লাগিল। বিলাতের কতক গুলি সম্বাদ পত্রে ক্রুসেড্ নামধেয় খ্রীষ্টান ও মুসলমানের সহিত যে ধর্ম্মযুদ্ধ আটশত বৎসর পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইন দেশে হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করাতে এদেশীয় মুসলমানগণের মধ্যে উক্ত বিশ্বাস আর ও দৃঢ়ীভূত হইল। গবর্ণমেণ্ট অনেক চেষ্টা করিয়া ও মুসলমান সাধারণের মন হইতে এই বিশ্বাস দূর করিতে সক্ষম হইলেন না। খ্রীষ্টিয়ান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপার লইয়া হস্তক্ষেপ করিলে সুফলের আশা অল্পই ছিল। গবর্ণমেণ্ট নানা উপায় অবলম্বন করিয়া মুসলমানগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে তুরক লইয়া যে আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা রাজনৈতিক ব্যাপারে ঘটিত ও ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। এই চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই, কিন্তু বর্ষের শেষ ভাগে হিন্দু আন্দোলনকারিগণ মুসলমান দিগের সহিত যোগ দেওয়াতে ব্যাপার কিছু গুরুতর হইয়া উঠিল। কোন কোন মুসলমান নেতাগণ, যাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধাবসানে কারামুক্ত হইয়া ছিলেন, গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে এমনি ভীষণ বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন, যে তাহাদ্বারা হাঙ্গামা ঘটিবার সম্ভাবনা জাগরূক হইয়া উঠিল।

এইরূপ অশান্তিময় অবস্থার সময় কংগ্রেস সভার অধিবেশন হইল। পঞ্জাবের হাঙ্গামা দমনের জন্য রাজপুরুষগণ যে সমস্ত বে-আইনি কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহার প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অমৃতসর সহরেই এই অধিবেশন স্থিরীকৃত হইল। মসলিম লিগ নামক মুসলমান দিগের সভার অধিবেশন ও এই স্থানে হওয়া ঠিক হইল। কোন কোন মধ্যম পন্থী মুসলমান ইহাতে আপত্তি করিলেন। তাঁহারা বলিলেন অমৃতসরে লীগের অধিবেশন করিলে লীগ কংগ্রেসের প্রভাবদ্বারা অনেকটা চালিত হইবে। কিন্তু চরমপন্থী মুসলমানগণের আগ্রহে অমৃতসরই স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। মধ্যমপন্থী দল অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা যদিও হাঙ্গামা দমনে রাজপুরুষ দিগের আচরণের নিন্দা করিতে চরমপন্থীগণের সহিত একমত হইলেন, তবু গবর্ণমেণ্ট যে সম্পূর্ণ দোষী তাহা স্বীকার করিতে অথবা গবর্ণরজেনেরাল লর্ড চেমসফোর্ডকে কর্ম্মচ্যুত করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। হণ্টার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর গবর্ণরজেনেরালকে পদচ্যুত করণ প্রস্তাব সম্বন্ধীয় আন্দোলন আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু শাসন সংস্কার আইন লইয়াই উভয় দলে বিশেষ মতভেদ ছিল। মধ্যমপন্থীগণের মত ছিল যে

আইন অনেকাংশে সংশোধিত হইয়া এমন সন্তোষজনক ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যে উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া যাহাতে উহার উদ্দেশ্য সফল হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। অপর দলে আইন সম্বন্ধে কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কাহার কাহার মতে আইন অসন্তোষজনক সুতরাং অগ্রাহ্য করা উচিত। অপর কেহ কেহ বলিলেন যে তাঁহাদিগের উচিত আইন মত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে মনোনীত হইয়া সভায় প্রবেশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক কার্য্যের উপর এরূপ কঠোর ভাবে আক্রমণ করা যে উহার ফলে সভার কার্য্য সম্পাদন অসাধ্য হইয়া পড়িবে ও তখন গবর্ণমেণ্ট অগত্যা আইন চরমপন্থীগণের মতানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। চরমপন্থী বক্তাগণ আইনের বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে উক্ত আইনের দ্বারাকেবল উহার প্রণেতাগণের বুদ্ধিহীনতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শেষে তাঁহারা সাব্যস্ত করিলেন যে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়া যাহাতে সভার কার্য্য অচল করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করাই যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে। মধ্যমপন্থীগণের সংবাদ পত্র সমূহ বলিলেন যে যখন দেখা যাইতেছে যে উহাদিগের মতের সহিত বৈষম্য এত অধিক তখন আর তাঁহাদিগের পক্ষে বিপক্ষ দলের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য মিলিত হওয়া বৃথা। তাঁহারা অমৃত সরে কন্‌গ্রেস সভায় গমন্ করিতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু যদি তাঁহাদিগের দলস্থ কোন ব্যক্তি কন্‌গ্রেসে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তিনি করিতে পারিবেন ও তাহাতে কোন আপত্তি নাই ইহাও প্রকাশ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা ঠিক ঐ সময়েই তাঁহাদিগের দলস্থ ব্যক্তিগণকে লইয়া কলিকাতায় এক সভার অধিবেশন করিলেন। চরমপন্থী দলের বৈঠকে কেবল গবর্ণমেণ্ট কৃত অতীত ঘটনার বিষয় লইয়াই গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অভিযোগ করা হইল। অপর পক্ষে মধ্যমপন্থীগণ ভবিষ্যতে তাঁহারা কিরূপে নিজ দল লইয়া কার্য্য করিবেন তাহাই স্থির করিতে ব্যাপৃত হইলেন।

কন্‌গ্রেশের অধিবেশনের অব্যবহিত পুর্ব্বেই সংস্কার আইন পাশ হওয়া উপলক্ষে সম্রাটের ঘোষণা পত্র প্রকাশিত হইল। ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পর এরূপ চিত্তাকর্ষক ঘোষণা অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবাসি গণের রাজনৈতিক উন্নতির ইচ্ছার উল্লেখ করিয়া সম্রাট তাঁহার ভারতবর্ষীয় প্রজাগণকে আশ্বাস দিলেন, যে শাসন সংস্কার আইনের দ্বারা তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা অচিরে সিদ্ধ হইবে। এই ঘোষণা পত্রের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"গ্রেট বৃটেন ও আয়ার্লণ্ড সংযুক্ত রাজ্যের ও বিদেশস্থ ব্রিটিশাধিকৃত দেশ সমূহের অধীশ্বর ধর্ম্মরক্ষক পঞ্চম জর্জ তাঁহার গবর্ণরজেনেরাল ও ভারতবর্ষীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজা সাধারণ কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অদ্য এক নূতন যুগের আরম্ভ হইল। আমি সম্প্রতি একটি

আইনে সম্মতি দিয়াছি যাহা ভারতবর্ষে সুশাসনের জন্য ও ভারতবাসি গণের মঙ্গলের জন্য পার্লামেণ্টে মহাসভা কর্তৃক যে সমস্ত আইন অনুমোদিত হইয়াছে তন্মধ্যে একটি প্রধান রূপে গণ্য হইবে। ১৭৭৩ ও ১৭৮৪ সালের আইন দ্বারা ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয় কোম্পানির অধিকারে ন্যায্য বিচারের বন্দবস্ত করা উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৩৩ সালের আইন দ্বারা ভারতবাসিগণের সরকারি চাকরিতে প্রকাশ করায় দ্বার উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছিল। ১৮২৮ সালের আইন দ্বারা ভারতবর্ষের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ইংলণ্ডেশ্বরী স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয়গণের রাজনৈতিক জীবন, যাহা আজি দেখা যাইতেছে, তাহার সৃষ্টি হয়। ১৮৭১ সালের আইন দ্বারা ভারতবর্ষে জন সাধারণের প্রতিনিধি সভা গঠনের বীজ রোপিত হয় ও ১৯০৯ সালের আইন দ্বারা উক্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এখন যে আইন পাস হইয়াছে। তাহাদ্বারা ভারতবাসি-গণের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের হস্তে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা আংশিক ন্যস্ত হইল ও যাহাতে ক্রমে সম্পূর্ণ শাসন ক্ষমতা ভারতবাসিগণ লাভ করিতে পারেন তাহার পথ প্রদর্শন করা গেল। অমি নিঃসন্দেহে আশা করিতেছি যে এই আইন দ্বারা যে রাজনীতি প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা যদি সিদ্ধ হয় তাহা হইলে মানবের উন্নতির ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং আজি আমি আপনাদিগকে অতীত অবস্থা বিবেচনা করণের জন্য ও আমার সহিত ভবিষ্যতে নূতন আশা পোষণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

২। যেদিন ভারতবর্ষের শাসন দণ্ড আমাদিগের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে আমাদিগের রাজবংশ বরাবরই উক্ত শাসন ভার একটি পবিত্র ব্রতরূপে পালন করিয়া আসিতেছেন। ১৮৫৮ সালে চিরপূজনীয়া পরলোকগতা ভারতেশ্বরী রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করেন যে তিনি তাঁহার অন্যান্য প্রজার সহিত যেরূপ কর্ত্তব্য সূত্রে সংযুক্ত, ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের সহিত ও তাঁহার ঠিক সেই সম্বন্ধ এবং তিনি ভারতবাসিগণকে আশ্বাস প্রদান করেন যে তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ ও সুবিচার লাভ করিবেন। ১৯০৩ সালে আমার পরলোকগত প্রিয় পিতৃদেব যে ঘোষণা করেন, তাহাতে তিনি ও বলেন যেপূর্ব্বের ন্যায় সকরুণ রাজ্যশাসন ও সুবিচার দান করিতে তিনি কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। পুনশ্চ ১৯০৮ সালে তিনি যে ঘোষণা করেন তাহাতে পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে যে আশ্বাসবাণী প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার পুনরুক্তি করেন ও এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে যতদূর উন্নতি হইয়াছিল তাহা সমালোচনা করেন। আমি ১৯১০ সালে যখন সিংহাসনে অভিষিক্ত হই, তখনও আমি, ভারতীয় রাজন্য বর্গ ও জন সাধারণ আমাকে রাজভক্তিসূচক যে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে

বলিয়া ছিলাম যে যাহাতে ভারতবাসিগণের উন্নতি ও মঙ্গল হয় তদ্বিষয়ে যত্নপর হওয়াই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। পরবৎসর আমি সাম্রাজ্ঞীর সহিত ভারতবর্ষে গমন করি ও তখনও ভারতবাসিগণের প্রতি সহানুভূতি ও তাহাদিগের মঙ্গল সাধনের জন্য আমার ঐকান্তিক অভিলাষ প্রকাশ করিয়া ছিলাম॥

৩। একদিকে যেমন আমার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আমিও ভারতবাসিগণকে ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি, অপর দিকে পার্লামেণ্ট মহাসভা, ইংলণ্ডীয় জন সাধারণ ও আমার অধীন রাজপুরুষগণ ও ভারতবাসিগণের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি কল্পে প্রাণপণে যত্ন করিয়া আসিতেছেন। বিধাতার কৃপায় আমরা নিজে যে আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি, ভারতবাসিগণকে ও সেই আশীর্ব্বাদের ফলভোগী করিয়াছি। কিন্তু এখনও একটি মহামূল্য দান ভারতবাসিগণকে প্রদান করিতে বাকি আছে। সেটি তাঁহাদিগের দেশের শাসন ক্ষমতা ও নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গল সাধনের ক্ষমতালাভ। এই ক্ষমতার অভাবে দেশের উন্নতির পথ সহজ হইতে পারেনা। বৈদেশিক শত্রু কর্ত্তৃক আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ রক্ষা করা আমাদিগের সম্রাটোচিত কর্ত্তব্য ও আমরা অতি গৌরবের সহিত এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছি। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরিক শাসন ভার, দেশের লোকেদের নিজ হস্তে অর্পণ করার সময় আসিয়াছে। এই ভার বড়ই গুরু ও কঠিন ও যত দিন না ভারতবাসিগণ শাসন কার্য্যে অভিজ্ঞ না হইতেছেন ততদিন তাঁহাদিগের পক্ষে এই গুরুতর ভার সম্পূর্ণ ভাবে বহণ করা অসাধ্য। সুতরাং এক্ষণে এই অভিজ্ঞতা লাভের সুবিধা দেওয়া হইতেছে।

৪। ভারতবাসিগণের প্রতিনিধিমূলক অধিষ্ঠানের অভিলাষ আমি সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া আসিতেছি। প্রথমে সামান্য অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া এক্ষণে বৃহৎ অনুষ্ঠানের উচ্চাকাংক্ষা ভারতের শিক্ষিত সমাজ হৃদয়েপোষণ করিতেছেন। তাঁহারা সরল ভাবে, সাহসের সহিত ও শাসনবিধি সঙ্গত উপায়ে এই পথে অগ্রসর হইতেছেন। যাহারা আইন অমান্য করে এই রূপ কতকগুলি ব্যক্তি স্বদেশ হিতৈষিতার নামে স্থানে স্থানে অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের উদ্দমের উপর কলঙ্কারোপণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে সেই চেষ্টা বিফল হইয়াছে। যে মহান উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জর্ম্মাণির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ভারতবাসিগণের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নূতন বলে বলীয়ান হইয়াছে। আর জর্ম্মাণ যুদ্ধে ভারত যে ইংরাজগণের প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল, ইংলণ্ডের দুর্ভাবনা ও বিপদের অংশী হইয়াছিল, তাহার জন্যও ভারতীয়গণ তাঁহাদিগের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিষয়ে ইংরাজের সহানুভূতি ও সাহায্যের

দাবি করিতেছেন। বস্তুতঃ ভারতবাসিগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের ইচ্ছার মূলই ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ স্থাপন। ইংরাজের অধিকারে আসিয়া ভারতবাসিগণ মানবের চিন্তাক্ষেত্রে ও ইতিহাসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা হইতে উক্ত ইচ্ছার উৎপত্তি হইয়াছে। বলিতে কি এতদিন ইংরাজাধিকারে থাকিয়া এখনও যদি ভারতবাসিগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের বাসনা না জন্মিত তাহা হইলে ইংলণ্ডের ভারতের প্রতি কর্ত্তব্য একপ্রকার অসম্পূর্ণ থাকিত। সেই জন্ম স্বীকার করিতে হইবে যে অনেক বৎসর অতীত হইল ভারতবর্ষে ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি-মূলক অনুষ্ঠানের যে পত্তন করা হইয়াছিল, তাহা সুবুদ্ধির পরিচায়ক। দেশীয় গণের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে এদেশে দায়িত্বপূর্ণ গবর্ণমেণ্ট স্থাপনার দিন সম্মুখীন হইয়াছে।

৫। পূর্ব্বে যেমন এখনও সেইরূপ সহানুভূতির সহিত ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনুরাগের সহিত আমি ভবিষ্যতে উন্নতির পথে ভারতকে অগ্রসর হইতে দেখিতে থাকিব। এ পথ সহজ নহে ও গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে হইলে ভারতবাসী সকল জাতীয় ও শ্রেণীর লোকের পক্ষেই অনেক সহিষ্ণুতা ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বর্জন আবশ্যক। আমার বিশ্বাস তাঁহাদিগের এই সব প্রধান গুণের অভাব হইবে না। আমি ভরসা করি যে যাঁহারা নূতন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সভাগুলির সদস্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন তাঁহারা যেন যাহারা তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়াছে তাহাদের মনের ভাব প্রকৃত ভাবে প্রকাশ করেন ও দেশের আপামর সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে বিস্মৃত না হয়েন। কেননা সমাজের নিম্নস্তরের অনেকে এখনও নির্ব্বাচনাধিকার লাভ করিতে পারে নাই। আমার বিশ্বাস যে দেশের মধ্যে যাঁহারা নেতৃস্থানীয়, যাঁহারা ভবিষ্যতে মন্ত্রি পদে অভিষিক্ত হই-বেন, তাঁহারা নিজস্কন্ধে দায়িত্ব গ্রহণে কখন পরাঙ্মুখ হইবেন না, তাঁহারা বিনাদোষে মিথ্যা নিন্দা অকাতরে সহ্য করিবেন ও রাজ্যের মঙ্গলার্থ প্রয়োজন হইলে ত্যাগ স্বীকারও করি-বেন। কেন না তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা দলাদলির ঊর্দ্ধে ও জাতি বা ধর্ম্মগত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে। তাঁহারা যেমন একদিকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করিতে পারেন, তেমনি অন্য দিকেও যেন আমার কর্ম্মচারিগণের সহিত একযোগে কর্ম্ম করিয়া দেশের হিত সাধন করিতে পারেন। সামান্য বিষয়ে মতভেদ হইলে তাহা পরিত্যজ্য, কিন্তু একটি ন্যায়পরায়ণ ও উদার মতাবলম্বী গবর্ণমেণ্টের যে মহান আদর্শ থাকা উচিত তাহা যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে তাহা তাঁহাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজ কর্ম্মচারিগণকেও বলিতেছি যে যেন তাঁহারা তাঁহাদিগের নূতন সহযোগীগণের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে কখন

বিমুখ না হ'ন, তাঁহাদিগের সহিত প্রীতি ও একতার সহিত সুশৃঙ্খলে কার্য্য করেন ও যাহাতে জন সাধারণ ও নির্ব্বাচিত মন্ত্রী ও প্রতিনিধিগণ, পূর্ণ স্বাধানতা সূচক অনুষ্ঠানের পথে অগ্রসর হইতে পারেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন। রাজপুরুষগণ এইরূপে তাঁহাদিগের নূতন কর্ত্তব্য পালন করিয়া আমার ভারতবর্ষীয় প্রজাগণের সেবাব্রতে পূর্ব্বের ন্যায় এখনও দেশের হিত সাধনে ও নিজ নিজ সুখ্যাতি অর্জ্জনে নূতন সুবিধা লাভ করিবেন।

৬। ইহা আমার ঐকান্তিকী কামনা যে এই শুভ সময়ে যেন আমার প্রজাগণের ও রাজপুরুষগণের মধ্যে অসদ্ভাব, যতদূর সম্ভব, তিরো হত হয়। যাহারা রাজনৈতিক উন্নতি লাভে ব্যগ্রতা বশতঃ ইতিপূর্ব্বে আইন ভঙ্গ করিয়াছিল, তাহারা যেন ভবিষ্যতে সেই অপরাধ পুনরায় না করিয়া আইনের সম্মান রক্ষা করে। যে রাজপুরুষগণ দেশে শান্তিরক্ষার ও সুশৃঙ্খলার সহিত উন্নতিসাধনের দায়িত্বের গুরুভার বহনে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা বিগত হাঙ্গামায় যে অত্যাচার দমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সে অত্যাচারের কথা যত শীঘ্র ভুলিয়া যাইতে পারেন, রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণের উচিত দেশে এমন অবস্থা আনয়ন করা। সম্মুখে নবযুগ আগত। এখন আমার প্রজাবৃন্দ ও রাজ কর্ম্মচারিগণ উভয়ের একই সংকল্প হওয়া উচিত যে তাঁহারা উভয়েই একতার সহিত উভয়েরই এক উদ্দেশ্যে, যথা দেশের হিত সাধন ব্রতে, এক মনে নিযুক্ত থাকিবেন। অতঃপর আমি আমার প্রতিনিধি গবর্ণর জেনেরালকে আদেশ দিতেছি যে তিনি যেন আমার নামে ও আমার পক্ষে আমার রাজকীয় সকরুণ ক্ষমাদান-ক্ষমতা বলে রাজনৈতিক অপরাধিগণকে যতদূর সম্ভব দণ্ড হইতে অব্যাহতি দান করেন। যাহারা সরকারের বিপক্ষে কোন অপরাধ করিয়া অথবা কোন সামরিক আইন ভঙ্গ অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে, অথবা যাহারা নজরবন্দী হইয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমার ইচ্ছা যে আমার প্রতিনিধি তাহাদিগকেও ক্ষমা করেন। তবে যাহাদিগকে দণ্ড হইতে মুক্তি দিলে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা আছে তাহাদিগের কথা স্বতন্ত্র। আমি আশা করি যে যাহারা এই ক্ষমা লাভে উপকৃত হইবে, তাহারা ভবিষ্যতে যেন এরূপ আচরণ করে যে তাহা কোনরূপে দূষণীয় না হয় এবং আমার প্রজা সাধারণ ও এরূপ বিনীতভাব অবলম্বন করে, যে তাহাদিগের উপর আইন প্রয়োগ করিতে কর্ত্তৃপক্ষগণ বাধ্য না হ'ন।

৭। ভারতবর্ষে নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তনের সঙ্গে আমি দেশীয় রাজন্য বর্গের একটি সভা গঠন প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দান করিয়াছি। আমি আশা করি যে এই সভার সভ্যগণের পরামর্শে তাঁহাদিগের নিজের ও তাঁহাদিগের রাজ্য সমূহের প্রভূত

উপকার সাধিত হইবে ও যে সব বিষয়ে তাঁহাদিগের ও ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষের স্বার্থ এক সেই সব বিষয়ে উন্নতির উপায় হইবে। এইরূপে সমগ্র সাম্রাজ্যের মঙ্গল সাধিত হইবে। আমি এই উপলক্ষে দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে যাহাতে তাঁহাদিগের মান মর্য্যাদা ও স্বার্থ সম্যক রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে আমি স্থির সঙ্কল্প হইয়াছি।

৮। আমার অভিলাষ যে আমার প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করি। তিনি আগামী শীতকালে তথায় আমার পক্ষে নূতন রাজন্যবর্গের সভা ও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি গণের সভাগুলি স্থাপন করিবেন। তিনি যেন তথায় দেখিতে পান যে যাঁহারা ভবিষ্যতে দেশ সেবা ব্রত ধারণ করিবেন তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও বিশ্বাস রহিয়াছে। এইরূপে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের শ্রম সার্থক হইবে ও রাজ্যশাসন ব্যাপারেও উন্নতি সাধিত হইবে। এক্ষণে আমি আমার প্রজামণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহাদ্বারা চালিত হইয়া ভারতবর্ষ যেন শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ ভোগ করিতে পারে ও ক্রমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিতে সমর্থ হয়।"

সম্রাটের এই ঘোষণা বাণী ভারতের সর্ব্বত্র মহানন্দের সহিত গৃহীত হইল। জন সাধারণ সম্রাটের দয়ার পরিচয়ে মুগ্ধ হইল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর ও ইহার প্রভাব অল্প হয় নাই। মধ্যমপন্থীগণ বলিলেন যে শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য তাঁহাদিগের উদ্যম ও আন্দোলন সফলতা লাভ করিয়াছে ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ও কুমারি বেশান্ত মহোল্লাসে বলিলেন, যে ভারতবর্ষ এতদিনে স্বাধীনতার সোপানে আরোহণ করিল। রাজনৈতিক অপরাধিগণকে ক্ষমা দানে রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। বস্তুতঃ, গবর্ণমেণ্ট বহুদিন হইতে যে রাজ নীতির অনুসরণ করিতে ছলেন, এই ঘোষণা পত্র তাহারই চরম ফল। ১৯১৯ সালে এক বাঙ্গালা দেশের মধ্যেই ৫৩৮ জন ব্যক্তি, যাহাদিগের স্বাধীনতার উপর যুদ্ধকালীন আইনের বলে হস্তক্ষেপ করা হইয়া ছিল, সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইল। পঞ্জাবে ও উক্ত বর্ষে ৫৩৪ জনকে ঘোষণা পত্র প্রকাশের পূর্ব্বেই মুক্তিদান করা হইয়াছিল। সামরিক আইন দ্বারা স্থাপিত বিচারালয় সমূহ দ্বারা যাহারা দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই অব্যাহতি লাভ করিল। মুক্ত দানের আদেশ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই ২৫০ জনকে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট মুক্তি দান করিয়াছিলেন। যখন ঘোষণা পত্র প্রকাশ হয় তখন দুইজন জজ, সামরিক আদালতের হস্তে যাহারা দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহাদিগের দণ্ড পুনরালোচনা করিতেছিলেন। ঘোষণা পত্রের বলে পাঞ্জাবে ১৮০০ দণ্ডিত ব্যক্তির মধ্যে ৯৬জন বাদে সকলেই মুক্তিলাভ করিল। বোম্বাই প্রদেশে ৭২ জন মুক্তিলাভ করিল ও ১৯জনের দণ্ড

লাঘব করা হইল। দিল্লীনগরের বন্দীগণের মধ্যে দুই জন ব্যতীত সকলেরই সাজা কমান হইল অথবা একেবারে মুক্তিলাভ হইল। প্রায় সর্ব্বত্রই এই উদার নীতি অনুসৃত হইল ও এক্ষণে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই কোনরূপ দণ্ড ভোগ করিতেছে।

রাজ্য শাসন সংক্রান্ত নূতন অবলম্বিত রাজনীতি ও সম্রাটের ঘোষণা পত্র, এই উভয়েই জন সাধারণকে রাজপুরুষগণের সহায়তার জন্য আহ্বান করা হইল। মধ্যমপন্থীদল সাদরে এই আহ্বান গ্রাহ্য করিলেন। কলিকাতায় উক্ত দলের যে অধিবেশন হয় তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় সংস্কারগুলি যাহাতে সফলতা লাভ করে তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ ইচ্ছুক, ইহা প্রকাশ করা হইল। কিন্তু চরমপন্থীগণের উপর এই উদারনীতির বিশেষ কোন প্রভাব তখন লক্ষিত হইল না। অমৃতসরে এমন সব বক্তৃতা হইয়াছিল, যে যাহাতে অসংযত ভাষা প্রয়োগ ও অন্যায় আক্রমণের চরম সীমা অতিক্রম করা হইয়াছিল। যাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে বিশেষ বিদ্বেষের পরিচয় দিল। পঞ্জাবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের কঠোর প্রতিবাদ সূচক মন্তব্য সভায় সভায় অনুমোদিত হইল। সম্রাট সকলকে পুরাতন কথা ভুলিয়া গিয়া নূতন উদ্যমে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু চরমপন্থীগণের কার্য্যে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। লর্ড চেমসফোর্ডকে পদ হইতে অপসৃত করিবার প্রস্তাব অমৃতসরের বৈঠকে গৃহীত হইল। শাসন সংস্কার বিধি অসন্তোষজনক ও বিশেষ উপকারী হইবে না, এই মতও গৃহীত হইল। পঞ্জাবের হাঙ্গামা দমন ব্যাপার উল্লেখ করিয়া সভাপতি গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন ও শাসন সংস্কার আইনের দ্বারা ভারতবর্ষের বিশেষ উপকার হইবে না, এই কথাও সাধ্যমত প্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ চরমপন্থীগণের বক্তৃতার সুর এত গরম দেখা গেল, যে তাঁহারা যে গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিত হইয়া নূতন শাসন প্রণালী সফল করিতে চেষ্টা করিবেন, এ আশা দূর হইয়া গেল ও তাঁহারা ভবিষ্যতে কি পন্থার অনুসরণ করিবেন সে সম্বন্ধে বিষম ভাবনার কারণ জন্মিল। সমগ্র কনগ্রেসের দল কেবল শাসন সংস্কার বিষয় কেন, সকল বিষয়েই গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা করিবে, যেন এইরূপই বোধ হইতে লাগিল। আশা করা যায় যে এই আশঙ্কা অমূলক হইবে, কেননা চরমপন্থীদলের যুবকদিগের উৎসাহ, অধ্যবসায়, মহান্ আদর্শে অনুরক্তি প্রভৃতি অনেক গুণ আছে ও তাঁহারা সুপথে চালিত হইলে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অনেক বিষয়ে উন্নতি সাধন হইতে পারে। আশা করা যায় যে দেশ-হিতকর নূতন কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়া চরমপন্থীদল ক্রমে গবর্ণমেণ্টের সহিত মিলিয়া কার্য্য

করিতে শিক্ষা করিবেন ও তদ্দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতালাভের দিন নিকটবর্ত্তী করিবেন।

এক্ষণে উল্লেখ করা উচিত যে দেশে শাসন সংস্কার সম্বন্ধীয় যে যে পরিবর্ত্তন হইতেছিল, তাহার সূচনা দুইটী কমিটির নিয়োগে দেখা গিয়াছিল যাহাদিগের অনুসন্ধানের ফলে শাসনসংস্কার প্রণালী অনেক সরল হইতে পারিবে। প্রথমটি অর্থাৎ সৈন্যসংক্রান্ত কমিটির বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই কমিটির সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে সৈন্য দলের উন্নতির উপর ও তাহাদিগের বহিঃশত্রুকে বিতাড়িত করিয়া দেশে শান্তি রক্ষা করণে সামর্থ্যের উপর ভারতবর্ষের ভবিষ্যত উন্নতি অনেকটা নির্ভর করিতেছে। দ্বিতীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন সার হারবার্ট স্মিথ, যিনি বিলাতের বোর্ড অফ ট্রেডের সম্পাদক। এই কমিটির উদ্দেশ্য সরকারি সেরেস্তা দোরস্ত করা অর্থাৎ কার্য্যনির্ব্বাহে যাহাতে বিলম্ব না হয় ও পরস্পরের সাহায্য পাওয়া যায় তাহার উপায় করা। বিষয়টি অতীব আবশ্যকীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এই কমিটির মন্তব্য এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

এইরূপে যদিও বর্ষের আরম্ভে অনেক ভাবনার ও দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল, বর্ষ শেষে আশার আলোক দেখা দিয়াছিল। ভারতে সংস্কারের যুগ আসিয়াছে। যাহাদের হস্তে দেশের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত আছে, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিকগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন যে তাঁহারা যোগদান করিয়া যাহাতে সংস্কার আইন সফল হয় সে বিষয়ে চেষ্টা করুন। এক্ষণে ভারতবাসিগণের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা কঠোর পরিশ্রম সহকারে কার্য্যে পরিচয় দিন যে সাধারণের উপকার করণেচ্ছা, পরের মঙ্গলের জন্য নিজের ক্ষতি স্বীকার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যকরণ প্রভৃতি সদগুণের তাঁহারা অধিকারী হইয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা।

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবি, শতকরা সত্তর জন কৃষি-কর্ম্মদ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সুতরাং বর্ষে বর্ষে ফসলের উপর ভারত-বর্ষের রাজস্ব অনেকটা নির্ভর করে। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে দুই কোটী পাউণ্ড বা ত্রিশ কোটিরও অধিক টাকা পাঠাইতে হয়। ইহার কারণ প্রথমতঃ কোম্পানির কাগজের সুদ হিসাবে অনেক টাকা প্রতি বর্ষে দিতে হয়। কোম্পানির কাগজের অর্থ এই যে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট দেনা করিয়া মূলধন হস্তগত করেন ও এই মূলধন এতকাল শতকরা সাড়ে তিন টাকা বার্ষিক সুদে ধার করা হইয়াছিল। এইসব সুদ বহনকারি কাগজকে কোম্পানির কাগজ কহে। এই দেনা করিয়া যে টাকা পাওয়া যায়, তাহা রেলওয়ে নির্ম্মাণ খাল খনন ও অন্যান্য সাধারণের হিতকর বিষয়ের জন্য খরচ করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এই সব অনুষ্ঠান হইতে যাহা লাভ করেন তাহাতে মূলধনের উপর শতকরা সাত টাকা সুদ পোষা-ইয়া থাকে। কিন্তু অনেক কোম্পানির কাগজের মালিক বিলাতবাসি ইংরাজগণ, সুতরাং সুদ বাবদ প্রতিবর্ষে বিলাতে অনেক টাকা পাঠাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, বর্ষে বর্ষে বিলাতে ভারতবর্ষের দরকারের জন্য অনেক টাকার মাল কিনিতে হয়। রেলওয়ে সংক্রান্ত অনেক জিনিস এ দেশে মিলে না সুতরাং উহা বিলাত হইতে কিনিয়া আনিতে হয় ও ইহার মূল্যের জন্যও অনেক টাকা প্রতি বর্ষে এদেশ হইতে বিলাতে পাঠাইতে হয়। তৃতীয়তঃ এদেশের সাহেব কর্ম্মচারিগণ ছুটি লইয়া মধ্যে মধ্যে বিলাতে গমন করেন, তাঁহাদিগের ছুটিতে বেতন দান হিসাবেও অনেক টাকা বিলাতে পাঠাইতে হয়। তাহার উপর যাঁহারা এদেশে চাকরি করিয়া পেনসন লইয়া বিলাতবাসি হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের পেনসন হিসাবে ও এদেশ হইতে প্রতিবর্ষে বিলাতে টাকা পাঠাইতে হয়। ভারত সচিবের নিজের ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের বেতন ভারতবর্ষকেই এতাবৎ বহন করিতে হইত, কিন্তু শাসন সংস্কার আইনের দ্বারা এই খরচা অতঃপর ইংলণ্ডীয় প্রজা সাধারণকে বহন করিতে হইবে। যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহের জন্য বর্ষে বর্ষে অন্যূন ত্রিশকোটি টাকা ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতে বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ত্রিশ কোটী টাকা বাস্তবিক টাকা মোহর বা নোটে করিয়া বিলাইতে পাঠাইতে হয় না। ভারতবর্ষের পূর্ব্বোক্ত খরচা চালাইবার জন্য

ভারতসচিব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নামে হুণ্ডী কাটিয়া থাকেন। এই রূপেই ত্রিশ কোটি টাকা ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে ভারতসচিবের হস্তে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় ও সন্তোষ-জনক। ১৯১৯ সালের নবেম্বর মাসের শেষে ভারত বর্ষের সাধারণ দেনা, অর্থাৎ কোম্পানির কাগজের মূল্য ছিল ৩৭ কোটি আশি লক্ষ পৌণ্ড। পৌণ্ডের মূল্য দশ টাকা ধরিলে সাধারণ দেনা ৩৭৮ কোটি টাকা। ভারতবর্ষের বার্ষিক রাজস্ব বার কোটি ত্রিশ লক্ষ পোণ্ড, অর্থাৎ ১২৩ কোটি টাকা। সুতরাং সে হিসাবে দেনা অতি লঘু বলিতে হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে পরিমিত ব্যয়ের ফলেই এই সন্তোষজনক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। যখন যুদ্ধের আরম্ভ হয়, তখন ভারতের সাধারণ দেনা যত টাকা ছিল, তাহা সমস্তই লাভকর রেলওয়ে নির্ম্মাণ ও খাল খননের মূলধন রূপে ব্যয় হইয়াছিল। কোম্পানির কাগজের সুদের টাকা দিয়াও গবর্ণমেণ্টের উক্ত দুই বিভাগ হইতে যথেষ্ঠ লাভ হইয়া থাকে। ১৯১৯সালে মার্চ্চমাসে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে যুদ্ধে সাহায্যরূপে দশ কোটী পৌণ্ড বা একশত কোটি টাকা দান করেন। তাহাতে ও ভারতের আর্থিক অবস্থা বিন্দুমাত্র দুর্ব্বল হয় নাই। গত ছয় বর্ষের রাজস্বের হিসাব দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে গড়ে বৎসরে আয় নয় কোটি সত্তর লক্ষ পৌণ্ড আর ব্যয় নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পৌণ্ড।

যুদ্ধব্যাপারে ইংলণ্ডকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাহায্য করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ষাট লক্ষ পৌণ্ড নূতন কর স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দিল্লী অধিবেশনে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা, যাঁহারা যুদ্ধের জন্য বাণিজ্যে অতিরিক্ত লাভ করিতেছিলেন তাঁহাদিগের উপর কর বসাইবার জন্য একটি আইন মঞ্জুর করিলেন। এই আইনে কৃষিকার্য্য জাত লভ্য এইকর হইতে অব্যাহতি পাইল ও বিশেষ কারণ দেখাইতে পারিলে অন্যান্য ব্যবসায় সম্বন্ধেও বিশেষ বিবেচনা করা হইবে এইরূপ আভাস দেওয়া হইল। এই আইনে ও এই কর স্থাপনে ব্যবসাদার মহলে ঘোর আন্দোলন হইল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আইনের কঠোরতা অনেকটা লাঘব করাতে, বিপক্ষদের আপত্তি সারবান হইল না। এই কর হইতে গবর্ণমেণ্ট যে টাকার দরকার ঠিক সেই টাকা অর্থাৎ ষাট লক্ষ পাউণ্ড পাইলেন।

এই সময় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র খাদ্য দ্রব্যের ও নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের দর অতিশয় বাড়িয়াছিল। ইহা একটি বিষম দুর্ভাবনা ও আশঙ্কার বিষয় হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বের সময়ের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য শতকরা ৯৩ টাকা ও বস্ত্রাদির পক্ষে দেশজাত বস্ত্রের মূল্য শতকরা ষাট টাকা ও বিদেশ জাত বস্ত্রের মূল্য শত করা ১৯০ টাকা বাড়িয়াছিল। এখনও সেইরূপ বাড়িয়াই আছে কিছু কমে নাই। এই নিদারুণ বৃদ্ধির কারণ দুই প্রকার—কতকগুলি সমগ্র

পৃথিবী ব্যাপিয়া, ও কতকগুলি দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিত। বিগত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সময় ইউরোপের প্রধান প্রধান জাতিগণ উৎপন্ন করণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ কৃষি, শিল্প প্রভৃতির চর্চ্চা ছাড়িয়া কেবল যুদ্ধার্থ মানুষ মারিবার অস্ত্র শস্ত্র সরঞ্জামের সৃষ্টি করণে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। তাহার এই ফল হইল যে পৃথিবীর যেখানে যাহা কিছু খাদ্যোপযোগী শস্য বিক্রয়ার্থ মজুদ ছিল, তাহা ক্রয় করিবার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত জাতিগণ সকলেই লোলুপ হইল। যাহারা পূর্ব্বে চাষ করিত একণে তাহারা সেনাদলে নিযুক্ত হওয়াতে তাহাদিগের দেশ সমূহে কৃষি হইতে উৎপন্ন শস্যাদি যথেষ্ট চাষী অভাবে অনেক কমিয়া গেল ও তখন ইউরোপের বাহিরে অন্য দেশজাত শস্যাদির দ্বারা সেই অভাব মোচন করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তাহার উপর যুদ্ধের খরচ চালাইবার জন্য অনেক বেশী টাকার নোট রূপার টাকার অভাব পূরণের জন্য প্রচার করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই সমস্ত কারণে দ্রব্যাদি দারুণ দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল, ও যতদিন ইউরোপে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ পূর্ব্বের ন্যায় অধিক না হইবে ততদিন মূল্য হ্রাসের আশা দুরাশা মাত্র। ভারতের চাল ডাল গম কিনিবার জন্য যদি বৈদেশিকগণ পরস্পরের সহিত দর বাড়াইয়া প্রতিযোগিতা করিতে থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই উক্ত গমাদির দর বাড়িতে হইবে। আবার বিদেশ হইতে যাহা এদেশে আমদানি হয়, তাহার খরচা অনেক বেশী হওয়াতে উহাদের দরও বেশী হইতে হইবে। বলিতে কি দ্রব্যাদির মূল্য আরও বাড়িত যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উহা নিবারণার্থ বিদেশে রপ্তানি নানা উপায়ে কমাইয়া না দিতেন। যে যে কারণে অন্যান্য দেশে অসাধারণ মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে, ভারতবর্ষে ও সেইসব কারণ বিদ্যমান আছে। তাহার উপর একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য রেলগাড়ীর অভাবে স্থানে স্থানে কতকগুলি দ্রব্য অপ্রাপ্য হওয়াতে তাহাদিগের মূল্য বৃদ্ধির চরম মাত্রায় উঠিয়াছিল ও সেই সঙ্গে ব্যবসায়ীগণের ও আশাতীতরূপে লাভ হইয়াছিল।

তাহার উপর আর একটি ভয়ানক উপসর্গ ছিল। সেটি অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টি যাহার উপর ফসলের অবস্থা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ভাল বৃষ্টি না হইলে এ দেশে মঙ্গল নাই। ১৯১৮-৯ সালে ভাল বৃষ্টি না হওয়াতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শস্যাদি কম উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই কোন না কোন প্রদেশে বৃষ্টির দোষে ফসল নষ্ট হয়, তবে অন্যান্য প্রদেশে সুফল হওয়ায় বড় বেশী ক্ষতি হয় না। কিন্তু ১৯১৮-১৯ সালে সকল প্রদেশই ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। দশ বৎসরের মধ্যে যে কয়বার শস্যকষ্ট হইয়াছিল, এই বৎসর তাহাদিগের মধ্যে একটি অতি মন্দ বৎসর। একেই ইতিপূর্ব্বে দ্রব্যাদির মূল্য দারুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহার·

উপর ফসল না হওয়ায় দ্রব্যাদি আরও দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইল। কোন গবর্ণমেণ্টেরই ক্ষমতা নাই যে এই মূল্যবৃদ্ধি নিবারণ করিতে পারে, তবে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যতটা সাধ্য ইহা দমন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে যে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই, তাহার কারণ ফসল নষ্ট হইলেও দেশের লোকের খাদ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল ও কর্তৃপক্ষগণ ও যথাসম্ভব সে পক্ষে চেষ্টা করিয়া ছিলেন।

সচরাচর ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্য লইয়া প্রতিবর্ষে আটকোটি টন শস্য জন্মে। তাহার কতকাংশ খাদ্যরূপে সেই বর্ষেই খরচ হইয়া যায় ও অবশিষ্ট সঞ্চিত ও বীজের জন্য মজুদ থাকে। কোন বৎসর ফসল কম হইলে লোকে সঞ্চিত শস্য দ্বারা ও যাহা রপ্তানী হইত তাহা দ্বারা অভাব মোচন করে। সঞ্চিত শস্যের গড়ে পরিমাণ কত তাহা নির্দ্ধারণকরা সম্ভব নহে, কিন্তু রপ্তানির পরিমান বেশী নহে। এ দেশে অনেকের ধারণা আছে যে দ্রব্যাদি দুর্মূল্যতার একটি কারণ হইতেছে শস্যাদি বিদেশে রপ্তানি। এ ধারণা ঠিক নহে। ১৯১৮ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের রপ্তানির পরিমাণ দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে গড়ে বৎসরে পনর লক্ষ টনেরও কম শস্যাদি এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। অর্থাৎ প্রতিবৎসর এদেশে যে ফশল জন্মে তাহার পঞ্চাশভাগের এক ভাগ মাত্র বিদেশে বিক্রীতরূপে প্রেরিত হইয়া থাকে। সুতরাং এটা দুর্মূল্যতার কারণ হইতে পারে না। বাস্তবিক বিগত দুঃসময়ে ভারতবর্ষ সঞ্চিত শস্যের পুঁজির উপরই নির্ভর করিয়া অভাব মোচন করিয়াছিল, রপ্তানির পরিমান এত অল্প ছিল যে উহার উপর আদৌ নির্ভর করে নাই। তবে গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা ভারতবর্ষে রপ্তানি বন্ধ করিয়াও বিদেশ হইতে পনর লক্ষ মন শস্য আমদানি করিয়া অনেক উপকার করিয়াছিলেন। ১৯১৮-৯ সালেঅবৃষ্টি অভাবে ফসল হ্রাসের পরিমাণ অনুমান দুই কোটি টন্। দেশে যে পরিমাণ শস্য কম হইয়াছিল, পূর্ব্ব সঞ্চিত শস্য হইতে যতটা সম্ভব পুরণ করিলেও কিছু অভাব থাকিত। সুতরাং বিদেশ হইতে এই অভাব পুরণ করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। বৎসরের মাঝামাঝির সময় এমন আশঙ্কাও হইয়াছিল যে দেশে খাদ্যাভাব হইতে পারে। তবে দুই পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে পর্য্যাপ্ত ফসল জন্মিয়াছিল। ঐ দুই বৎসরে চাল ও গম এত অধিক জন্মিয়াছিল যে পূর্ব্বে এরূপ দেখা যায় নাই। যদিও দুই একটি ফসল ভাল হয় নাই, তত্রাচ মোটের উপর ঐ দুই বৎসর ফসল একান্ত সন্তোষ-জনক হইয়াছিল। এই সময় আবার ভারতবর্ষ হইতে যুদ্ধে ইংলণ্ডের সহিত মিলিত জাতিগণের সৈন্যদিগের খোরাকের জন্য গম চাউল প্রভৃতি পাঠাইতে হইয়াছিল, কিন্তু রপ্তানির পরিমাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বের পাঁচ বৎসরে প্রতি বর্ষে গড়ে এক কোটি টনেরও অধিক শস্য বিদেশে রপ্তানি হইত, কিন্তু যুদ্ধের

পাঁচ বৎসরে রপ্তানির পরিমাণ গড়ে প্রতিবর্ষে বায়ান্ন লক্ষ টনে পরিণত হইয়াছিল, অর্থাৎ অর্দ্ধেক কমিয়াগিয়াছিল। কাহার কাহার ধারণাছিল যে যুদ্ধে সৈন্যগণের রসদের জন্য শস্যের রপ্তানি অনেকবাড়িয়াছিল। প্রকৃত কথা ইহার ঠিক বিপরীত ছিল। তত্রাচ দুইকোটি টনের অভাব বড় সাধারণ অভাব নহে। ১৯১৮-১৯ সালে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশ হইতে অনেক গম্ কিনিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইতে সম্মত হইয়া ছিলেন। কিন্তু দেশে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা দেখিয়া ঐবৎসর ডিসেম্বর মাসে ভারত সচিবকে জানাইলেন যে তাঁহারা এ বৎসর গম সরবরাহ করিতে অক্ষম। এ দেশ হইতে ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক চাউল রপ্তানি ইতি মধ্যেই নিষিদ্ধ হইয়াছিল ও বিলাতের গম সরবরাহ কমিটির জন্য অনেক বর্ম্মাদেশ হইতে আনীত চাউল এখানে মজুদ ছিল। কিন্তু উক্ত কমিটি বর্ম্মাচাউল না লওয়াতে এই চালও এদেশের লোকদিগের খাদ্যার্থ ব্যবহারে লাগিল। এদেশ হইতে শস্যাদি রপ্তানি গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন অপর কেহ করিতে না পারাতে মোটে বাষট্টি হাজার টন রপ্তানি হইয়াছিল, ও চাউলের রপ্তানি এক তৃতীয়াংশ কমিয়া গেল ও এই চাউলের মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগ বর্ম্মাদেশের চাউল ছিল। ভারতবর্ষ হইতে একেবারে চাউল রপ্তানি বন্ধ করা সম্ভব ছিলনা, কেননা, লঙ্কা, ষ্ট্রেটস্ সেটলমেণ্ট ও মরিসসে অনেক ভারতবর্ষীয় কুলি ও ব্যবসাদার বাস করিয়া থাকে ও তাহাদিগের খাদ্যার্থ ভারতবর্ষ হইতে চাল পাঠান বন্ধ হইলে তাহারা অন্নাভাবে মরিয়া যাইত। পৃথিবীতে অনেক অন্নভোজী জাতি আছে ও তাহারা সকলেই ভারতবর্ষ হইতে চাউল কিনিত। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ইংলণ্ডের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ কেবল তাহাদিগকেই ভারতবর্ষের উদ্বর্ত্ত চাল বিক্রয় করা যাইত। ভারতবর্ষের প্রয়োজনের জন্য অষ্ট্রেলিয়া হইতেও অনেক গম এদেশে আনীত হইয়াছিল। গম সরবরাহ কমিটির সাহায্যে উক্ত গম এদেশে অনেক সস্তায় পাওয়া গিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া হইতে দুইলক্ষ টন গম এদেশে আসাতে গমের দর, যাহা ক্রমশঃ অত্যন্ত বাড়িতেছিল, আর বাড়িতে পারিল না। কিন্তু তত্রাচ এই খাদ্যসরবরাহ ব্যাপার লইয়া গবর্ণমেণ্টকে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। কারণ এই বর্ষে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা, যুক্ত প্রদেশ, রাজপুতানা, মধ্য ভারত, মধ্য প্রদেশ, বোম্বাই, হায়দরাবাদ ও মান্দ্রাজে খাদ্যাভাব হইয়াছিল। কাজেই শস্যাদির দর অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। ১৯১৯ সালের দরের সহিত যদি ১৯১৪ সালের দরের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে চাউলের দর আসামে শতকরা ২৬ টাকা হইতে, মধ্য প্রদেশে শতকরা ৭৩ টাকা বাড়িয়াছিল। গমের দর আসামে শতকরা ৩৮ টাকা বাড়িয়াছিল ও মধ্য প্রদেশে

দ্বিগুণ হইয়াছিল। গরীবদিগের খাদ্য শস্যাদির মূল্য যুক্ত প্রদেশে দ্বিগুণ ও বোম্বাই প্রদেশে শতকরা একশত বত্রিশ টাকা বাড়িয়াছিল। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিলেন যে যে প্রদেশে যত অভাব ঠিক সেই পরিমাণেই উদ্বর্ত্ত চাল সরবরাহ করা হইবে, তাহার অধিক নহে। রেলগাড়ীর অভাবে শস্য এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে লইয়া যাওয়ার অসুবিধার জন্য মাল চালান দিবার সম্বন্ধে ও গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিতে হইয়াছিল। বর্ম্মা হইতে এদেশে চাল আমদানি সম্বন্ধে ও কতকগুলি নিয়ম করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে ব্রহ্মদেশজাত চাউল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত দরে ক্রীত হইয়াছিল, দর তাহার অধিক হয় নাই। জানুয়ারি হইতে অগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত বর্ম্মা হইতে বাঙ্গালায় দশলক্ষের অধিক টন চাল ও সাইত্রিশ হাজার টন্ ধান আমদানি হইয়াছিল।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যতই চেষ্টা করুননা কেন, খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় দেশে দরিদ্রগণের যারপর নাই দুরবস্থা হইয়াছিল। শুদ্ধ দরিদ্র ও নিয়মিত বেতনভোগিগণ কেন, কষ্ট সকলকারই হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের ন্যায় যাঁহাদিগকে বেতন দিতে হয়, তাঁহারাও বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন। সত্যবটে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় এদেশে দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি তত অধিক হয় নাই। ইউরোপে দেনমার্ক দেশে মূল্যবৃদ্ধি শতকরা ছিয়াশি টাকা হইয়াছিল, কিন্তু সুইডেন দেশে শতকরা দুইশত চৌত্রিশ টাকা হইয়াছিল। ইংলণ্ডে বিবিধ কড়াকড়ি নিয়ম সত্ত্বে ও শতকরা ১০৭ টাকা বাড়িয়াছিল। কিন্তু ইহাতে আর ভারতবর্ষের দুঃখী প্রজার কি সান্ত্বনা হইবে। অন্যদেশে আরও কষ্ট বলিয়া ত তাহারা নিজের দুঃখ ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু এই দুর্ব্বৎসরে একটি বড় আনন্দের বিষয় হইয়াছিল। কৃষিজীবিগণ কোন রকম এই বিপদ হইতে রক্ষা লাভ করিয়াছিল। যখন নানা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত বলিয়া স্বীকৃত হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হইয়া ছিল। ভারতীয় সাধারণের "দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারস্থ" গচ্ছিত অর্থ হইতে ৪৭০০০ পাউণ্ড (পাঁচ লক্ষ টাকা) মূল্যে চাল খরিদ করিয়া বিতরণ করা গেল। কিন্তু দেশে যত কষ্ট হউক না কেন তাহার প্রতিকার করা এদেশের পক্ষে অসাধ্য ছিল না। টরনটো নগরে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ পীড়িত দিগের সাহায্যার্থে একটি চাঁদার খাতা খোলা হইল। কিন্তু যাঁহারা পরদুঃখে কাতর হইয়া এই সাধু অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন, টাকা তুলিবার অভিপ্রায়ে দুর্ভিক্ষসংক্রান্ত বিবরণ অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করিলেন যাহা বাস্তবিক দেশের অবস্থা ছিল না। অগত্যা ভারত সচিব টরণ্টোর দান গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন ইহা প্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগের মধ্যে

যাহাদিগকে অন্নদান করিতে হইয়াছিল তাহাদিগের সংখ্যা কখনই বেশী হয় নাই। ১৯১৮-৯ সালে যে ফসল ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা ১৯০০ সালের অপেক্ষা কম নহে, কিন্তু বিগত দুর্ভিক্ষে যাহাদিগকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগের সংখ্যা কোন দিনে ছয়লক্ষও হয় নাই। ১৯০০ সালে কিন্তু কখন কখন একই দিনে যাটলক্ষ লোককে সাহায্য দিয়া জীবিত রাখিতে হইয়াছিল। ১৯১৯ সালের সুবৃষ্টি দ্বারা সুফল হওয়াতে অন্নকষ্ট দূর হইয়াছিল ও ঐ বর্ষের শেষে সাহায্য দান এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গালা দেশের প্রচণ্ড ঝড়ে অনেক লোক প্রাণে ও ধনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের প্রাণ রক্ষার্থ পুনরায় সাহায্য দানের অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শস্যাদির অবস্থা অতীব সন্তোষজনক ছিল ও এখন অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য দুর্ভিক্ষের ভয় ছিল না। রেলগাড়ী সরবরাহের বন্দবস্ত ও পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে ও এখন খাদ্যের আর অভাব নাই, তবে দুর্ম্মূল্যতার কোন প্রতিকার করা সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু সঞ্চিত মালের পরিমাণ অল্প ও যতদিন না ইহা অনেক বৃদ্ধি হয়, ততদিন মূল্য হ্রাসের কোনই সম্ভাবনা নাই—এমন কি কখন যে যুদ্ধের পূর্ব্বকালীন মূল্য ফিরিয়া আসিবে, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। অতঃপর শস্য রপ্তানির উপর কড়াকড়ি নিয়ম আরও কিছুদিন বাহাল রাখা স্থির হইয়াছে। এদেশের অনেকেরই ও বিশেষতঃ সংবাদপত্র মহলে ধারণা যে দেশ হইতে বিদেশে মাল পাঠান বন্ধ করিলেই, জিনিষের দর একেবারে কমিয়া যাইবে। কিন্তু রপ্তানি বন্ধ করিলে বিপরীত ফল ফলিতে পারে, ও বিশেষতঃ রপ্তানির সচরাচর বার্ষিক পরিমাণ এত অল্প যে তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। তবে বিশেষ আবশ্যক না হইলে রপ্তানি বন্ধ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। ইহার বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এই যে এদেশে যেমন চাল দাল গম প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের চাষ হয়, তেমনি আহারের জন্য অনুপযোগী কিন্তু অন্য হিসাবে মূল্যবান অন্যান্য ফসলেরও চাষ হইয়া থাকে। সুতরাং যদি পূর্ব্বোক্ত ফসলের রপ্তানি বন্ধ হয়, তাহা হইলে চাষিরা শেষোক্ত ফসলই উৎপন্ন করিতে যত্নবান হইবে ও খাদ্যের জন্য শস্য চাষের জমি অনেকটা কমিয়া যাইবে। তখন রপ্তানির জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। কোন বৎসর ফসল নষ্ট হইলে এই রপ্তানির দরুন যাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা দ্বারা কতকাংশে অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। সুতরাং রপ্তানি বন্ধ করার বিপক্ষেও অনেক বলিবার আছে।

দুঃখের বিষয় কোন খাদ্যাদি দ্রব্যের সরবরাহ দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। বস্ত্রাদির দুর্ম্মূল্যতার জন্য সাধারণ লোকে পূর্ব্ব হইতেই অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া

আসিতেছিল। এই দুর্ম্মূল্যতার কারণ প্রথমতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র কার্পাসের অসাধারণ মূল্যবৃদ্ধি ও দ্বিতীয়তঃ শ্রমজীবিগণের মজুরি অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি হওয়ায় বস্ত্র প্রস্তুতের খরচা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল। সুতরাং কাপড়ের দর ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছিল ও নামিবার সম্ভাবনা কমই ছিল। গবর্ণমেণ্ট দরিদ্রদিগের জন্য অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে স্বদেশজাত মোটা বস্ত্র তৈয়ার করাইয়া নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ কাপড় গরীবদিগের জন্যই প্রস্তুত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট এই বন্দবস্তের কথা যখন প্রকাশ করেন, তখন কাপড়ের দর কমিল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ব্বের ন্যায় আবার বাড়িয়া উঠিল। তখন গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত মোটা কাপড় দুই রকম তৈয়ার করিবার বন্দবস্ত করিলেন। এইরূপে দুইকোটি বিশলক্ষ গজ কাপড় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিক্রয়ার্থ বিতরিত হইয়াছিল। এই মোটা কাপড় বিক্রয় করণ কালে ইহা শিক্ষা হইল যে দরিদ্র ব্যক্তিগণ—যাহাদিগের জন্য মোটা কাপড় তৈয়ার করা হইয়াছিল—তাহারা উহা পাইলেই কিনিতে প্রস্তুত আছে কিন্তু তাহারা যে গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র কোন সরকারি আপিসে গিয়া কাপড় কিনিতে যাইবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে কাপড় লইয়া যাইতে হইলে যে বন্দবস্ত ও লোকজন দরকার, গবর্ণমেণ্টের তাহা অভাব। এদিকে প্রজাদিগের ও এমন বুদ্ধি ছিল না যে বুঝিতে পারে যে কিছুদূর যাইলেই কাপড় কিনিতে কম দর লাগিবে ও তাহাদিগেরই টাকা বাঁচিয়া যাইবে। আবার তাহারা অনেকটা অভ্যাসের দাস। চিরকাল যে কাপড়ে অভ্যস্ত, তাহা বেশী দাম দিয়া কিনিবে কিন্তু নূতন জিনিষ কম দরে পাইলেও কিনিতে রাজী হইবে না। অনেক প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিল যে প্রজারা যে কাপড় আকারে বড়, তা সুতা বেশী নাই থাকুক, তাহাই পছন্দ করে। যদিও ইহা প্রথমে দেখিতে ভাল, কিন্তু এক ধোপের পরই বিশ্রী হইয়া যায়। এই সব কারণে নূতন মোটা কাপড়ের অনেকে পক্ষপাতী ছিল না। বস্ত্রাভাবে সাধারণ লোকের কষ্টের বিবরণ যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশ হইত তাহা হইতে আশা করা গিয়াছিল যে সস্তায় মজবুৎ কাপড় পাইলে ইহারা তাহাই কিনিবে। কিন্তু সে আশা সফল হইল না। মোটা কাপড়ের মূল্য ও সচরাচর প্রচলিত কাপড়ের মূল্য এই উভয়ের মধ্যে খুব বেশী তফাৎ না থাকিলে ইহারা বেশী দাম দিয়াও সচরাচর প্রচলিত কাপড় কিনিতে প্রস্তুত ছিল। যাহা হউক এই মোটা কাপড় প্রচলন করিয়া গবর্ণমেণ্ট দরিদ্রগণের কতকটা কষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন ও কাপড়ের দর বেশী বাড়িতে দেন্ নাই। কিন্তু অন্ন বস্ত্রের দারুণ দুর্ম্মূল্যতার জন্য জন সাধারণের কষ্টের সীমা ছিল না।

এই বৎসর ভারতবর্ষীয় শ্রমজীবিগণের মধ্যে নিজ নিজ দল গঠনের চেষ্টা দেখা গেল। মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৯১৮ সালেই শ্রমজীবিগণের সভা স্থাপিত হইয়াছিল। এ সভার অধিবেশন নিয়মমত হইয়া আসিতেছিল, ও শিক্ষিতগণ ইহার নেতৃত্ব ভার লইয়াছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে, ডাকপিয়াদাগণ, টেলিগ্রাফ পিয়াদাগণ, রেলওয়ের শ্রমজীবিগণ, কলের মজুরগণ ও অন্যান্য শ্রমজীবিগণ, তাহাদিগের স্বার্থ রক্ষার্থ নিজ নিজ সভা গঠন করে। আলোচ্যবর্ষে শ্রমজীবিগণের মধ্যে অশান্তি ও অসন্তোষের চিহ্ন দেখা দিয়াছিল। তাহারা মধ্যে মধ্যে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মঘট করিতে লাগিল। রেলওয়ের শ্রমজীবিগণ বেতন বৃদ্ধি লাভ করিবার জন্য একাধিকবার কার্য্যে ইস্তফা দিবার ভয় দেখাইতে লাগিল। মে মাসে কলিকাতায় ডাক পেয়াদাগণ কর্ম্ম পরিত্যাগ করে। কিন্তু তাহারা সকলেই এক সপ্তাহের মধ্যে কার্য্যে ফিরিয়া আসিল। সাধারণের নিকট তাহারা বড় একটা সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই, কেন না অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে ইহারা সময় বুঝিয়া বেতন বৃদ্ধির জন্য অন্যায় আবদার করিতেছে। বৎসর শেষ হইবার সময় নানা স্থানে শ্রমজীবিগণের মধ্যে চাকৃরি ছাড়িবার ভয় কিছু গুরুতর আকার ধারণ করিল। নবেম্বর মাসে কানপুরের কল সমূহে যে সব শ্রমজীবিগণ চাকৃরি করিত তাহারা তাহাদিগের সামান্য বেতনে এই দুর্ম্মূল্যের দিনে কুলাইতে পারিতেছিল না বলিয়া কর্ম্মত্যাগ করিল। কানপুরের কল সমূহের স্বত্বাধিকারিগণ শ্রমজীবিগণের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন ও তাহার পর শ্রমজীবিগণের আর কিছুই বলিবার থাকিল না। ফল কথা আলোচ্য বর্ষে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বেতন বৃদ্ধির জন্য শ্রমজীবি মহলে বিষম আন্দোলন চলিতে লাগিল। যাঁহারা এদেশে শ্রমজীবিগণকে তাঁহাদিগের নিজ অধীনে চাকরি দেন, তাঁহারা ও গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই নূতন অবস্থা মানিয়া চলিতে বাধ্য হইলেন। অনেক সময় বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ এত অল্প হইয়াছিল, যে তাহাতে শ্রমজীবিগণের অভাব কিছুই মোচন হয় নাই। বিশেষতঃ এখন তাহারা কেবল মাত্র বেতন বৃদ্ধিতেই সন্তুষ্ট নহে। তাহারা এখন চায় যে তাহাদিগের খাটুনির অবস্থা কষ্টকর না হয়, তাহাদিগের অবসরের সময় বৃদ্ধি হয়, ও তাহাদিগকে নিজ উন্নতি সাধনে সুবিধা দেওয়া হয়। তাহাদিগের এই প্রার্থনা ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগণ একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। সুতরাং কিপ্রকারে বহুসংখ্যক শ্রমজীবিগণের বেতন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগী হইয়াছিলেন। কেননা তাঁহারা জানিতেন যে শ্রমজীবিগণের বেতনবৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ে তাহাদিগের দুঃখ হ্রাস করিতে না পারিলে এদেশে কল কারখানার কারবারের উন্নতি করা সম্ভবপর হইবে

না। ভারতবর্ষের যে যে স্থানে কলকারখানায় কারবারের উন্নতি হইয়াছে সেই সব স্থানেই শ্রমজীবিগণের আন্দোলন দেখা গেল। বোম্বাই প্রদেশে আলোচ্যবর্ষে এই আন্দোলনের গতি কিঞ্চিৎ কৌতূহলজনক হইয়াছিল। শ্রমজীবিগণের থাকিবার বন্দবস্ত এত খারাব ছিল, যে গবর্ণমেণ্ট তাহার উন্নতি সাধন একান্ত আবশ্যক তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যদিও তাহাদিগের মজুরির হার নিতান্ত মন্দ ছিলনা, কিন্তু তত্রাচ তাহাদিগের দুঃখের সীমা ছিল না। ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইএর কলগুলির শ্রমজীবিগণ একটি সভার অধিবেশন করে। এই অধিবেশনে ৭৫টি কল হইতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া উক্ত সভায় যোগদান করে। এই সভা কর্ত্তৃক শ্রমজীবিগণের কি অভাব তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত হয়। এই তালিকায় নিম্নলিখিত প্রার্থনা করা হয়ঃ—(১) খাটুনির সময় কমাইয়া দেওয়া; (২) ছুটির সময় বাড়াইয়া দেওয়া; (৩) তাহাদিগের ছেলেরা যাহাতে শিক্ষাপায় তাহার বন্দবস্ত করা ও তাহাদিগের মঙ্গলার্থ দুঃসময়ে সাহায্য করিবার জন্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ড স্থাপিত করা। তাহারা গবর্ণরের নিকটও আবেদন করিল যে যেন তিনি দয়া করিয়া শ্রমজীবিগণের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন ও উক্ত কমিটি যেন তাহাদিগের মজুরির নিম্নতম হার স্থির করিয়া দেন। আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরে পৃথিবীর নানাজাতীয় শ্রমজীবিগণের এক মহাসভা অক্টোবর মাসের শেষে আহূত হয়। এখন ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশদিগের শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই মহাসভায় ভারতের ও নিমন্ত্রণ আসিল। অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদিগের সহিত ভারতের ও প্রতিনিধিগণ সভার কার্য্যে যোগ দিলেন। সভায় এই সিদ্ধান্ত হইল যে ভারতের সহিত ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশের অবস্থাগত পার্থক্য এত অধিক, যে সেই সব দেশের সম্বন্ধে মজুরির হার, খাটুনির সময় প্রভৃতি বিষয়ে যাহা মীমাংসিত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে খাটেনা। কিন্তু বাস্তবিক উহা যে একেবারেই খাটেনা, একথা ঠিক নহে। সভায় কারখানায় পরিশ্রমের সময় সাপ্তাহিক অনূন ষাট ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ও রাত্রিকালে স্ত্রীলোক দিগকে কাজ করিতে দেওয়া নিষেধ হইল ও বালক দিগের নিম্নতম বয়স নয় হইতে বার করা হইল। আর যে সব কারখানায় তাড়িত তেজ ব্যবহৃত হয় ও অনূ্যন দশ জন শ্রমজীবি প্রতিদিন মজুরি পাইয়া থাকে, তাহাদিগকে "ফ্যাক্টরির" মধ্যে গণ্য করা হইল অর্থাৎ ফ্যাক্টরি সংক্রান্ত আইন তাহাদিগের সম্বন্ধে খাটিল। বস্তুতঃ ভারতীয় শ্রমজীবি গণের নানারকমে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যে কত উচিত ও আবশ্যক তাহা ইণ্ডষ্ট্রিয়াল কমিশনের রিপোর্টে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ও গবর্ণমেণ্টও এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ফ্যাক্টরি

আইনে কি কি পরিবর্ত্তন করিলে শ্রমজীবি গণের উন্নতি হইতে পারে ও তাহাদিগের বাসস্থান কি করিলে স্বাস্থ্যপ্রদ হইতে পারে, এই সব বিষয়ে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য ইতি পূর্ব্ব হইতেই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। এইত গেল যাহারা কল কারখানায় খাটিয়া খায় তাহাদিগের কথা। যাহারা ক্ষেতে মজুরের কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সহরে থাকে, তাহারা অবস্থা উন্নতির জন্য দল বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের জন্য স্থানান্তরে শস্যপ্রেরণ, আফগানযুদ্ধ, সীমান্ত যুদ্ধ ও ইউরোপীয় যুদ্ধের জন্য সমরোপযোগী নানারকম জিনিষ ও সরঞ্জাম রণাঙ্গনে রপ্তানি, প্রভৃতি কারণে ভারতবর্ষে গাড়ীর বড়ই টান হইয়াছিল। অবশ্য দেশের রেলওয়ে গুলি দ্বারাই প্রধানতঃ এই মাল চালান করা হইয়াছিল। যুদ্ধারম্ভ হইতে গত পাঁচ বৎসর রেলওয়ে গুলি যুদ্ধার্থ মাল পাঠাইবার জন্য ক্ষমতাতিরিক্ত কাজ করিতেছিল। এমন দিন গিয়াছে যখন রেলওয়ের মালগাড়ী গুলির পাঁচ ভাগের চার ভাগ কেবল যুদ্ধ সম্বন্ধীয় মালে পূর্ণ ছিল। একদিকে যেমন মাল পত্রের ও মানুষের যাতায়াত বৃদ্ধি হইয়াছিল, অপরদিকে রেলওয়ে গুলির এই অসাধারণ দুর্ব্বহ ভার বহন করিবার ক্ষমতাও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছিল। এঞ্জিন, কলগাড়ী ও রেলওয়ে সংক্রান্ত যাহা কিছু দরকারি তাহা সমস্তই মেসোপটেমিয়ায় ও অন্যান্য যুদ্ধস্থানে পাঠান হইয়াছিল। এমন কি জীর্ণ এঞ্জিন কি ভাঙ্গা গাড়ীগুলি সারাইবার উপযোগী জিনিষ ও বিলাত হইতে সহজে পাওয়া যাইতে ছিলনা। শুধু এঞ্জিন ও গাড়ীর বিষয়ে নহে অনেক পাকা কর্ম্মচারি যুদ্ধ ক্ষেত্রে কার্য্যে যাওয়াতে এদেশে আরও এক অসুবিধা ঘটিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ডিরেক্টর অফ সপ্লাইজ নামে কতকগুলি নূতন পদ সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কার্য্যছিল এইযে যে মাল যুদ্ধ সম্বন্ধীয় নহে তাহা, তাঁহারা অনুমতি দিলে সাধারণের মালের পূর্ব্বে গাড়ী পাইবে। ১৯১৮ সালে দিল্লী নগরে একটি বৈঠক বসে। কিসে মাল পাঠাইতে সাধারণের অসুবিধা লাঘব হইতে পারে ইহা বিবেচনা করিবার জন্যই উহা আহূত হইয়াছিল। যুদ্ধশেষ হইয়া যাইলেও মাল পাঠান সম্বন্ধে সাধারণের সুবিধা সংকোচ-কর নিয়মগুলি কিছুদিন বাহাল রাখা অনিবার্য্য হইয়া ছিল। বস্তুতঃ রেলওয়ে গুলি দ্বারা এই মহা সঙ্কটের সময় যে অপরিমেয় উপকার সাধিত হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই মাল চালান সম্বন্ধে কড়াকড়ি নিয়ম করিয়া ছিলেন বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আবশ্যক মত খাদ্যের সরবরাহ করিতে পারিয়াছিলেন, নতুবা গাড়ী অভাবে মাল পৌছিতে না পারাতে অনেকে না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইত। অবশ্য এই বন্দবস্তে ব্যাবসাদারগণের অনেক অসুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে গবর্ণমেণ্ট এই উপায়ে রেলগুলি দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য ব্যবস্থা করিয়া

ছিলেন ও উক্ত উপায় অবলম্বন না করিলে তাহা সম্ভব হইত না। এই বৎসর দুর্ভিক্ষের সময় রেলওয়ে গুলিই দেশ রক্ষার প্রধান সহায় হইয়া ছিল।

বস্তুতঃ কেবল যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়েই যে ভারতবর্ষে রেলওয়ে গুলির উপকারিতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে এমত নহে। শান্তির সময় ও ইহাদিগের দ্বারা দেশের বিবিধ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। ১৯১৮-৯ সালে ভারতবর্ষে সরকারি ও বেসরকারি রেল-ওয়ে গুলির রোজকার হইয়াছিল পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ পাউণ্ড। উক্ত বর্ষে কেবল সরকারি রেলওয়ে গুলি হইতে সকল প্রকার খরচ ও মূলধনের জন্য সুদ বাদ দিয়া ও এককোটি নব্বই লক্ষ পাউণ্ড লাভ হইয়া ছিল। পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এ বৎসর আয় বৃদ্ধির কারণ রেলওয়ে গুলিকে অনেক অধিক মাল বহন করিতে হইয়াছিল। ফলতঃ ১৯১৪-৫ সালের পর হইতে সকল রেলওয়েগুলিরই আয়বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু রেলওয়েগুলিকে বিস্তর অসুবিধা সহ্য করিতেও হইয়াছিল। উহাদিগের প্রধান প্রধান উপকরণ, যথা এন্‌জিন্, গাড়ী, রেলপথ প্রভৃতি সকল বিষয়েই যাহা সঞ্চয় ছিল তাহা একপ্রকার নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। এমন কি যদি আর এক বৎসর যুদ্ধ চলিত, তাহা হইলে রেলওয়েগুলির কার্য্যকারিতা অনেক হ্রাস হইয়া পড়িত। যুদ্ধারম্ভ হইতে রেলওয়েগুলি কোন বিষয়েই বিলাত হইতে সাহায্য গ্রহণ করে নাই, কেননা তখন বিলাতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত হইতেছিল, ও তজ্জন্য কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির আশা ছিলনা। কিন্তু ১৯১৮ সালে অবস্থা এরূপ সঙ্কট হইয়াছিল যে তখন একশত এন্‌জিন ও পাঁচ হাজার মালগাড়ী না পাওয়া যাইলে কাজ চলা অনেকস্থানে বন্ধ হইয়া পড়িত। সৌভাগ্যক্রমে হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে, বিলাত হইতে রেল চলনোপযোগী যে যে জিনিষের অভাব হইয়াছিল তাহা পূরণ করা সম্ভব হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে রেলওয়ে সংক্রান্ত মেরামতি কার্য্যে অনেক টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের কয় বৎসর রেলওয়ে সংক্রান্ত খরচ অনেক কমিয়াছিল কেননা এন্‌জিন গাড়ী প্রভৃতি ক্রয় করা হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধ থামিয়া যাইলে উক্ত বাবদে অনেক টাকা খরচ করিতে হইয়াছিল। ১৯১৯ সালে রেলওয়েগুলির উন্নতি কর-ণার্থে এককোটি সত্তর লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ ক্রয় করা হইয়াছিল। কোন এক বর্ষে এই বাবদে এত অধিক টাকা ইতিপূর্ব্বে কখন মঞ্জুর করা হয় নাই। কিন্তু ইহা না করিলে রেলগুলির কার্য্যকারিতা অনেক লাঘব হইয়া পড়িত।

ভবিষ্যতে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে গুলির পরিচালন সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা লইয়া সম্প্রতি আন্দোলন চলিতেছে। এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইহা প্রকাশ করা হয় যে ভারতসচিব এই বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য যতশীঘ্র সম্ভব একটি

কমিটি নিয়োগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এদেশস্থ রেলওয়ে গুলির অধিকাংশেরই মালিক গবর্ণমেণ্ট ও যে সমস্ত কোম্পানিকে উহা চালাইবার জন্ত ভার অর্পণ করা হইয়াছে তাহাদিগের উপর অনেক বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হুকুম চালাইতে পারেন। এই বৎসরের শেষভাগে কনট্রোলার অফ ট্যাফিক এর পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কতক গুলি প্রধান প্রধান রেলওয়ে কর্তৃপক্ষগণের মতে এই পদ সৃষ্টি করিয়া গবর্ণমেণ্ট অনেক বিষয়ে সুবন্দবস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এমন কি অনেকেরি মতে যদি মালগাড়ী সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ বন্দবস্ত করিতে পারেন যদ্দারা মালগাড়ী গুলি সকল রেলওয়েই আবশ্যকমত ব্যবহারে আইসে, তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে ও তদন্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

পূর্ব্ব বৎসরের ন্তায় এবৎসর ও কয়লা সরবরাহ করা বিষম ভাবনার বিষয় হইয়াছিল। কয়লা পাইবার সুবিধার উপর রেলওয়ের উপকারিতা অনেকটা নির্ভর করে। ভারত-বর্ষের ন্তায় সুলভ কয়লা আর কোন দেশে পাওয়া যায়না। কারণ এখানে কয়লার খনি গুলি গভীর নহে, ও মজুরি ও সুলভ। কিন্তু নূতন কলের ব্যবহার অতি অল্প পরিমাণে হওয়ার জন্য এদেশীয় খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করা, কুলিগণের মজুরির হারের উপর অনেকটা নির্ভর করে। ১৯১৮ সালে, ছোট ছোট খনি, যাহা হইতে কেবল নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়, তাহা হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে কুলীগণ যাহাতে খারাব কয়লা উত্তোলন না করিয়া ভাল কয়লার উত্তোলনেই নিযুক্ত থাকিতে পারে। এই উদ্দেশ্য অনকটা সফল হইয়া ছিল। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বার মাসে উত্তোলিত উত্তম শ্রেণীর কয়লার পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। অনন্তর নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার পরিমাণ হ্রাস করণার্থ যে সমস্ত হুকুম প্রচারিত হইয়া ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে রদ হইল ও ও ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে কণ্ট্রোলারের পদ উঠিয়া গেল। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আর একপদ সৃষ্ট হইয়া কিছুদিনের জন্ত বাহাল ছিল। এই কর্ম্মচারি কাহার প্রয়োজন মত সার্টিফিকেট দিলে তবে তাহাকে মাল গাড়ী দেওয়া হইত। কিন্তু অধিকাংশ প্রার্থীই কেবল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার জন্ত মালগাড়ী পাইবার দরখাস্ত করিল। সুতরাং নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার জন্ত মালগাড়ী পাইতে কতকটা অসুবিধা হইল। সৌভাগ্যক্রমে কিছুদিন পরে এই অসুবিধা দূর করিবার জন্তও বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। ১৯১৯ সালে শেষদিনে কয়লার জন্ত মালগাড়ী পাওয়া সম্বন্ধে সকল রকম কড়াকড়ি নিয়ম উঠিয়া গেল। আবার বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার মাল বহন কার্য্যে রেলওয়ে গুলির অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু এই শক্তির অধিকতর ব্যবহার করিতে হইলে দেশে পথগুলির সংস্কার করা

আবশ্যক। অধুনা বর্ষাকালে অনেক স্থলে, যথায় শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তথায় পৌঁছিবার অসুবিধা থাকার জন্য অনেক টাকা লোকসান হইয়া থাকে। অর্থাৎ সেই স্থান হইতে মাল চালান করিবার সুবিধা থাকিলে উক্ত ক্ষতি সহ্য করিতে হইত না। কিন্তু বড় বড় রাস্তাগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করা না হইলে পূর্ব্বোক্ত অসুবিধা দূর করা অসাধ্য। কিন্তু প্রতিবৎসরই এই বিস্তার কিছু কিছু সাধিত হইতেছে। ১৯১৬ সালে খোওয়ার রাস্তার সমষ্টি ৫৪০০০ মাইল ছিল। পরবর্ষে উহার সমষ্টি এক হাজার মাইল বাড়িয়া ছিল ও কাঁচা রাস্তার সমষ্টি ১৪২০০০ মাইল হইতে ১৪৪০০০ মাইল হইয়া ছিল অর্থাৎ দুই হাজার মাইল বাড়িয়াছিল। ১৯১৭ সালে কাঁচা ও পাকা উভয় রাস্তার সমষ্টি দুই লক্ষ মাইল ছিল, কিন্তু ইহাও ভারতবর্ষের যাহা দরকার, তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন হইতেই বিশেষ মনোযোগী আছেন, কিন্তু জন সাধারণ এ বিষয়ে যত্নপর হইলেই শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এবিষয়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠান উল্লেখ যোগ্য। তাঁহারা কিরূপে স্থল পথের ও জল পথের বিস্তার, সংস্কার ও সুবিধা হইতে পারে তাহা তদন্ত করিবার জন্য সম্প্রতি একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, ও এই কমিটিতে সরকারি, বেসরকারি, উভয় শ্রেণীর ব্যক্তি সভ্য আছেন। যদি অন্যান্য প্রদেশে এইরূপ কমিটি নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে অনেক উন্নতি হইতে পারে।

আলোচ্য বর্ষে ব্যোমযানের উপর অনেকেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই একটি এয়ারবোর্ড অর্থাৎ ব্যোমপথে গমনাগমনের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহারা এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবার জন্য ও ১৯১১ সালের আইন অনুযায়ী তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ণের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। বোম্বাই হইতে কলিকাতা, কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন, দিল্লী হইতে কলিকাতা, করাচি হইতে বোম্বাই ও দিল্লী হইতে করাচি গমনের আকাশ পথের পরীক্ষা চলিতেছে ও স্থানে স্থানে ব্যোমযান রক্ষণোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ ও নামিবার বন্দবস্ত করিবার কল্পনা ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে। কি উপায়ে ব্যোমপথে গমনাগমনের সুবন্দবস্ত করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে ভারতবর্ষীয় বণিক-সভাগণকে তাহাদিগের মত প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস যে অনেকগুলি ছোট ছোট ব্যাপারের অনুষ্ঠান অপেক্ষা অল্প সংখ্যক বৃহৎ ব্যাপারের বন্দবস্ত করাই অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ। তাঁহাদিগের মতে একটি বৃহৎ কোম্পানীকে কিছুদিনের জন্য ব্যোমপথে গমনাগমনের জন্য একচেটিয়া কারবার করিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। তাঁহারা ভারতসচিবকে একজন ব্যোমপথে গমন বিষয়ে বিশেষ

অভিজ্ঞকে, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য এদেশে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে, এরূপ আশা করা যাইতেছে। ব্যোমযান দ্বারা মেলের চিঠি পত্র ও আরোহিগণ পাঠাইবার বন্দবস্ত করিলে খরচা কত পড়ে তাহা হিসাব করিবার জন্য করাচি ও বোম্বাইএর সহিত পূর্ব্বোক্ত মেলের বন্দবস্ত সরকারি বেতনভোগী ব্যোমগামী দলের সাহায্যে কিছুদিন করা হইয়াছিল। কিন্তু ব্যোমযান ব্যবহারে সাধারণের উৎসাহের অভাবে কয়েক সপ্তাহ পরে উহা উঠিয়া গেল। তবে খরচা নির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্য অবশ্য সফল হইয়াছিল। ১৯১৪ সাল হইতে ১৯২০ সালের প্রারম্ভে ভারতবর্ষীয় ব্যোমযান সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হইবার মধ্যে বেসরকারি ব্যোমযান এদেশে অতি অল্পই ছিল। এক্ষণে কিন্তু ব্যোমযানের জন্য ও তাহার চালকের জন্য সাধারণকে লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে। বিলাতের গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে একশত ব্যোমযান উপহার দিয়াছেন। এগুলি শীঘ্রই এদেশে পঁহুছিবে। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, চিঠিপত্র প্রেরণ ও গমনাগমনের সুবিধার জন্য অধুনা সকলেরই আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। ডাক বিভাগের কার্য্য কিরূপ বাড়িয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যুদ্ধ জনিত নানারূপ অসুবিধা ও বিঘ্ন সত্ত্বও ১৯১৮-১৯ বর্ষে একশত উনিশ কোটি ডাকযোগে প্রেরিত দ্রব্যাদি চালান করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্যবর্ষে পনর লক্ষ অধিক জিনিষ ডাক বিভাগের দ্বারা পাঠান হইয়াছিল। তার যোগে প্রেরিত সংবাদের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল, যে দেশী টেলিগ্রাফের মূল্য বাড়াইতে হইয়াছিল। ডাক বিভাগে মোটামুটি একলক্ষ কর্ম্মচারি আছে, ডাকঘরের সংখ্যা বিশহাজার। মেলের পথের সমষ্টি একলক্ষ ষাট হাজার মাইল। যুদ্ধ কালীন অসুবিধার সময় রেলযোগে পুলিন্দা প্রেরণ না করিয়া অনেকে ডাক বিভাগের দ্বারা সে কার্য্য করিতে লাগিলেন। শেষে এত পুলিন্দা আসিতে লাগিল যে মেল গাড়ীতে আর স্থান সংকুলান করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। তখন অগত্যা ডাকযোগে দেশী পার্শেল প্রেরণের দর বাড়াইতে হইয়াছিল। তাহার উপর ডাক বিভাগের স্কন্ধে আর একটি বিষম ভার স্থাপিত হইয়াছিল। নানা যুদ্ধক্ষেত্রে পত্রাদি প্রেরণের সুবন্দবস্ত করিতে বিভাগীয় রাজকর্ম্মচারিগণকে অনেক শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে যুদ্ধক্ষেত্রের সান্নিধ্যে দশটি বড় ডাকঘর ও নিজ যুদ্ধক্ষেত্রে একশত ছিয়াত্তরটি ডাকঘর খুলিতে হইয়াছিল ও দুইহাজার লোক এইসব ডাকঘরে চাকুরি করিত। টেলিফোনের আদর ও ব্যবহার পূর্ব্বের ন্যায় এবৎসর ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু সামরিক বা রাজনৈতিক প্রয়োজন ভিন্ন আর নূতন

সংযোজনা দেওয়া হইবে না, পূর্ব্বের এই নিয়ম এবৎসর ও বাহাল রহিল। টেলিফোনের উপযোগী মাল মসলা বিলাত হইতে পাইতে নানারূপ বিঘ্ন হওয়াতে, দূরস্থ অনেক স্থলে কারখানাদিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করা প্রায় অসাধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে এই সকল বিঘ্ন ও অভাব অতিক্রম করিয়া, রাউলপিণ্ডি হইতে মরি, সিমলা হইতে লাহোর, দিল্লী হইতে লাহোর ও লাহোর হইতে অমৃতসর পর্য্যন্ত মূল লাইন সাধারণের ব্যবহারার্থ খোলা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে কয়লাখনিগুলি যে মূল লাইন দ্বারা সংযুক্ত, তাহার ব্যবহার খুব বাড়িয়া ছিল। ১৯১৭-১৮ সালে ঐ লাইন হইতে বার্ষিক আমদানি ছিল সাত শত পাউণ্ড। আলোচ্য বর্ষে উহা চৌদ্দশত পাউণ্ড হইয়াছিল, অর্থাৎ ঠিক দ্বিগুণ হইয়াছিল। আরও নূতন মূল লাইনের আবশ্যকতা আছে, ও উহা খোলার কথা এখন গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। দেশের তারহীন টেলিগ্রাফ আফিস গুলির কার্য্য সন্তোষকর হইয়াছিল, তবে ঝড়ের সময় ভাল কার্য্য করে না। এদেশে এইরূপ দুর্ঘটনা এপ্রিল হইতে অকটোবর মাসের মধ্যেই ঘটিয়া থাকে। তখন ইহার উপর সকল সময়ে নির্ভর করা যায় না। যদি এই অসুবিধা কোন রকমে দূর করা যাইতে পারে, তাহা হইলে তার যোগে টেলিগ্রাফের কার্য্য যে ভয়ানক বাড়িতেছে সেই বৃদ্ধি তাহাতে অনেকটা দমন হইতে পারে। এক এক সময় এই বৃদ্ধি এত অধিক হইয়াছে যে তাহাতে সাধারণের অসুবিধা হইয়াছে। তারহীন টেলিগ্রাফের উন্নতি করণার্থ একটি নূতন বিভাগ গঠিত করা স্থির হইয়াছে। যুদ্ধে তারহীন টেলিগ্রাফের কার্য্যে পাচ বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া যাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই বিভাগে নিযুক্ত করা হইবে। যদি তারহীন টেলিগ্রাফের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়, তাহা হইলে সমুদ্র পারে সংবাদ পাঠাইবার জন্য কেবলের (কাছির) ব্যবহার কমিবার সম্ভাবনা, ও তাহা হইলে এখন কেবল (কাছির) যোগে সাগর পারে সংবাদ পাঠাইতে ও তথা হইতে সংবাদ পাইতে যে বিষম বিলম্ব হইয়া থাকে তাহাও অনেকটা কমিয়া যাইবে। আলোচ্য বর্ষে বিলাতী টেলিগ্রামের সংখ্যা, পূর্ব্ব বর্ষের উনিশ লক্ষ হইতে বাইশ লক্ষে উঠিয়াছিল। সরকারি বিদেশী টেলিগ্রামের আধিক্যই এই বৃদ্ধির হেতু।

আর্থিক হিসাবে আলোচ্য বিবরটি ভারতবর্ষের পক্ষে দুর্বৎসর বলিয়াই মানিতে হইবে। কিন্তু অন্যদিকে এই বৎসরে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির প্রমাণ প্রচুর বিদ্যমানছিল। যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে বাণিজ্যের ও কল কারখানা স্থাপনার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। বলিতে কি সেই সময়ে দেশে নূতন কল কারখানা স্থাপনে ভারতবর্ষীয়গণের যে অনুরাগ ও উদ্যম দেখা গিয়াছিল এখনও তাহা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে। বলা বাহুল্য

ইহার দুইটি প্রধান কারণছিল, প্রথমতঃ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ, ও দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের উক্ত রিপোর্টের প্রস্তাবগুলি শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিবার আন্তরিক বাসনা। যুদ্ধ স্থগিতের ঘোষণার সময় হইতে, ১৯১৯ সালের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত লোকে ভবিষ্যতে কি হইবে তদ্বিষয়ে সন্দিহান থাকায় কোনরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠানে হাত দিতে সাহসী হয় নাই। যুদ্ধ হঠাৎ থামিয়া যাওয়াতে ব্যবসাদার মহলে ধারণা জন্মিল, যে তাহাদিগের পক্ষে তেমন সুদিন আর আসিবেনা, ও সেই জন্য ব্যবসাকার্য্য অনেকটা কমিয়া গেল। কিন্তু এই আশঙ্কা ও সন্দেহের দিন শীঘ্রই কাটিয়া গেল ও পুনরপি ব্যবসায়ের ও কলকারখানা সংক্রান্ত উদ্যমের স্রোত প্রবাহিত হইল। ভারতবর্ষের বাণিজ্যের উপর যে সমস্ত প্রতিবন্ধক স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা দূর করার আবশ্যকতা গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যুদ্ধ চুকিয়া যাওয়াতে উক্ত প্রতিবন্ধকের মধ্যে অনেকগুলিই এখন দূরীকৃত করা সম্ভব হইল। পাট, চামড়া, তৈল ও যাহা হইতে তৈল উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ তিসি সরিষা প্রভৃতি ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি করা নিষিদ্ধ হইয়া ছিল, এই নিষেধ এক্ষণে উঠিয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদিও দেশে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন হয় নাই, জাহাজে মাল পাঠাইবার ভাড়া বাড়িয়াছিল ও জাহাজ পাওয়া ও সহজ ছিল না। রেলগাড়ী পাওয়াও একান্ত দুর্লভ হইয়াছিল ও তাহার উপর বিলাতে টাকা পাঠান সম্বন্ধে নানারূপ গোলযোগ ছিল। তত্রাচ বাণিজ্যেরও কলকারখানা প্রভৃতির উন্নতি যেরূপ এই বর্ষে অধিক হইয়াছিল, এরূপ প্রায় পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে এই সব উন্নতির সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধের সময় অনেকে প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন। কিন্তু তখন এই সমস্ত সঞ্চিত ধন খাটাইবার কোন উপায় ছিল না। নূতন কল বা কারখানার জন্য আবশ্যকীয় জিনিষ গুলি বিদেশ হইতে পাইতে ও তথা হইতে বিশেষজ্ঞ কারিকর আনিবার পক্ষে নানারূপ অসুবিধা থাকায়, নূতন উদ্যমের অনুষ্ঠান করা অসম্ভব ছিল। সুতরাং যেই যুদ্ধ চুকিয়া গেল, অমনি চারিদিগে নূতন নূতন কল কারখানা স্থাপনের জন্য চেষ্টা ও কার্য্য হইতে লাগিল। কত নূতন নূতন যৌথ কোম্পানির উদয় হইল। তবে এসব ব্যবসায়ে লাভ ও হইতে পারে, লোকসানও হইতে পারে বলিয়া অনেকে হাত দিতে সাহস করে না। নূতন যৌথ কোম্পানিগুলির মূলধনের সমষ্টির যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়া ছিল এমন কি লোকে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প টাকা দুইবারের যুদ্ধ ঋণ সংক্রান্ত কোম্পানির কাগজ ক্রয়ে খাটাইয়া ছিল, যথা প্রথমবারে ৩ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড ও দ্বিতীয়বারে ৩ কোটী আশী লক্ষ পাউণ্ড। অপর পক্ষে ১৯১৯ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর এই নয় মাসের মধ্যে ছয় শত চৌত্রিশটি নূতন যৌথ কোম্পানি ভারতবর্ষে ও মহীসুরে গঠিত হইয়াছিল

ও তাহাদিগের অনুমোদিত মূলধনের সমষ্টি তেরকোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড। তবে অনুমোদিত মূলধনের অপেক্ষা অল্প টাকায় কোন কোন স্থলে কাজ চলিয়া থাকে। ১৯১৮ সালে একশত আটান্নটী নূতন যৌথ কোম্পানি গঠিত হইয়াছিল ও তাহাদের সমবেত মূলধন ছিল পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯১৯-২০ সালে অর্থাৎ ১৯১৯ সালের এপ্রিল হইতে ১৯২০ সালের মার্চ পর্য্যন্ত এই বারমাসে নয় শত ছয় তিন কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে ও তাহাদিগের মূলধনের সমষ্টি আঠার কোটি ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড। প্রায় এমন কারবার নাই যাহা এই নূতন কোম্পানিগুলির তালিকায় দেখা না যাইবে। আর এইসব উদ্যমের মধ্যে কতকগুলির ভিতর জুয়াচুরি আছে, ইহা আশঙ্কা করিবার কোনকারণ যদিও বিদ্যমান ছিল না, তথাপি এই নূতন কোম্পানিদিগের আবির্ভাবে কতকটা সন্দেহের কারণ যে একেবারেই ছিল না ইহা বলা যায় না। সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইএর শেয়ারের দালাল অর্থাৎ যাহারা যৌথ কারবারের অংশ ক্রয় বিক্রয় করে তাহাদিগের সভা প্রতিজ্ঞা করিল যে যে সব নূতন কোম্পানির সহিত তাঁহারা পূর্ব্বে কখন কোন কারবার করেন নাই, তাহাদিগের শেয়ার বাজারে কেনাবেচা করিবেন না। এক্ষণে লক্ষণ দেখা দিতেছে যে শেয়ারের কাজে যাহারা পূর্ব্বে উন্মাদ প্রায় হইয়াছিল তাহারা এখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে শ্রমজীবি-চালিত কল কারখানা প্রভৃতি উদ্যমের সম্বন্ধে সাধারণের যেমন একটা অনুরাগ ও উৎসাহ হইয়াছে, তেমনি উহাদিগের জন্য যথেষ্ট টাকা সরবরাহ করিবার ক্ষমতা ও দেশে অভাব নাই ও উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষের মাঝামাঝি শ্রীযুক্ত গন্ধি স্বদেশী উদ্যম পুনর্জ্জীবিত করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য স্বদেশ জাত্য-দ্রব্যাদির সমাদর ও ব্যবহার ও তৎসঙ্গে কতকটা বিলাতী জিনিষ বর্জ্জন। তাঁহার আর একটী উদ্দেশ্য ছিল যে দেশের গ্রামে গ্রামে গার্হস্থ শিল্পের পুনরুদ্ধার। এই শেষোক্ত অনুষ্ঠান যদি পাকা লোকদিগের দ্বারা চালিত হয়, তাহা হইলে ইহাদ্বারা দেশের প্রভূত মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নাই। যাহাদিগের উপকার করা ইহার উদ্দেশ্য, দেশের সেইসব লোকই অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্থ ও সুতরাং সাহায্যের যোগ্য পাত্র। তবে যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে ও সেই সঙ্গে ভীষণ প্রতিযোগিতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, তখন সে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইলে, ব্যবসাদারি বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইতে হইবে, কেবল ভাবের আবেগে উত্তেজিত হইয়া কার্য্য করিলে চলিবে না। স্বদেশী দ্রব্যাদির ও শিল্পের বিস্তারের ফলে যদি এদেশের শ্রমজীবিগণের কার্য্য-তৎপরতা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে খুব আনন্দের বিষয় হইবে বলিতে হইবে। ভারতীয় শ্রমজীবিগণের কার্য্য

-পটুতা সম্বন্ধে সুনাম নাই। টমাস এন্‌স্‌কফ্‌ নামা একজন সাহেব "ভারতবর্ষে ইংরাজ বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ আশা" সম্বন্ধে এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে সত্য বটে ভারতবর্ষের শ্রমজীবিগণের অপেক্ষা বিলাতে কি আমেরিকায় শ্রমজীবিগণ অধিক মজুরি পাইয়া থাকে, কিন্তু তেমনি ইহারা তেমন পাকা ও পটু নহে ও ইহাদিগের কাজ কর্ম্মও পরিষ্কার নহে। ইতি মধ্যেই ভারতবর্ষে যত নিপুণ যান্ত্রিক অর্থাৎ যাহারা কলকরখানার কাজ জানে, দরকার, তত লোক ও পাওয়া যাইতেছে না, ও আর কয় বৎসরের মধ্যে তাহাদিগের এত অভাব বাড়িবে যে অবশেষে নূতন কল কলকারখানার কর্ত্তৃপক্ষগণকে নিজেদের কলে বা কারখানায় শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত যান্ত্রিক তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। শ্রমজীবিগণের কার্য্যের কোন উন্নতি হইবে না যতদিন না তাহারা এখন মজুরি পায় যাহাতে তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। নতুবা তাহাদিগের কার্য্য খারাবই থাকিবে, ও বিলাতি শ্রমজীবিগণ তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক ভালকাজ দেখাইতে পারিবে। এই প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতে হইলে প্রথমে দেশীয় শ্রমজীবিগণের জীবন ধারণের অবস্থা, বাসস্থানের অবস্থা ও আর্থিক অবস্থা অর্থাৎ সকল রকম অবস্থারই উন্নতি সাধন করিতে হইবে। মজুরি কম রাখিয়া কাঁচা কাজে সন্তুষ্ট থাকিলে, এই প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার দিনে এদেশ টিকিতে পারিবে না।

কিসে ভারতবর্ষকে কোন দ্রব্যের জন্য পরের মুখাপেক্ষী পূর্ব্বাপেক্ষা কম হইতে হয় তাহার উপায় উদ্ভাবনে গবর্ণমেণ্ট এই সময় বিশেষ মনোযোগী ও চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ইণ্ডষ্ট্রীয়াল কমিসনের রিপোর্টে প্রকাশ যে এদেশের দরকারমত দ্রব্যের সামান্য অংশ জন্মিয়া থাকে। যে দেশে পেরেক, স্ক্রু, ইস্‌পাতের স্প্রিং, লোহার শিকল, তারের দড়ি, ইস্পাতের পাত, কারখানার যন্ত্রাদি ও এনজিন তৈয়ারি হয় না, সে দেশের অবস্থা ভাবিয়া বিজ্ঞান শিল্প-বিশারদগণ স্তম্ভিত হইবেন। ভারতবর্ষ অসংস্কৃত দ্রব্য সম্ভারে ধনী, কিন্তু কলকারখানা অভাবে তাহারা সংস্কৃত হইয়া পাকা মালে পরিণত হয় না। এদেশ হইতে বর্ষে বর্ষে পনর লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের কাঁচা রবার রপ্তানি হইয়া থাকে, আর দশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের নানাবিধ রবারে তৈয়ারি জিনিষ বিদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে। তফাৎ পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের। এইরূপ লোকসান নিবারণ করণের উদ্দেশেই ইন্‌ডষ্ট্রীয়াল কমিশনের প্রস্তাবগুলি প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের উক্ত প্রস্তাব গুলির উপর মতামত সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পরে নিজ মন্তব্য সমেত সমস্ত মতামত ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সচিব উত্তরে বলিলেন যে তিনি দুইটি

প্রধান প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন, সে দুইটি এই, প্রথমতঃ ভারতবর্ষের শ্রম শিল্প সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধিত করিতে হইলে স্বয়ং গবর্ণমেণ্টকে কর্ম্মশীল ও উদ্যমশীল হইতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেণ্ট যতদিন না নিপুণ অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিতেছেন, ততদিন তাঁহারা এই কার্য্য হস্তে লইতে সক্ষম নহেন। সুতরাং স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গুলির অধীনে উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণ নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গুলির মধ্যে অনেকেই ইতি মধ্যে তাঁহাদিগের নিজ নিজ ডিরেকটর অফ ইনডষ্ট্রীর অধীনে এইরূপ বন্দবস্ত করিয়াছেন ও কেহ কেহ পরামর্শদাতা কমিটিও নিযুক্ত করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে আলোচ্য বর্ষে এসম্বন্ধে কতকটা কার্য্য ইতিমধ্যেই হইয়াছে। তথায় নূতন যন্ত্রের সাহায্যে তাঁতে বস্ত্র বয়ন কার্য্যের অনেকটা উন্নতি করা হইয়াছে। কিসে শ্রমশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে তদ্বিষয়ে পরামর্শ দান ও শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় উদ্যম যাহারা অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সাহায্য দানও করা হইতেছে। মান্দ্রাজ, বাঙ্গালা ও যুক্ত প্রদেশে, কি উপায়ে শ্রমশিল্পের উন্নতি হইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করা হইতেছে, তৎসম্বন্ধীয় নূতন প্রস্তাব প্রবর্ত্তিত হইতেছে ও পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। মহীশূর প্রভৃতি কোন কোন দেশীয় নৃপতির রাজ্যে শ্রমশিল্প বিষয়ে বিভাগ ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে ও গোয়ালিয়ার রাজ্যে সাধারণের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে শ্রমশিল্প বিভাগ স্থাপন সম্বন্ধে নানাবিধ প্রস্তাব আলোচিত হইতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য একটি বিভাগ স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষজ্ঞ সভ্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কি উপায়ে শ্রমশিল্প উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে পারেন তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা ও চলিতেছে। নিম্নলিখিত উপায়গুলি এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—আবশ্যকীয় সংবাদ সংগ্রহ, পরামর্শ দান, কাজ শিখিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া, নূতন কারখানা স্থাপনে অগ্রণী হওয়া ও আর্থিক সাহায্য করা। আর একটি ব্যাপার অনুষ্ঠান করিবার প্রস্তাব এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে যে মাল পাওয়া যায় তাহা পরীক্ষা ও খরিদ করিবার জন্য ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইতেছে ও কিরূপে এদেশে একটা মাল বিভাগ স্থাপিত হইতে পারে তাহা বিবেচনার ভার একটা কমিটীর হস্তে অর্পণ করা গিয়াছে।

ইণ্ডষ্ট্রীয়াল কমিশনের প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা ত হইতেছেই, তাহা ছাড়া আলোচ্য বর্ষে অনেকগুলি নূতন প্রস্তাব পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কিরূপে জলের বলের সাহায্যে কল চালান যাইতে পারে, কিরূপে ভারতবর্ষে রেশম ও তুলার

চাষের উন্নতি করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। ইক্ষু চাষের উন্নতি করিয়া যাহাতে দেশে অধিক পরিমাণে চিনি জন্মিতে পারে তদুদ্দেশ্যে একটী কমিটী ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে গমন করিয়া তাহার পরীক্ষা করিতেছেন। দেশের কয়লার খনিগুলি হইতে যে পরিমাণ কয়লা পাওয়া যাইতে পারে, তাহার এক তৃতীয়াংশ খনন-প্রণালীর দোষে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আর খনি হইতে তুলিবার ব্যবস্থার দোষে বর্ষে বর্ষে সাড়ে সাত লক্ষ টন নষ্ট হইতেছে। সুতরাং এই লোকসান যাহাতে না হয় তাহার উপায় উদ্ভাবনের ও চেষ্টা করা হইতেছে। রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দবস্তের উপর ভারতে শ্রম শিল্পের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষ হইতে যে চামড়া রপ্তানিহয়, তাহার উপর আলোচ্য বর্ষে শুল্ক স্থাপন করা হইয়া ছিল, তবে যে চামড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোন দেশে সংস্করণার্থে প্রেরিত হয় তাহার উপর শুল্কের হার অপেক্ষাকৃত কিছু কম। এই শুল্ক স্থাপনের বিপক্ষে ঘোর আন্দোলন হইয়া ছিল। তাহার উত্তরে দেখান হইয়াছিল যে এই শুল্ক স্থাপনা কিম্বা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ সমূহের পক্ষে অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা অল্প শুল্ক বসান সেই সব দেশের উপকারার্থ করা হয় নাই, ভারতের উপকারের জন্যই করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে ভারতে প্রাপ্ত চামড়া যেন এই দেশেই সংস্করণ করা হইতে পারে, অপর দেশের মুখাপেক্ষী হইতে যেন না হয়। তবে যদি তাহা পূর্ণমাত্রায় সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সাম্রাজ্যের অপর কোন দেশে এই সময় সংস্করণ যাহাতে হয় তাহা করাই বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় বহুদিন হইতে যাহাতে এ দেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকে তাহার জন্য প্রার্থনা করিয়া আসিতেছিলেন। এই শুল্ক স্থাপনার দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উক্ত স্বাধীনতা প্রকাশ পাইল। যে কমিটির উপর নূতন সংস্কার আইন পরীক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইয়া ছিল, তাঁহারা এ সম্বন্ধে যাহা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায় সকলেই সমাদরে অনুমোদন করিলেন। এই স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে পার্লামেণ্ট মহাসভার ভারতবর্ষের শাসন সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, আইন করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব বিষয়ক স্বাধীনতা প্রদান করিলে পার্লামেণ্টের পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে হয় ও ভারতেশ্বর সম্রাটের ও যে কোন আইন বা প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাও খণ্ডিত হইয়া পড়ে। তবে রাজস্ব সক্রান্ত কোন বিষয়ে যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা উভয়েরই এক মত হয় তাহা হইলে আর ভারত সচিব উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না, এইরূপ একটা বোঝা পড়া হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিষয়ক স্বাধীনতা কার্য্যতঃ এক প্রকার রক্ষিত হইতে পারে। অর্থাৎ এদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ও

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা উভয়ে এক মত হইলে তাঁহাদিগের ব্যবস্থাই অক্ষুন্ন থাকিবে। শুল্ক স্থাপন সম্বন্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের উপর অপর দেশের তুলনায় কতটাউদারতা দেখান সম্ভব তাহা স্থির করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক একটী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে।

১৯১৮-১৯ সালে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের অবস্থা বিবেচনা করিতে হইলে প্রথমে যুদ্ধ নিবন্ধন উক্ত বাণিয্যের অবস্থা কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা দেখা উচিত। যুদ্ধের পূর্ব্বে মধ্য ইউরোপের কোন কোন দেশ এদেশ হইতে অনেক টাকা মূল্যের কাঁচা মাল ক্রয় করিত। যুদ্ধারম্ভে তাহাদিগের সহিত ক্রেতার সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। বোম্বাইএর তুলা ব্যবসায়িগণ জর্ম্মানির ন্যায় একটি উৎকৃষ্ট খরিদদার হারাইলেন। এদেশে এই জন্য তুলার ও পাটের দর অনেক কমিয়া গেল। হাম্বার্গ ও ব্রেমেননগরে অনেক টাকার নারিকেলের মালা রপ্তানি হইত। তাহাও বন্ধ হইয়া যাওয়াতে ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইল। বেলজিয়াম জর্ম্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে ও ফ্রান্সের মার্সেলিস নগর যুদ্ধের হাঙ্গামায় ব্যস্ত থাকাতে, তিশি, সরিষা প্রভৃতির ও চিনের বাদামের রপ্তানি বন্ধ হইয়া গেল। যুদ্ধের প্রথম পাঁচমাস বঙ্গোপসাগরে জার্ম্মাণ রণপোত এমডেন ক্রমাগত ইংরাজদিগের জাহাজ দেখিলেই উহা সমুদ্রে জলমগ্ন করাতে ও আরব্য সমুদ্রে কনিগসবর্গ নামা আর একখানি জর্ম্মান রণপোত উৎপাৎ আরম্ভ করাতে কতকগুলি রপ্তানির কাজ এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। যুদ্ধের জন্য অনেক জাহাজ নিযুক্ত হওয়াতে জাহাজ পাওয়াও দুষ্কর হইয়া উঠিল। অবশ্য যে সব জাতি যুদ্ধে কোন পক্ষই অবলম্বন করে নাই, তাহাদিগের বাণিজ্য তরী এখনও ভারতবর্ষে আসিতে লাগিল, কিন্তু তদ্দ্বারা জর্ম্মান ও অষ্ট্রীয়ান বাণিজ্য তরী না আসার জন্য অভাব পূর্ণ হইল না। পাটের কলের মজুর দিগের খাটুনির সময় কমাইয়া দেওয়া হইল ও খরিদ্দারের অভাবে কলওয়ালারা খুব কম দর না পাইলে অধিক পরিমাণে কাঁচা পাট কিনিতে সাহস করিল না। ১৯১৪ সালে পাট অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালার কৃষিজীবিগণের দুর্ভাগ্যে ক্রেতা অভাবে তাহাদিগকে অতি সুলভ মূল্যে পাট বেচিতে হইয়াছিল। সেই সুযোগে কলওয়ালারা সস্তায় মাল কিনিয়া তাঁহাদিগের গুদাম পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই ভারতবর্ষের বাণিজ্য যুদ্ধের উপযোগী অবস্থায় পরিণত হইল। যুদ্ধের জন্য বালির বস্তার আবশ্যক বড়ই বাড়িয়া উঠিল। নূতন সৈন্যদিগের জুতা নির্ম্মাণের জন্য অত্যন্ত অধিক পরিমাণে চামড়ার দরকার হইল। ভারতবর্ষে তুলা প্রচুর জন্মিয়াছিল। জাপান এখন ভারতবর্ষে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে তুলা কিনিতে আরম্ভ করিল। সৌভাগ্য বশতঃ ভারতবর্ষের সরকারি তহবিলে ১৯১৪ সালের অগষ্ট মাসে বিস্তর টাকা মজুদ ছিল। এই টাকা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রাজধানীস্থ ব্যাঙ্ক গুলির হস্তে অর্পণ

করা হইল। লোকে ডাকঘরের সেভিংশ ব্যাঙ্ক সমূহে যে টাকা গচ্ছিদ রাখিয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু যখন সকলে দেখিল যে ইংরাজদিগের এই যুদ্ধে পরাজিত হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তখন গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস বাড়িল ও ডাকঘর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক গুলি হইতে টাকা তুলিয়া লওয়াও বন্ধ হইল।

যেমন যুদ্ধ চলিতে লাগিল তেমনি নিরপেক্ষ দেশগুলিতেও খাদ্য ও যুদ্ধে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির রপ্তানি করা বন্ধ রাখিতে হইল, কেননা সে সব দেশ হইতে উহা শত্রুদিগের দেশে চালান হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। আর কতকগুলি জিনিষ, যাহা বিলক্ষণ লাভে বিক্রয় করিতে পারা যাইত, তাহাদিগেরও রপ্তানি বন্ধ করিতে হইয়াছিল; কেননা তাহা বিদেশে চলিয়া গেলে এদেশে তাহাদিগের স্থান পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। কিন্তু এত বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও মোটের উপর রপ্তানির কাজ মন্দ হয় নাই। চা, পাটের বস্তা ও বস্তা প্রস্তুতকরণের বস্ত্র ও কাঁচা পশমের রপ্তানি অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ও সৈন্যদিগের খাদ্যের জন্য বিস্তর পরিমাণে গম রপ্তানি করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানির পথ শত্রু কর্ত্তৃক জাহাজ ডুবি হইবার ভয়ে একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল।

১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের সহিত সমুদ্রপারস্থ দেশ সমূহের বাণিজ্য আমদানি রপ্তানি উভয় দিকেই বাড়িয়াছিল। মালের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু দর বাড়াতে রপ্তানির মূল্য শতকরা একুশ টাকা ও আমদানির মূল্য শতকরা তেরটাকা বাড়িয়াছিল। এই বৎসর সুবৃষ্টি হওয়াতে ফসল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছিল। কাঁচা তুলা, সোরা, শেল্‌লাক্‌ ও নীলের দর বাড়াতে যাঁহারা এই সব দ্রব্য রপ্তানি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বিলক্ষণ লাভ হইয়াছিল। যদিও যুদ্ধারম্ভে কাঁচা পাটের যে দর ছিল তাহা শতকরা পনর টাকার হিসাবে কমিয়াছিল তবু পাটের কলওয়ালারা প্রভূত লাভ করিয়াছিল।

১৯১৭-১৮ ইংলণ্ডের সহিত সম্মিলিত দেশগুলির জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য ভারত হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। এই জন্য দেশে শ্রম শিল্পের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। ১৯১৩-১৪ সালে যাহা এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল তাহার মধ্যে তৈয়ারি মাল প্রায় এক চতুর্থাংশ ছিল। এখন তাহা এক তৃতীয়াংশ হইয়াছিল। এখন যুদ্ধার্থে ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি তৈয়ার করিবার জন্য এদেশে মিউনিশনস্‌ বোর্ড নামে একটি আফিস স্থাপন করা হইল। এই বোর্ড সরকারি গোলা গুলি বারুদের কারখানা, সৈন্যদিগের পোষাক তৈয়ারির কারখানা ও চামড়ার কারখানা গুলির ভার গ্রহণ করিলেন। এদেশস্থ কতকগুলি সৈন্যদিগের জন্য পসমী পোষাক তৈয়ার করাইবার ভারও এই বোর্ড গ্রহণ করিলেন। এদেশ হইতে চা চামড়া ও তৈয়ারি চামড়া যাহা সৈন্যদিগের বুট জুতা নির্ম্মাণের জন্য

ব্যবহৃত হইত, তাহা বিলাতে চালান করিবার ভার ও এই বোর্ড গ্রহণ করিলেন। অধিকন্তু এই বোর্ড মেসোপটেমিয়া, মিসর, পূর্ব্ব আফ্রিকা, এডেন ও পারস্যোপসাগরে যুদ্ধার্থ রেলওয়ে সংক্রান্ত যাহা কিছু দরকার তাহা পাঠাইবার ভার লইলেন ও একটি তাঁবু প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন করিলেন। পাটের জিনিষ ক্রয় করা এই বোর্ডের দ্বারা হইতে লাগিল। জলযোগে মাল পাঠাইবার জন্য জাহাজ মেরামত বা নির্ম্মাণ করা ও এই বোর্ডের কার্য্য হইল। একটি কাষ্ঠ সরবরাহ করিবার বিভাগ খোলা হইল, ও দুইলক্ষ টন বাঁশ, কড়ি, তক্তা, প্রভৃতি বোর্ড দ্বারা নানা রণক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিল। জামশেদপুরে টাটা কোম্পানির যে লোহা ও ইস্পাতের কল আছে, তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের উপর ও এই বোর্ডের নিয়ম জারি করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ইন্‌জিনিয়ারিং সংক্রান্ত যন্ত্র ও মাল মসলা অনেক পরিমাণে বোর্ড মেসোপটেমিয়ায় ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় পাঠাইতে পারিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে দেখা যায় যে প্রথমতঃ এদেশের আমদানির ও রপ্তানির মূল্যের বিভিন্নতা এদেশের পক্ষেই অনুকূল ছিল। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি বিষয়ে বাণিজ্যের বিশেষ প্রবৃদ্ধি হইয়াছিল। উক্ত বর্ষে রপ্তানির মূল্য ছিল ষোল কোটি নব্বই লক্ষ পাউণ্ড ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ছিল ষোল কোটি বিশ লক্ষ পাউণ্ড। আলোচ্য বর্ষে আমদানির মূল্য ছিল এগার কোটি ত্রিশ লক্ষপাউণ্ড, তৎপূর্ব্ববর্ষে দশকোটি পাউণ্ড ছিল। সুতরাং আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি পাঁচকোটি ষাট লক্ষ পাউণ্ড অধিক হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব বর্ষে ছয়কোটী কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড অধিক হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে গড়ে পাঁচকোটী কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড হইত। আমদানি ও রপ্তানির এই তালিকা মূল্যের হিসাবে দেওয়া হইল, পরিণামের হিসাবে নহে। বস্তুতঃ পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনায় আলোচ্য বর্ষে আমদানির মূল্যের শতকরা তের টাকা ও রপ্তানির মূল্যের শতকরা চারি টাকা বৃদ্ধি হইয়া ছিল, তাহার কারণ পরিমাণ বেশী হয় নাই, কেবল দরই অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। পরিমাণ পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা আমদানির দিকে শতকরা ছয় অনুপাতে ও রপ্তানির দিকে শতকরা ষোল অনুপাতে কমিয়া গিয়াছিল। সুবৃষ্টি অভাবে ফসল নষ্ট হওয়াতেই এই রূপ হইয়াছিল।

আমদানির দিকে দেখা যাইতেছে যে আলোচ্য বর্ষে জাপান হইতে আমদানির মূল্য এক কোটি পাউণ্ড ও আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস হইতে আমদানির মূল্য উনত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু বিলাত হইতে আমদানির মূল্য ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছিল। রপ্তানির দিকে দেখা যায় যে বিলাতে রপ্তানির মূল্য পঁয়ষট্টি লক্ষ পাউণ্ড, ইউনাইটেড ষ্টেটসে সত্তর লক্ষ পাউণ্ড, ও আসিয়াস্থ তুরস্ক,

প্রধানতঃ মেসোপটেমিয়ায় ছাব্বিশ লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়াছিল। ভারতের সহিত বাণিজ্যের একা বিলাতেই শতাংশের চুয়ান্ন অংশ অধিকার করিয়াছিল কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাত হইতে আমদানি ছিল শতাংশের সত্তর অংশ। বিলাতের কলকারখানাগুলি কেবল যুদ্ধের উপযোগী দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে নিযুক্ত থাকাতে, বিলাত হইতে আমদানি স্বভাবতঃই কমিয়াগিয়াছিল। তবে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি বৃদ্ধি হইয়াছিল ও জাপান ও আমেরিকা হইতে আমদানির মূল্য প্রায় তিনগুণ হইয়াছিল। রপ্তানির দিকে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অংশ শতকরা বায়ান্ন টাকা হইয়াছিল, অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্ব্বের অংশ অপেক্ষা শতকরা দশের অনুপাতে বাড়িয়াছিল। ইহাত হইবারই কথা কেননা যুদ্ধের পূর্ব্বে শত্রু দেশ সমূহে, যথা জর্ম্মাণি, অষ্ট্রীয়া, ও তুরস্কদেশে শতাংশের চতুর্দ্দশ অংশ রপ্তানি হইত, যুদ্ধের সময় এই রপ্তানি বন্ধ হওয়াতে সেই মাল বিলাতে চালান হইয়াছিল।

আমদানি ও রপ্তানি দুই ধরিলে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের সমগ্র বাণিজ্যের শতাংশের পঁয়ত্রিশ অংশ অধিকার করিয়াছিল, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ ভাগী হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষে শতাংশের সাঁয়ত্রিশ অংশ, ও যুদ্ধের পূর্ব্বে গড়ে চল্লিশ অংশ ছিল। এই কম্তির কারণের মধ্যে প্রধান কারণ গুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল। প্রথমতঃ আমদানিরদিকে ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে সুতার কাপড় প্রভৃতির আমদানির মূল্য পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছিল, পরিমাণ কিন্তু আরও বেশী কমিয়াছিল। ১৯১৮-১৯ সালে, যুদ্ধের পূর্ব্বে যত পরিমাণ মাল আমদানি হইত, তাহার এক তৃতীয়াংশে পরিণত হইয়াছিল। সুতার কাপড়, মদ্য, পশমী কাপড়, তামাক (চুরুট, সিগারেট প্রভৃতি); রাসায়নিক আরকাদি লোহার জিনিষ, রেলগাড়ী সংক্রান্ত মাল (এনজিন্, চাকা, প্রভৃতি), সাবান, কাগজ কলম কালি, মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি ও বিবিদিগের পরিধেয় বসন এই সব জিনিষ বিলাত হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আমদানি হইয়াছিল। বিলাত হইতে আমদানির মূল্য ছিল পাঁচকোটী দশ লক্ষ পাউণ্ড। এদেশ হইতে বিলাতে রপ্তানির মূল্য চারিকোটী আশীলক্ষ পাউণ্ড, পূর্ব্ব বর্ষে উহাছিল চার কোটী দশ লক্ষ পাউণ্ড। চা, তিসি সরিষা প্রভৃতি, সংস্কৃত চামড়া কাঁচা পাট, অসংস্কৃত পশম এই সব জিনিষের রপ্তানির মূল্য অনেক বাড়িয়াছিল, কিন্তু খাদ্যের ও পাটের জিনিষের রপ্তানির মূল্য কমিয়াগিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষে চৌদ্দকোটী দশলক্ষ সের চা রপ্তানি হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে এতবেশী রপ্তানি কখন হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে কিন্তু তাহা অপেক্ষা ও শতকরা ছয়ের অনুপাতে বৃদ্ধি হইয়াছিল।

আমদানির হিসাবে বিলাতের নীচেই জাপান স্থান অধিকার করিয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের

পূর্ব্ব হইতেই জাপান ভারতের আমদানির শতাংশের তিনঅংশ হইতে ক্রমে কুড়িঅংশে দাঁড় করাইয়াছিল। জাপান হইতে আমদানির মুল্য দুইকোটি বিশলক্ষ পাউণ্ডের ও উপর উঠিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা এককোটী পাউণ্ড বাড়িয়াছিল। এই অসাধারণ বৃদ্ধির কারণ জাপানি কাপড়ের বেশী আমদানি। জাপান হইতে আমদানির অর্দ্ধেকেরও অধিক জাপানি কাপড়। পূর্ব্ববর্ষে কাপড় জাপান হইতে সমস্ত আমদানির শতাংশের আঠাশ অংশ হইয়াছিল। জাপানি কাপড়ের আমদানির পরিমাণ ছিল তেইস কোটি আশি লক্ষ গজ, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ষের প্রায় তিনগুণ। তাহা ছাড়া পরিচ্ছদ পসমী কাপড়, লোহার জিনিষ, বীয়ার মত্ত, তামা পিত্তল প্রভৃতি ধাতু, সিমেণ্ট, চায় বাক্স কাগজ, পিজবোড, কল যন্ত্র প্রভৃতি, রাসায়নিক পদার্থ, মোজা গেঞ্জি, স্ত্রীলোকদিগের পরিধেয় বস্ত্রাদি এসব জিনিষের ও আমদানি জাপান হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল। এ দেশ হইতে জাপানে রপ্তানির মুল্য দুইকোটি পাউণ্ড। পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা শতকরা চৌদ্দ টাকা কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে গড়ে যাহা ছিল তাহাপেক্ষা শতকরা পঁচাত্তর টাকার হিসাবে বাড়িয়াছিল। জাপানে রপ্তানির মধ্যে পাঁচভাগের চারভাগ ছিল কাঁচা তুলা। আমদানি রপ্তানি দুই ধরিলে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের শতাংশের পঞ্চদশাংশ জাপান অধিকার করিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা শতকরা দেড় টাকা বাড়িয়াছিল। জাপানের ভারতের সহিত বাণিজ্যের উন্নতির চিহ্ন এসব সন্দেহ নাই। কিন্তু বোধ হয় জাপানের উক্ত উন্নতি চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্যই জাপান এই সুবিধা পাইয়াছিল, যাহা কেহ কখন দেখে নাই। এখন ভারতবর্ষে এমন বাজার নাই যেখানে সুদৃপ্ত জর্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়ান জিনিষের স্থান অপেক্ষাকৃত সুলভ জাপানি জিনিষ অধিকার না করিয়াছে। প্রতিদ্বন্দিতার অভাবে, ভাল জিনিষেও জাপান কতকটা সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু যখন বিলাত হইতে উৎকৃষ্টতর জিনিষের আমদানি আরম্ভ হইবে, তখন সেই ভীষণ প্রতিযোগিতার মুখে জাপানি জিনিস যে বেশীদিন সমাদৃত বা ব্যবহৃত হইবে তাহা ঘোর সন্দেহের বিষয়।

আলোচ্যবর্ষে ইউনাইটেডষ্টেটসের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের মুল্য ছিল তিনকোটি ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড। পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা শতকরা সত্তর টাকা বাড়িয়াছিল, ও যুদ্ধের পূর্ব্বের সময়ের সহিত তুলনা করিলে একশত টাকার স্থানে বাড়িয়া দুশ একত্রিশ টাকা হইয়াছিল। উক্ত দেশ হইতে আমদানির মুল্য ছিল এককোটি দশলক্ষ পাউণ্ডের ও অধিক, ও তাহার অর্দ্ধেক ছিল ধাতু ও খনিজ তৈল। লোহা ও ইস্পাতের আমদানির ওজন যুদ্ধ পূর্ব্ব সময়ের অপেক্ষা প্রায় আড়াইগুণ বাড়িয়াছিল। যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন বিলাত হইতে আমদানি কমিয়া যাওয়াতেই ইউনাইটেডষ্টেটস্ এই সুযোগে ভারতের সহিত

বাণিজ্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। ১৯১৯ সালে এপ্রেল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই নয় মাসে ইউনাইটেডষ্টেটস হইতে লোহার জিনিষ ছুড়ি কাঁচি ছাড়া। সাত লক্ষ পাউণ্ড আমদানি হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরে নয় মাসে ইহার অর্দ্ধেক মাত্র হইয়াছিল। বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদির আমদানি দ্বিগুণ হইয়াছিল, ও নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইয়া কলের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের আমদানি দ্বিগুণ ও লোহা ও ইস্পাতের কল প্রভৃতির আমদানি, চতুর্গুণ হইয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়ার সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য আলোচ্য বর্ষে ষাটলক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল তন্মধ্যে আমদানির মূল্য দশ লক্ষ পাউণ্ড ও রপ্তানির মূল্য পঞ্চাশলক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা এবৎসর শতকরা আটচল্লিশ টাকা বাড়িয়াছিল। আমদানি কাঁচা পশম, শূকর মাংস, মোরব্বা প্রভৃতি খাদ্য। রপ্তানির মধ্যে পাটের বস্তা ও তিসি সরিষা বাড়িয়াছিল, কিন্তু চা ও চাল কমিয়াছিল। কানেডার সহিত বাণিজ্যে চার রপ্তানি এককোটি পাঁচলক্ষ সের হইতে পাঁচলক্ষ সেরে কমিয়া গিয়াছিল। মরিসস্‌ন হইতে চিনির আমদানি হইয়াছিল সাতাত্তর হাজার টন, এস্থলে পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা প্রায় আড়াই গুণ বাড়িয়াছিল।

আমদানি সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে মোট এগার কোটি ত্রিশলক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে, লোহা ও ইস্পাতের মূল্য শতকরা ষাট টাকা ও সুতার মূল্য শতকরা দুইশত ছয় টাকা বাড়িয়াছিল ও রেশমের বস্ত্রাদি, কাঁচা তুলা, গম, রেলসংক্রান্ত দ্রব্যাদির আমদানিও বাড়িয়াছিল, কিন্তু কেরোসিন তৈল, বিলাতী দেশালাই ও কাষ্ঠের আমদানি কমিয়াছিল। সুতার কাপড়ের আমদানি বাড়িয়াছিল। যুদ্ধকালীন পাঁচ বৎসরের প্রতিবর্ষে সুতার কাপড়ের আমদানির মূল্য যুদ্ধ পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে গড়ে বার্ষিক আমদানির মূল্যের প্রায় সমানই হইয়াছিল, কিন্তু মালের পরিমাণ শতাংশের ত্রিশ অংশ কমিয়া গিয়াছিল। কোরা কাপড়ের আমদানির মূল্য শতকরা আটাশ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছিল, ও এককোটি ষাটলক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল, কিন্তু রঙ্গীন কাপড়ের আমদানির মূল্য সিকির ও অধিক কমিয়াগিয়াছিল ও আশিলক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল। সাদা কাপড়ের আমদানির শতাংশের ছিয়ানব্বই অংশ বিলাত হইতে আসিয়াছিল। যদিও জাপান হইতে আমদানি পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা শত গুণ বাড়িয়াছিল, কিন্তু উহা সমগ্র আমদানির শতাংসের চার অংশেরও কমছিল। কিন্তু বিলাত হইতে কাপড়ের আমদানি কমিয়া গিয়া পূর্ব্ববর্ষে শতাংশের সাতাশি অংশ হইতে চৌষট্টি অংশে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু জাপান হইতে কোরা কাপড়ের আমদানি শতাংশের দ্বাদশ অংশ হইতে পঁয়ত্রিশ অংশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। জাপান হইতে রঙ্গিন কাপড়ের আমদানি প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল

ও শতাংশের নয় অংশে উঠিয়াছিল। সুতার কাপড়ের আমদানির তালিকা দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে বিলাত শতাংশের সাতাত্তর অংশ ও জাপান শতাংশের একুশ অংশ অধিকার করিয়াছিল। সুতার আমদানি ছিল এককোটী নব্বই লক্ষ সের, পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা ঠিক দ্বিগুণ কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা কুড়িলক্ষসের অধিক আমদানি হইত। অন্যান্য বিদেশ হইতে মোটা সুতার আমদানি, যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহা হইত, তাহা অপেক্ষা প্রায় ছয়গুণ বাড়িয়াছিল, কিন্তু এদেশের কল সমূহে মোটা সুতা কিঞ্চিৎ কম প্রস্তুত হইয়াছিল। সরু সুতার আমদানি ও বৃদ্ধি হইয়াছিল ও দেশীয় কল সমূহেও উহা অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু জাপান হইতে সুতার আমদানি বাড়িয়া এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ সের পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। সমগ্র সুতার আমদানির মধ্যে জাপান শতাংশের বায়াত্তর অংশ অধিকার করিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষে মোটে বিশলক্ষ সের সুতা জাপান হইতে আসিয়াছিল ও উহা সমগ্র সুতার আমদানির মধ্যে শতাংশের বাইশ অংশ অধিকার করিয়াছিল। বিলাত হইতে আমদানি কমিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষে বিলাতী আমদানি ছিল পঁচাত্তর লক্ষসের ও সমগ্র আমদানির মধ্যে উহা শতাংশের সাতাত্তর অংশ ছিল। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে উহা কমিয়া পয়তাল্লিশ লক্ষ সেরে নামিয়া গিয়াছিল ও উহা সমগ্র আমদানির সিকি অংশ মাত্র হইয়াছিল।

আমদানির তালিকায় সুতা ও সুতার কাপড়ের নিম্নে চিনির স্থান। সৌভাগ্যের বিষয় পূর্ব্ববর্ষে চিনির আমদানি হইয়াছিল পাচলক্ষ টনের ও বেশী, ও তৎপূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা শতাংশের আটঅংশের ও অধিক ছিল। চিনির আমদানি যবদ্বীপ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। আলোচ্যবর্ষে যবদ্বীপ হইতে তিনলক্ষ ছত্রিশ হাজার টন, ও মরিসস হইতে সাতাত্তর হাজার টন চিনি আসিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষে মরিসস হইতে বত্রিশ হাজার টন আমদানি হইয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষে ভারতবর্ষে ইক্ষুজাত চিনির পরিমাণ ছিল বত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন। আলোচ্য বর্ষে উহা কমিয়া বাইশলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টনে পরিণত হইয়াছিল। এই কমতির পরিমাণ শতাংশের উনত্রিশ অংশ। ইহার কারণ দুর্ব্বোধ্য কেননা ইক্ষুর চাষের জমি পূর্ব্ববর্ষে ছিল বিশলক্ষ একত্রিশ হাজার একার, ও আলোচ্যবর্ষে বিশলক্ষ বিরাশি হাজার একার, অর্থাৎ একহাজার একার বাড়িয়াছিল। যুদ্ধারম্ভ হইতে এক্ষণে কিউবা দ্বীপেই ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইক্ষু জন্মিতেছে।

লোহা ও ইস্পাতের আমদানি পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা প্রায় পাচ অংশের এক অংশ বাড়িয়াছিল। ইহা ছিল একলক্ষ একাশি হাজার টন। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণে

আমদানি হইত ইহা তাহার সিকিরও কম। বিলাত হইতে সাতাত্তর হাজার টন আইসে। পূর্ব্ব বর্ষেও এই পরিমাণে আমদানি ছিল। ইউনাইটেডষ্টেটস হইতে পূর্ব্ববর্ষে তেষট্টি হাজার টন আসিয়াছিল। আলোচ্যবর্ষে উহা বাড়িয়া ছিয়াত্তর হাজার টনে উঠিয়াছিল। জাপান হইতে আমদানি পূর্ব্ববর্ষে চারহাজার টন ছিল। আলোচ্যবর্ষে উহা বাড়িয়া পনর হাজার টনে উঠিয়াছিল। রেলওয়ে সংক্রান্ত এনজিন গাড়ী প্রভৃতি আমদানি ১৯১৮-৯ সালে পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা শতাংশের মধ্যে সত্তর অংশ বাড়িয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণে আমদানি হইত এখনও তাহা অপেক্ষা শতাংশের মধ্যে আশী অংশ কম ছিল। রেলওয়ে সংক্রান্ত আমদানির শতকরা পঁচানব্বই অংশ বিলাত অধিকার করিয়াছিল। পিত্তলের আমদানি কিন্তু বড়ই কমিয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতিবর্ষে গড়ে বার হাজার ছয় শত টন আসিত। আলোচ্যবর্ষে মোটে দুই হাজার নয় শত টন ও তাহার পূর্ব্বে দুই হাজার চারশত টন মাত্র আসিয়াছিল। জাপান হইতে আলোচ্যবর্ষের পূর্ব্ব বৎসরে পিত্তলের আমদানির শতাংশের মধ্যে আশী অংশ আসিয়াছিল। গত বৎসর কিন্তু তাহা কমিয়া ছাপ্পান্ন অংশে দাঁড়ায়। অপর দিকে বিলাতের অংশ নয় হইতে উনিশে ও অষ্ট্রেলিয়ার অংশ চার হইতে সতরয় উঠিয়াছিল কল ও যন্ত্রাদির আমদানির মধ্যে তুলা ও কাপড়ের কল সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি বয়লার ও বৈদ্যুতিক কল ও সরঞ্জামই অধিক আসিয়াছিল। এই বর্ষে ইউনাইটেডষ্টেটসের ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সিল্কের আমদানি কিঞ্চিৎ কমিয়া ছিল। শতাংশের দুই অংশ ছাড়া বাকি সবই চীন ও জাপান হইতে আসে। খনিজ তৈলের আমদানির তালিকায় দেখা যায় যে যে তৈল কাঠের কয়লার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় তাহার আমদানি ১৯১৭-১৮ সালে দেড় কোটি গ্যালন হইয়াছিল। আলোচ্যবর্ষে উহা বাড়িয়া দুই কোটি সত্তর লক্ষ গ্যালন হইয়াছিল। কলের অংশে ও চাকায় যে তৈল ব্যবহৃত হয়, তাহার আমদানি দেড়কোটী গ্যালন হইতে এককোটী নব্বই লক্ষ গ্যালনে উঠিয়াছিল। কিন্তু কেরোসিন তৈলের আমদানি তিনকোটী দশলক্ষ গ্যালন হইতে কমিয়া এককোটী ত্রিশ লক্ষ গ্যালনে পরিণত হইয়াছিল। কেরোসিন তৈলের আমদানি কমিয়া যাইবার কারণ এদেশে পাঠাইবার জন্ম জাহাজের অসুবিধা ও মূল্যাধিক্য। ইউনাইটেডষ্টেটস হইতে পূর্ব্ব বর্ষে দুইকোটী ত্রিশ লক্ষ গ্যালন আসিয়াছিল। এ বর্ষে মোটে এককোটী গ্যালন আসিয়াছিল। পূর্ব্বে পারস্য হইতে ও অনেক পরিমাণে কেরোসিন তৈল আসিত, কিন্তু এবর্ষে সে পরিমাণে আসে নাই। তবে কাট ও কয়লার কাজের জন্ম যে তৈল ব্যবহার হয়, পারস্য হইতে সেই তৈলের আমদানি অনেক বাড়িয়াছিল। মদের আমদানিতে জাপান সর্ব্বোচ্চ স্থান

১২

অধিকার করিয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষে সমগ্র মদ আমদানির শতাংশের আটচল্লিশ অংশ অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক জাপান হইতে আসিয়াছিল। আলোচ্যবর্ষে আটচল্লিশের স্থানে ষাট হইয়াছিল। পূর্ব্বেও আর একবার এইরূপ হইয়াছিল। বিলাত হইতে মদের আমদানি শতাংশের পয়তাল্লিশ অংশ হইতে তেত্রিশে কমিয়া গিয়াছিল। এদেশীয় মদের ভাঁটীগুলিতে আশি লক্ষ গ্যালন মগু প্রস্তুত হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষের অপেক্ষা প্রায় এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল। লৌহের জিনিষের আমদানির তালিকায় দেখা যায় যে বিলাত হইতে আমদানি শতাংশের একচল্লিশ অংশ হইতে কমিয়া ছত্রিশে দাঁড়ায় ও ইউনাইটেডষ্টেসের অংশ আটাশ হইতে একত্রিশে ও জাপানের অংশ পঁচিশ হইতে উনত্রিশে উঠে। কাগজ ও পিজবোডের আমদানির সিকি অংশ জাপান হইতে আসিয়াছিল কিন্তু বিলাত হইতে আমদানি শতাংশের ছাব্বিশ অংশ হইতে কমিয়া বিংশে নামিল। ইউনাইটেডষ্টেটসের অংশ কিন্তু নয় হইতে বাইশ অংশে উঠিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষে কাষ্ঠ হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার মণ্ড তিন হাজার ছয়শত টন আমদানি হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে তাহা কমিয়া দুই হাজার একশত টনে নামিয়া গিয়াছিল। এদেশে কাগজের কলের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই মণ্ড আমদানিও কমিতে থাকিবে সন্দেহ নাই। যাহাতে দেশে প্রচুর কাগজ তৈয়ারি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ মনোযোগী আছেন। বাঁশ হইতে কাগজের মণ্ড বাহির করিয়া কাগজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে ব্রহ্মদেশে একটী কল স্থাপিত হইতেছে যাহা দ্বারা প্রতি বর্ষে দশ হাজার টন মণ্ড সরবরাহ হইতে পারিবে।

লবণের আমদানি পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে সিকি মাত্রায় বাড়িয়াছিল। যত লবণ বিদেশ হইতে আসিয়াছিল, তাহার অর্দ্ধেক আসিয়াছিল মিসর হইতে। বিলাত হইতে লবণের আমদানী পূর্ব্ব বর্ষের দ্বিগুণ হইয়াছিল, চল্লিশ হাজার টন। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহার চতুর্গুণেরও অধিক হইত। ভারতজাত লবণ ১৩ লক্ষ টন হইতে ১৭ লক্ষ টনে উঠিয়াছিল। খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানি সম্বন্ধে দেখা যায় যে অষ্ট্রেলিয়ার ভাগ পূর্ব্ববর্ষে শতাংশের বান্নান্ন অংশ অর্থাৎ অর্দ্ধেকেরও অধিক হইতে সাঁইত্রিশ অংশে নামিয়া গিয়াছিল ও জাপানের অংশ চৌত্রিশ হইতে আট চল্লিশে উঠিয়াছিল।

রপ্তানির কথা।

১৯১৮-১৯ সালে রপ্তানির তালিকা হইতে দেখা যায় যে পূর্ব্ব বর্ষের তুলনায় খাদ্য শস্যের রপ্তানির মূল্য নব্বই লক্ষ পাউণ্ড, ও কাঁচা তুলা রপ্তানির মূল্য আশি লক্ষ পাউণ্ড কমিয়াছিল, কিন্তু একমাত্র পাটের জিনিষের রপ্তানির মূল্য পঁয়ষট্টি লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়াছিল, ও তিসি সরিষা তিল প্রভৃতি, কাঁচা ও তৈয়ারি ছাল, তৈয়ারি চামড়া, কাঁচা পশম ও তৈল এগুলির রপ্তানিও বাড়িয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানির তালিকা নিম্নে টাকার হিসাবে পরে পরে দেওয়া হইল।

(১) কাঁচা পাট ও পাটের তৈয়ারি জিনিস।

(২) কাঁচা ও তৈয়ারি তুলা।

(৩) চাল, ডাল, কড়াই ময়দা প্রভৃতি।

(৪) চামড়া ও ছাল কাঁচা ও সংস্কৃত।

(৫) চা

(৬) তিসি, সরিষা, তিলাদি।

আলোচ্য বর্ষে সমগ্র রপ্তানির মূল্য ছিল প্রায় ষোল কোটী পাউণ্ড। পূর্ব্ব বর্ষে তুলাই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু এ বৎসর পাট সেই পদে উঠিল। কাঁচা পাটের রপ্তানির মূল্য ছিল ছিয়াশি লক্ষ পাউণ্ড আর পাটের তৈয়ারি মালের মূল্য ছিল সাড়ে তিন কোটী পাউণ্ড। ইতি পূর্ব্বে এত অধিক টাকার পাট ও পাটের জিনিষ কখন রপ্তানি হয় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে সমগ্র রপ্তানির শতাংশের উনিশ অংশ মাত্র পাট অধিকার করিত। ১৯১৭-১৮ সালে উহা বাড়িয়া শতাংশের একুশ অংশে ও আলোচ্যবর্ষে সাতাশ অংশে উঠিয়াছিল। সমগ্র রপ্তানির মধ্যে একা পাটের তৈয়ারি জিনিষই সমগ্র রপ্তানির বাইশ অংশ ছিল, ও পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা প্রায় সিকি বাড়িয়াছিল। কাঁচা পাটের রপ্তানির মূল্যও দ্বিগুণ হইয়াছিল ও পরিমাণে ছিল চারিলক্ষ টন। ১৯১৮ সালের এপ্রিল হইতে আট মাসের মধ্যেই রপ্তানির পরিমাণ পঞ্চাংশের চার অংশ বাড়িয়াছিল, কিন্তু পরে চারিমাসে যুদ্ধ স্থগিত হওয়ার দরুণ পূর্ব্ববর্ষের ঐ চারমাসের সহিত তুলনায় মোটে শতাংশের তিন অংশ মাত্র বাড়িয়াছিল। কাঁচা পাট পূর্ব্ববর্ষে সমগ্র রপ্তানির সিকি অংশ মাত্র বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল। আলোচ্যবর্ষে অর্দ্ধেকেরও অধিক ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে গিয়াছিল। যুদ্ধের আগে সাম্রাজ্যের অংশ ছিল শতাংশের চল্লিশ অংশ। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে পরিমাণে পাট জন্মিত তাহার অর্দ্ধেক দেশীয় পাটের কল গুলিতে খরচ হইত, কিন্তু গতবর্ষে শতাংশের সত্তর

অংশ দেশীয় কলের কাজে লাগিয়াছিল। দেশে সর্ব্বসমেত ৭৬টি পাটের কল ছিল। এই কল গুলিতে চল্লিশ হাজার তাঁত ও আটলক্ষ টেকো ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধের পূর্ব্বে দেশে চৌষট্টিটি কল ও ছত্রিশ হাজার তাঁত ও সাতলক্ষ টেকো ছিল। পাটের তৈয়ারি জিনিষ ইহার পূর্ব্বেও একবার রপ্তানির শীর্ষ স্থান লাভ করিয়াছিল। যদিও এবার পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা মালের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির দরুণ টাকা বাড়িয়াছিল। পাটের বস্তা যাহা রপ্তানি হইয়াছিল. তাহা ওজনে একশত মণে ছয়মণ হিসাবে কমিয়াছিল কিন্তু দামে শতকরা পনর টাকা বাড়িয়াছিল। গমের রপ্তানির ওজন শতকরা পাঁচের অনুপাতে কমিয়াছিল, কিন্তু মূল্য শতকরা উনত্রিশ টাকা বাড়িয়াছিল।

তুলা ও তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানির মূল্য পূর্ব্ববর্ষের তুলনায় শত করা উনিশ টাকা হিসাবে কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখনও যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থার সহিত তুলনায় বৃদ্ধি ছিল। পূর্ব্ববর্ষে তিনলক্ষ পঁয়ষট্টি মণ কাঁচা তুলা রপ্তানি হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে উহা কমিয়া একলক্ষ চোরশি হাজার টনে নামিয়া গিয়াছিল। ১৯০১ সালে বটে কাঁচা তুলার রপ্তানি এত কমিয়া গিয়াছিল। কাঁচা তুলার সমগ্র রপ্তানির মূল্য দুইকোটি দশলক্ষ পাউণ্ড। ফসল পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম হইয়াছিল। এই সমস্ত রপ্তানির মধ্যে একা জাপানই শতাংশের ছিয়াত্তর অংশ লইয়াছিল ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যস্থ অন্যান্য দেশে মোটে নয় অংশ রপ্তানি হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে কাঁচা তুলা শতাংশের ছয় অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ও জাপানে বিয়াল্লিশ অংশ ছিল। কলের সুতার রপ্তানি কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষের তুলনায় সমগ্র রপ্তানির ওজন শতাংশের সাত চল্লিশ অংশ কমিয়া গিয়াছিল। যে সমস্ত বিদেশে ইহা চালান হইত তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই খুব কম কম লইয়াছিল। চীন দেশে ১৯১৭-১৮ সালে পাঁচ কোটি দশলক্ষ সের রপ্তানি হইয়াছিল। গত বর্ষে উহা কমিয়া দুইকোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সেরে নামিয়া গিয়াছিল। এদেশ-জাত সুতার কাপড়ের রপ্তানি হইয়াছিল চৌদ্দকোটি নব্বইলক্ষ গজ। যদিও ইহা যুদ্ধের পূর্ব্বের সময়ের সহিত তুলনায় শতকরা পঁয়ষট্টির অনুপাতে বাড়িয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্ব বর্ষের তুলনায় শতকরা একুশের অনুপাতে কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মাল কম যাইলেও মূল্যবৃদ্ধির দরুণ টাকায় প্রায় তেরলক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়াছিল। এ বৎসর দেশজাত কাপড় জন্মিয়াছিল চৌত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষগজ। যুদ্ধ পূর্ব্ব সময়ের সহিত তুলনায় যদিও শতকরা একত্রিশের অনুপাতে বাড়িয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনায় শতকরা দশের অনুপাতে কমিয়া গিয়াছিল। চাল ডাল ও অন্যান্য খাদ্য শস্যাদি ও ময়দার রপ্তানির তালিকায় দেখা যাইতেছে যে বৎসরের প্রথম ছয় মাস

যুদ্ধ হেতু বিলাতে ও মিত্রদেশ গুলিতে খাদ্য যোগাইবার জন্য বেশ রপ্তানি চলিতেছিল। কিন্তু বর্ষের শেষভাগে সুবৃষ্টি অভাবে ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়াতে দেশে খাদ্যের অনটনের সম্ভাবনা দেখিয়া বিলাতের ও মিত্র দেশগণের কোন ক্ষতি না করিয়া ও রপ্তানি বন্ধ করা সম্ভবপর হইয়াছিল। ১৯১৮ সালের নবেম্বর মাস হইতে যাহা কিছু রপ্তানি হইয়াছিল তাহা কেবল বিদেশে যেযে স্থানে ভারতবর্ষীয়গণ বসবাস করিতেছে, ও যাহারা ভারতবর্ষ হইতেই তাহাদিগের খাদ্য চাল ডাল ময়দা প্রভৃতি বরাবর পাইয়া আসিতেছে, সেই সব দেশেই পাঠান হইয়াছিল। এই জন্য যদিও বর্ষের প্রথমার্দ্ধ সাড়েবারলক্ষটন চাল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল বর্ষের শেষার্দ্ধে মোটে সওয়ালক্ষ টন্ চাল রপ্তানি হইয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষের শেষার্দ্ধে যাহা রপ্তানি হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনায় শতকরা পঁয়ত্রিশের অনুপাতে হ্রাস হইয়াছিল। গমের রপ্তানি বর্ষের শেষার্দ্ধে হইয়াছিল ত্রিশ হাজার টন। পূর্ব্ব বর্ষের শেষার্দ্ধের সহিত তুলনায় শতকরা বিরানব্বই এর অনুপাতে কমিয়া গিয়াছিল। অন্যান্য খাদ্যোপযোগী শস্যের রপ্তানিও অনেক কমিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনায় অর্দ্ধেকের ও অধিক কমিয়া গিয়াছিল। চালের রপ্তানি হইয়াছিল কুড়িলক্ষ টন। পূর্ব্ব বর্ষের তুলনায় কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ পূর্ব্ব সময়ের সহিত তুলনায় শতকরা ষোলর অনুপাতে কম ছিল। ব্রহ্ম দেশ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাল রপ্তানি হইয়াছিল। সমগ্র চাল রপ্তানির শতাংশের আশি অংশ একা এই দেশ হইতেই গিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষে রপ্তানি চালের শতাংশের সত্তর অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে চালান হইয়াছিল। এবর্ষে শতাংশের পঞ্চান্ন অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল। মিত্র দেশ সমূহ পূর্ব্ববর্ষে শতাংশের চতুর্দ্দশ অংশ লইয়াছিল, এবারে তাহারা শতাংশের উনত্রিশ অংশ লইয়াছিল। জাপান, ফ্রান্স ও ইউনাইটেডষ্টেটসে অনেক অধিক চাল রপ্তানি হইয়াছিল। জাপানে আলোচ্য বর্ষে চাল বেশী জন্মায় নাই। সেইজন্য পূর্ব্ববর্ষাপেক্ষা পাঁচগুণ চাল উক্ত দেশে রপ্তানি হইয়াছিল ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল দুই লক্ষ ছয় হাজার টন। পূর্ব্ববর্ষে বিলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাল রপ্তানি হইয়াছিল। আলোচ্যবর্ষে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র বিলাতে চালান হইয়াছিল। গমের রপ্তানি হইয়াছিল প্রায় পাঁচলক্ষ টন, পূর্ব্ববর্ষের সহিত তুলনায় অর্দ্ধেকেরও অধিক কমিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক রপ্তানি হইত। ১৯১৮ সালে গমের ফসল মন্দ হয় নাই, কিন্তু এদেশে অন্যান্য খাদ্য শস্য ভাল না জন্মাতে গমের রপ্তানি কমিয়া গিয়াছিল ও বর্ষের শেষ ভাগে অতি অল্প পরিমাণেই রপ্তানি হইয়াছিল। এই সময় অষ্ট্রেলিয়াদেশে গম খরিদের বন্দবস্ত করা হইয়াছিল। ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে অষ্ট্রেলিয়া হইতে পঞ্চান্ন হাজার টন ও

তাহার পরের মাসে একলক্ষটন গম আমদানি হইয়াছিল। ছোলা বুট কলাই প্রভৃতির রপ্তানি হইয়াছিল আড়াই লক্ষ টন। পূর্ব্ববর্ষে অধিক রপ্তানি হইয়াছিল। যবের রপ্তানি শতকরা সাইত্রিশের অনুপাতে কমিয়া গিয়াছিল।

তৈয়ারি চামড়ার রপ্তানি ঢের বাড়িয়াছিল, কিন্তু কাঁচা চামড়ার রপ্তানি কমিয়া গিয়াছিল, কারণ এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত উহা চালান নিষিদ্ধ ছিল। কাঁচা চামড়া উনিশ হাজার টন রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার মধ্যে চারি ভাগের তিন ভাগ গরুর চামড়া। কিন্তু গরুর চামড়ার রপ্তানি ও পূর্ব্ববর্ষের তুলনায় এক হাজার টন কমিয়া গিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানি হইয়াছিল বিলাতে ও ইটালী দেশে। কাঁচা ছালের রপ্তানি কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছিল ও পঁচিশ হাজার টন হইয়াছিল। ইহার বার আনা ইউনাইটেডষ্টেটসে প্রেরিত হইয়াছিল। তৈয়ারি চামড়ার রপ্তানি হইয়াছিল পঁচিশ হাজার টন, পূর্ব্ববর্ষ অপেক্ষা শতকরা উনচল্লিশের অনুপাতে বাড়িয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে যাহা রপ্তানি হইত তাহা অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বাড়িয়াছিল। ইহা প্রায় সমস্তই বিলাতে চালান হইয়াছিল। যুদ্ধে প্রয়োজনের জন্য ভারতবর্ষে গরুর চামড়া সংস্কৃত করণের ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। চায় রপ্তানি হইয়াছিল যোল কোটী কুড়িলক্ষ সের। পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনায় শতকরা দশের অনুপাতে কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ পূর্ব্ব সময়ে যাহা রপ্তানি হইত তাহা অপেক্ষা শতকরা একুশের অনুপাতে বাড়িয়াছিল। বিলাতে, আসিয়াস্থ তুরস্কে (মেসোপটেমিয়া) ও পারস্যেই অধিক রপ্তানি হইয়াছিল। কিন্তু ইউনাইটেড'ষ্টটস, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডার রপ্তানি অনেক কমিয়া গিয়াছিল ও রুসিয়াতে রপ্তানি একেবারেই বন্ধ হইয়াছিল। যবদ্বীপে জাত চার প্রতিযোগিতার ফলে কানাডা ও ইউনাইটেডষ্টেটসে রপ্তানি কমিয়া মোটে পনর লক্ষ সের হইয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষে ওই সব দেশে রপ্তানি হইয়াছিল দুই কোটী দশ লক্ষ সের। বিদেশ হইতে অষ্ট্রেলিয়ায় চার আমদানি নিষেধ ১৯১৯ সালের মে মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাহাল থাকাতে উক্ত বর্ষের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত এই এগার মাসে চার আমদানি উক্ত দেশে এত কমিয়া গিয়াছিল, যে তাহা পূর্ব্ব বর্ষের তুলনায় বারভাগের এক ভাগ অপেক্ষা ও কম হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষে চীন ও লঙ্কা হইতে পচিশ লক্ষ সের চা ভারতে আমদানি হইয়াছিল। আলোচ্যবর্ষে উহা বাড়িয়া পঞ্চাশ লক্ষ সের হইয়াছিল। তৈল-প্রদ শস্যাদির মধ্যে চীনের বাদাম নারিকেলের খোবরা ও তিলের ও এবৎসর রপ্তানি কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিসি ও রাই সরিষার রপ্তানি বাড়িয়াছিল। এই সব দ্রব্যের বিলাতে চালান বাড়িয়াছিল। সমগ্র রপ্তানি হইয়াছিল পাচলক্ষ টনেরও কম, ও যুদ্ধ পূর্ব্ব সময়ের রপ্তানির প্রায় তৃতীয়াংশ

মাত্র। সমগ্র রপ্তানির মধ্যে তিসি শতাংশের ষাট অংশ। পূর্ব্ববর্ষে মোটে বত্রিশ অংশ হইয়াছিল। এরণ্ডের রপ্তানি পূর্ব্ববর্ষে ছিল শতাংশের সত্তর অংশ, কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ষে শতাংশের একুশ অংশ হইয়াছিল। রাই সরিষা ও তিলের রপ্তানি শতাংশের সত্তর অংশ হইয়াছিল পূর্ব্ববর্ষে শতাংশের ষোল অংশ হইয়াছিল। চীনের বাদাম পূর্ব্ববর্ষে সমগ্র রপ্তানির সিকি হইয়াছিল। এবৎসর কমিয়া শতাংশের চার অংশে নামিয়া গিয়াছিল। তিসি ঢেঁড়ি ও রাই সরিষার রপ্তানি বিলাতেই অধিক হইয়াছিল। তৈল রপ্তানির তালিকায় দেখা যায় যে নারিকেল তৈল, তিসির তৈল ও খনিজ তৈলের রপ্তানি বাড়িয়াছিল কিন্তু রেড়ীর তৈলের রপ্তানি কমিয়াগিয়াছিল। লঙ্কাদ্বীপ হইতে বহুপরিমাণে নারিকেলের খোবরা ভারতবর্ষে আনীত হইয়া তৈলে পরিণত হইয়া থাকে। আলোচ্যবর্ষে নারিকেল তৈলের রপ্তানি হইয়াছিল সত্তর লক্ষ গ্যালন; ইহার পূর্ব্ববর্ষে হইয়াছিল ত্রিশ লক্ষ গ্যালন। ১৯১৮ সালে ভারতবর্ষে ও ব্রহ্ম দেশে পেট্রলিয়ম তৈল হইয়াছিল আটাশ কোটী ষাটলক্ষ গ্যালন। ধাতু ও খনিজ অপরিষ্কৃত ধাতুর রপ্তানির মধ্যে এক ম্যাংগানিসই শতাংশের সাতাশি অংশ দখল করিয়াছিল। ইহা একপ্রকার লৌহবৎ ধাতু। এবৎসর চারলক্ষ টন ম্যানগানিস রপ্তানি হইয়াছিল ও তাহার মধ্যে শতাংশের সাতাত্তর অংশ বিলাতে চালান হইয়াছিল। ক্রোম লৌহের অপরিস্কৃত অবস্থায় রপ্তানি, যাহা রংএর কাজে লাগে, ১৯১৬-৭ সালে ছিল ছয় হাজার টন, পরবর্ষে পনর হাজার টন ও আলোচ্য বর্ষে হইয়াছিল চল্লিশ হাজার টন। বিলাতে অধিক রপ্তানিই ইহার কারণ। টাটা কোম্পানির লোহার কারখানা ও বেঙ্গল আয়রণ ও ষ্টিল কোম্পানির কারখানা হইতে এবৎসর সাতলক্ষ একাশি টন লোহা প্রস্তুত হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষ অপেক্ষা পঞ্চাশ হাজার টন ও যুদ্ধ পূর্ব্ব সময়ের তুলনায় পৌনে পাঁচলক্ষ টন বাড়িয়াছিল।

সীমান্ত প্রদেশেরসহিত বাণিজ্য।

ভারতবর্ষের উত্তরে সাতহাজার মাইল সীমানা আছে ও তাহা অতিক্রম করিয়া সন্নিহিত দেশগুলির সহিত বাণিজ্য চলিয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই বাণিজ্যের মূল্য যাহা ছিল এক্ষণে তাহা শতাংশের তেষট্টি অংশ অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও উহার মূল্য দুই কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ডে উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে শান দেশের সহিত বাণিজ্যও ধরা হইয়াছে। ইহার মূল্য হইয়াছিল প্রায় এক চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড, কিন্তু পূর্ব্ব বর্ষে ইহারও অধিক হইয়াছিল। এই বাণিজ্য প্রধানতঃ বর্ম্মা মাইনস্

কোম্পানির খনিজ পদার্থের উপর প্রতিষ্টিত। বস্তুতঃ শান দেশ হইতে অনেক টাকার ধাতু বর্ম্মায় আসিয়া থাকে। রূপা আসিয়াছিল প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু অন্যান্য ধাতু বর্ম্মায় কমই আসিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে সমস্ত সীমান্ত দেশের মধ্যে নেপালের সহিত বাণিজ্যই সর্ব্বপ্রধান ছিল। নেপাল হইতে প্রধান আমদানি চাল। তাহার পরিমাণছিল আলোচ্যবর্ষে দুলক্ষ সাতাশ হাজার টন্ ও পূর্ব্ববর্ষে দুলক্ষ একুশ হাজার টন। ইহার মধ্যে একলক্ষ আশি হাজার টন বেহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে গিয়াছিল। আফগানিস্থানের সহিত বাণিজ্যের মূল্য বত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল। মধ্য আসিয়া, পশ্চিম চীন, তিব্বত, সিকিম, পারস্য ও শ্যাম দেশের সহিত ও বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। এককোটি চল্লিশ লক্ষ সের কাঁচা পশম সীমানা পারে প্রেরিত হইয়াছিল। আফগানিস্থান হইতে ভারতবর্ষে আমদানি যুদ্ধ পূর্ব্ব সময়ের সহিত তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ বাড়িয়াছিল ও পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা শতকরা সাতের অনুপাতে বাড়িয়াছিল।

ভারতবর্ষের আন্তর্দ্দেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে রেলওয়ে ও ষ্টীমার কোম্পানির দপ্তরেরও রেজিষ্ট্রী ও ডাক বিভাগের কাগজ পত্র হইতে যাহা জানা যায় তাহাতে দেখা যাইতেছে যে উহা ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য অপেক্ষা আড়াই গুণ বেশী। কিন্তু এই হিসাব ও সম্পূর্ণ নহে, কারণ ইহা হইতে আন্তর্দ্দেশিক বাণিজ্যের একটা অংশ একেবারেই বাদ পড়িয়া যায়। যেমন একই প্রদেশে এক ষ্টেশন হইতে অন্যষ্টেশনে মাল পাঠান। ইহারত কোন হিসাবই থাকে না। এই সব ধরিলে ভারতবর্ষের আন্তর্দ্দেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ আরও অধিক হইয়া পড়ে। আন্তর্দ্দেশিক আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ ছিল ছয় কোটি নব্বই লক্ষ টন ও মুল্য একাশিকোটি ত্রিশলক্ষ পাউণ্ড। পূর্ব্ব বর্ষে ছিল, আটষট্টি কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড। যুদ্ধের পূর্ব্বে পরিমাণ ছিল ছয় কোটি টন ও মূল্য চুয়ান্ন কোটি ষাট লক্ষ পাউণ্ড। পাঁচ বৎসরের মধ্যে আন্তর্দ্দেশিক বাণিজ্যের অতীব সন্তোষকর উন্নতি হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে সমুদ্রোপ-কূলস্থ বন্দর সমূহে গম, চা ছোলা, বুট কলাই ও কাঁচা তুলা কমই প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু চিনির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল ও চাল আর কাঁচা পাটও অধিক প্রেরিত হইয়াছিল। গমের চালান পাঁচ লক্ষ পঁচাশি হাজার টন হইয়াছিল, পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনায় অর্দ্ধেকের ও অধিক কমিয়া গিয়াছিল। পঞ্জাব হইতে চার লক্ষ টন বাহিরে গিয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনায় অর্দ্ধেকেরও অধিক কমিয়া গিয়াছিল। যুক্ত প্রদেশ হইতে চালান চার লক্ষ একুশ হাজার টন হইতে তিনলক্ষ চল্লিশ হাজার টনে নামিয়া গিয়াছিল। চাল কিছু বাড়িয়াছিল, কিন্তু ছোলা, ডাল কলাই কমিয়াগিয়াছিল।

উপকূল বাণিজ্যের হিসাবে দেখাযায় যে আলোচ্যবর্ষে উহার অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত দৌলত ও মাল বাদে আমদানি ও রপ্তানি দৌলত ও পণ্যদ্রব্যের মূল্যছিল দশকোটি ছচল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড। পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনায় শতকরা ত্রিশের অনুপাতে ও যুদ্ধপূর্ব্ব সময়ের সহিত তুলনায় শতকরা তেতাল্লিশের অনুপাতে বাড়িয়াছিল। কাঁচা তুলা ও তৈয়ারি সুতার কাপড়ের উপকূল যোগে রপ্তানি ষোল লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়াছিল। বস্তুতঃ সমুদ্রের উপকূলস্থ প্রত্যেক প্রদেশেরই বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। বোম্বাই এর বাণিজ্য শতকরা ত্রিশের অনুপাতে বাড়িয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ বর্ম্মা হইতে অধিক চালের আমদানি ও সিন্ধু প্রদেশ হইতে আমদানি সুতার কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি। বর্ম্মার বাণিজ্য শতকরা চল্লিশের অনুপাতে বাড়িয়াছিল, কারণ অধিক পরিমাণে চাল ও কেরোসিন তৈলের রপ্তানি ও পাটের বস্তার আমদানি। বঙ্গদেশের বাণিজ্য শতকরা বত্রিশের অনুপাতে বাড়িয়াছিল, কারণ পাটের জিনিষ ও চালের অধিক পরিমাণে রপ্তানিও কাঁচা তুলা,কেরোসিন তৈল ও টিক কাষ্ঠের আমদানি। মান্দ্রাজের বাণিজ্য ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড বাড়িয়াছিল কারণ অধিক পরিমাণে চাল, কেরোসিন তৈল ও পাকা সুতার আমদানি।

আলোচ্য বর্ষে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইউনাইটেড ষ্টেটস হইতে অধিক পরিমাণে রূপার আমদানি হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বসমেত তেইশকোটি সতর লক্ষ আউন্স আমদানি করিয়া ছিলেন, অর্থাৎ গত বর্ষাপেক্ষা তিন গুণ ও যুদ্ধ পূর্ব্বসময়ে আমদানি অপেক্ষা উনিশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট সম্পর্ক রহিত স্বর্ণের আমদানি কিন্তু কমিয়া গিয়াছিল। জাহাজের হিসাবে দেখাযায় যে জাহাজে ও দেশীয় নৌকা যোগে যে মাল চালান হইয়াছিল তাহার পরিমাণ এককোটি পাঁচলক্ষ টন। যুদ্ধ পূর্ব্ব সময়ে ইহার পরিমাণ দেড়গুণ অধিকছিল। জাহাজের মধ্যে শতকরা উনসত্তর ভাগ বিলাতি জাহাজ ছিল। পূর্ব্ববর্ষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইলে ও ভূমধ্যসাগরে যাত্রা নিষেধ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট সত্যই অনুমান করিয়াছিলেন যে এইবার বিলাতে ফিরিয়া আসিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইবেন ও তজ্জন্য যাত্রীদিগের জন্য অনেক জাহাজের প্রয়োজন হইবে। সুতরাং যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য বিশেষ বন্দবস্ত করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের সময় জাহাজের ভাড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে যাত্রীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল। বিলাতের গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করাতে ভাড়া শতকরা কুড়ি টাকা কমিয়া গিয়াছিল, ও দেড়া ভাড়ায় যাতায়াতের টিকিট পাইবার বন্দবস্ত করা হইয়াছিল। পি এণ্ড ও কোম্পানি ১৯১৯ সালে মার্চ্চমাসের প্রারম্ভেই এই ভাড়া কমাইবার বন্দবস্ত করিয়াছিলেন ও পর মাসে আরও ভাড়া কমিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উন্নতির ভিত্তি।

১৯১৯ সালের অবস্থা দেখিলে বুঝা যাইবে যে উহা ভারতবর্ষের আর্থিক কি নৈতিক উন্নতির পক্ষে অনুকূল ছিল না। দরিদ্রগণ দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার দরুন বিপদগ্রস্থ হইয়াছিল। সুতরাং দেশের সহজ অবস্থায় যেরূপ উন্নতি হওয়া সম্ভব, আলোচ্য বর্ষে তাহা না হইবারই কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই বৎসরে কি আর্থিক কি নৈতিক উভয় প্রকার উন্নতিই যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে যেরূপ দুর্ভিক্ষ হইয়া ছিল, ১৮৯৯-১৯০১ বর্ষে দুর্ভিক্ষের পর সেরূপ দুর্ভিক্ষ এপর্য্যন্ত কখনও হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের সাহায্যার্থ দেশের এক স্থান হইতে অন্যস্থান পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই বলেন, যে এই বিশেষ অভাব ও কষ্টের চিহ্ন ত কোথায় দেখিতে পান নাই। এই দারুণ মূল্য বৃদ্ধির দিনে সাধারণে যেরূপ ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত বিপদ অতিক্রম করিয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় ও কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আপ্লুত হইয়া যায়। প্রাদেশিক ফসলের রিপোর্টে ও এইকথা প্রকাশ হইতেছে। কোন প্রদেশেই এত মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই, যত হইয়াছিল মধ্যপ্রদেশে। কিন্তু সেখান হইতে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও দেখা যায় যে উক্ত প্রদেশের কোন স্থানেই ভীষণ কষ্ট হয় নাই ও কৃষিজীবিগণ কায় ক্লেশে একরকমে দিন কাটাইতে সমর্থ হইয়া ছিল। যুক্ত প্রদেশের রিপোর্টেও এই কথারই উল্লেখ হইয়াছে। প্রাদেশিক রিপোর্টগুলি পাঠে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহা যে অমূলক নহে তাহা একপ্রকার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, কেননা এবারকার দুর্ভিক্ষে যত বিপন্ন লোককে সাহায্য করার আবশ্যক হইয়াছিল, ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষে তাহা অপেক্ষা দশগুণেরও অধিক লোককে সাহায্য দান করিতে হইয়াছিল।

সর্ব্বদাই শুনা গিয়া থাকে যে ভারতবর্ষের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা দুঃসহ দারিদ্র্য ভারে প্রপীড়িত। কিন্তু গত দুর্ভিক্ষে তাহারা যে সেই বিপদ হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিয়া ছিল, তাহার হেতু উল্লেখ করা আবশ্যক। একটা কথা চলিয়া আসিতেছে যে ভারতবাসিগণের মাথাপিছু গড়ে প্রত্যেকের বার্ষিক আয় দুই পাউণ্ড অর্থাৎ কুড়ি হইতে ত্রিশ টাকা মাত্র। একথা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে গত দুর্ভিক্ষে দরিদ্রগণের উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব হইত। বস্তুতঃ এই বিশ ত্রিশ টাকা বার্ষিক আয়

সত্য কথা নহে। যখন এই হিসাব করা হইয়াছিল, তখন তাহার মধ্যে অনেক গলদ ছিল। যদি এই হিসাব নির্ভুল হইত, তাহা হইলেও দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ইহা হইতে একটি ভুল ধারণা উৎপত্তি হইত। বস্তুতঃ ভারতবাসিগণের গড়ে বার্ষিক আয় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে একটি কথা মনে রাখা উচিত ও তাহা এই যে ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি অধিবাসিগণের মধ্যে তিন কোটিরও কম সহরে বাস করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সাতাস কোটির সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা কেবল টাকার হিসাবে ঠিক করা যায় না। সত্য বটে পল্লীগ্রামে যাহারা বাসকরে, তাহাদিগের আয় টাকার হিসাবে খুব কমই বটে। কিন্তু কেবল টাকার হিসাবে তাহাদিগের অবস্থা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। তাহাদিগকে বাসস্থানের জন্য প্রায় কিছুই খরচ করিতে হয় না। তাহাদিগের নিজের ও পরিবারবর্গের পরিশ্রমের দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ হইয়া থাকে. তাহাদিগের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে অতি অল্প জিনিসই মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। তাহাদিগের টাকা হিসাবে আয় অপেক্ষা ব্যয় কম। কিন্তু এই অবস্থা ক্রমেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সহরে যাহারা শ্রমজীবি রূপে জীবন ধারণ করে, তাহাদিগের চাকরির টাকাই প্রায় একমাত্র সম্বল। সুতরাং দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইলে তাহাদিগের যেমন অভাব ও অনাটন হয়, পল্লীবাসিগণের ততটা হয় না। এই জন্যই সহরের শ্রমজীবিদিগের মধ্যে মজুরি বাড়াইবার জন্য আন্দোলন প্রায়ই হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাতন অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া শীঘ্রই নূতন অবস্থা আসিতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজীবিগণের ঋণ ও বৃদ্ধি হইতেছে ও তাহার আনুসঙ্গিক অনেক কুফলই দেখা দিতেছে। পঞ্জাবের কোঅপারেটীভ সোসাইটীর রেজিষ্ট্রার কৃষিজীবিগণের ঋণ বৃদ্ধি সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন যে বড় বড় জমীদারগণ যে পরিমাণে গবর্ণমেণ্টকে রাজস্ব দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের দেনা তাহার সপ্তগুণ। কিন্তু ছোট ছোট জমীদার যাহাদিগের পঁচিশ বিঘা জমী আছে বা যাহারা উক্ত পরিমাণে জমী কর্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের দেনা তাহাদিগের দেয় রাজস্ব অপেক্ষা আটাশ গুণ। সমগ্র পাঞ্জাবে কৃষিজীবিদিগের দেনার সমষ্টি তিন কোটি পাউণ্ড, অর্থাৎ ত্রিশ হইতে পয়তাল্লীস কোটি টাকা। অন্যান্য প্রদেশের সম্বন্ধে এরূপ তদন্ত হয় নাই, সুতরাং সে স্থানে কৃষিজীবিগণের দেনার পরিমান হিসাব করা হয় নাই। তবে ১৮৯৫ সালে মান্দ্রাজ প্রদেশ সম্বন্ধে ঐরূপ তদন্ত হইয়াছিল ও তদ্দ্বারা জানা গিয়াছিল যে তথায় উক্ত দেনার সমষ্টি ছিল এক কোটী ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড। তবে এটা স্মরণ রাখিতে হইবে যে মান্দ্রাজের অধিবাসির সংখ্যা পঞ্জাবের অধিবাসী সংখ্যার দ্বিগুণ। ঠিক দেনার সমষ্টি ভারতবর্ষ ধরিলে কত হইবে তাহা জানা নাই কিন্তু ব্যাপারটী যে খুব ভাবনার বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা যতদিন কৃষিজীবিগণ ঋণভারে

প্রপীড়িত থাকিবে, ততদিন তাহাদিগের আর্থিক বা নৈতিক উন্নতির আশা অল্প, অন্য দিকে তাহাদের যতই সুবিধা হউক না কেন। তবে আর্থিক উন্নতির যতই প্রতিবন্ধক হউক না কেন, দুই এক বিষয়ে অবস্থা আশাপ্রদ বটে। যেমন যৌথ সমাজ অনুষ্ঠানের এক টানা প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি। যে দেশের অধিকাংশই কৃষিজীবি, সে দেশে যৌথ সমাজের উপকারিতা সকলেই স্বীকার করিবেন। যৌথ সমাজের দ্বারা কেবল যে কৃষিজীবিগণের দেনাশোধের উপায় হয় তাহা নহে। তাহাদিগকে মিতব্যায়িতা শিখাইয়া তাহাদিগের মধ্যে ধন সঞ্চয়ের ইচ্ছা জাগরূক করিয়া ও অন্যান্য রকমে তাহাদিগের চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। পঞ্জাবে যৌথ সমাজ কি অসাধ্য সাধন করিয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল। উক্ত প্রদেশে চতুর্দ্দশটী জেলায় এক শত চল্লিশটী যোথ সমাজ দশ বৎসর হইতে কাজ করিতেছে। ইতি মধ্যে সভ্যগণের মধ্যে সিকি ভাগের অধিক এখন যৌথ সমাজের কল্যাণে সম্পূর্ণরূপে ঋণ মুক্ত হইয়াছে। ইতিমধ্যে এক লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ দশ হইতে পনর লক্ষ টাকা দেনা শোধ হইয়াছে। হিসাবে দেখা যইতেছে যে দশ বৎসর যে ব্যক্তি সমাজের সভ্য হইয়া উহার নিয়ম মত কাজ করিবে তাহার দেনা উক্ত সময়ে অন্ততঃ অর্দ্ধেক শোধ হইবে। এইত আর্থিক উপকারের কথা। নৈতিক উপকার ও বড় কম নহে। মামলা মকর্দ্দামা করা রোগ ও উপশম হয় আর অমিত-ব্যায়িতা ব্যাধির ও ইহা অমোঘ ঔষধ। আর একথা পঞ্জাবে ও যেমন সাজে দার সুদূর বর্ম্মাতেও তেমনি। পঞ্জাবের লাহোর জেলার মধ্যে অনেকগুলি যৌথ সমাজের সভ্যগণ একটী আইন করিয়াছেন যে কোন সভ্য সামাজিক ব্যাপারে কতকগুলি অসঙ্গত ধুমধামে অন্যায় ব্যয় করিতে পারিবে না। অমৃতসরের নিকট একটী শিখদিগের গ্রামের বড় বদনাম ছিল। ইহা যত বদ লোকের আড্ডা ছিল, অধিবাসিগণ দারিদ্র্যে কাতর, তাহারা মদ্যপায়ী, তাহাদিগের গরু বাছুর দুর্ব্বল ও তাহাদিগের জমী প্রায় বন্ধক ছিল। সাত বৎসর হইল তথায় যৌথ সমাজ স্থাপিত হয়। এখন গ্রামে মদ্যপায়ী নাই বলিলেই চলে, লোকে অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়াছে ও বন্ধকী জমি অনেক পরিমাণ খালাস করিয়াছে। পঞ্জাবের কোন গ্রামে একটী লোক ছিল যাহার পেষা ছিল মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া ও তদ্দ্বারা তাহার একটা বাঁধা রোজকার ছিল। সেখানে একটী সমিতির কতক-গুলি সভ্য মিলিয়া জাতিচ্যুত করাতে সে লোকটা মসজিদে গিয়া সর্ব্ব সমক্ষে শপথ করে যে সে ও ব্যবসা আর করিবে না ও যথেষ্ট অনুতাপ ও করে ও তখন তাহাকে দলে তুলিয়া লওয়া হয়। বর্ম্মাদেশ হইতে ও এইরূপ আশাপ্রদ ও সন্তোষজনক খবর পাওয়া যাইতেছে। সেখানে যৌথ সমাজের ফলে লোকে সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য ও নিজেদের দায়িত্ব বেশ বুঝিতে শিখিয়াছে। লোকের

নূতন যৌথ কারবার স্থাপনার দিকেও আগ্রহ হইতেছে। যৌথ সমাজের উদ্দেশ্য শিক্ষা বিস্তার, শিশু মৃত্যু নিবারণ, আবশ্যকীয় ঔষধাদি বিতরণ, কৃষি কার্য্যের উন্নতি প্রভৃতি। বর্ম্মাদেশে যৌথ সমাজ গুলি সম্পূর্ণরূপে দেশীয় দিগের দ্বারা চালিত। যুদ্ধের সময় ইংরাজ কর্ম্মচারির অভাবে, ও তাহার সঙ্গে যৌথ সমাজের অত্যধিক প্রচার হওয়াতে সরকারি কর্ম্মচারিদিগের হস্ত হইতে অনেকটা ক্ষমতা স্থানীয় সমাজগুলির হস্তে অর্পণ করা অনিবার্য্য হইয়াছিল, ও ইহার ফলে সমাজগুলির পরিচালনা ভার প্রায় দেশীয় দিগের হস্তেই অর্পিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ এই যৌথ সমাজ অনুষ্ঠানটির বিস্তৃতির কোন সীমা নাই বলিলেই চলে। এখনও সমগ্র ভারতবর্ষে তেত্রিশ হাজার সমাজও স্থাপিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে উনত্রিশ হাজার সমাজ কৃষিকার্য্য সংক্রান্ত। এই সমাজ গুলি লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করিয়াছে, কেননা যাহারা সমাজের সভ্য নহে তাহারাও সমাজের সহিত লেন দেন করিতেছে ও সমাজের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে। চারি বৎসরের মধ্যে তাহাদিগের সহিত সমাজের কারবারের পরিমাণ তিনভাগের একভাগ বাড়িয়াছে। যাহারা সভ্য নহে তাহাদিগের টাকা মূলধনের একতৃতীয়াংশ। ভারতবর্ষে অনেক বিষয় ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িতে হইবে, সেই পুনর্গঠনে যৌথ সমাজ অনেক কাজে লাগিবে। অবশ্য এই অনুষ্ঠান যাহাতে ঠিক পথে চালিত হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বশেষে দায়ী। কিন্তু সাধারণের মনে একটা ইচ্ছা জাগিয়াছে, যে ইহা বেসরকারি ব্যক্তিদিগের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এটা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। মান্দ্রাজে "অস্পৃশ্য" জাতি দিগের মধ্যে ইহার বিশেষ পসার হইতেছে। এপ্রদেশে যৌথ সমাজ গুলির সভ্য সংখ্যা আড়াই লক্ষ। অবশ্য ইহাদের মধ্যে মধ্যে কোন কোন সমাজ ধার দেওয়া টাকার সুদ আদায় করিতে পারে নাই, কেননা ইহা দুর্বৎসর ছিল, কিন্তু মোটের উপর এবর্ষে এই সমাজগুলি আড়াই হইতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছিল। বঙ্গ প্রদেশে যৌথ সমাজের সংখ্যা ছিল তিন হাজার নয়শত তেইস। পূর্ব্ব বর্ষাপেক্ষা পাঁচশত বাড়িয়াছিল। সভ্যের সংখ্যা একলক্ষ চব্বিশ হাজার হইতে একলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজারে উঠিয়াছিল। যাহারা গাঁজার চাষ করে নওগাঁও এ তাহাদিগেরও একটি যৌথ সমাজ আছে। গবর্ণমেণ্ট কেবল এই সমাজকেই দেড় বর্গমাইল জমিতে গাঁজা চাষ করিতেও উৎপন্ন গাঁজা বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেন। দালাল বা মহাজনের দরকার হয় না, মাল এত অধিক হস্তে থাকায় ক্রেতার অভাব হয়না, ও সমাজের টাকা থাকায় মহাজনের কাছে ধার করিতেও হয়নাও বিক্রয়ে লব্ধ টাকা সমস্তই একা কৃষকগণ পায়, কেননা দালাল মহাজনকে উহার এক পয়সাও ভাগ দিতে হয় না। এই বৎসরে

দুই হইতে তিনলক্ষ টাকা এই সমাজ লাভ করিয়াছিল। সভ্যগণের গবাদির চিকিৎসার জন্যসমাজ একজন গোবৈদ্যকে নিযুক্ত করিয়াছে ও গরু মরিলে চাষিকে যাহাতে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে না হয়, তজ্জন্য বীমা করণের ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। সমাজের জন্য একটি আদর্শক্ষেত্র স্থাপিত করা হইবে। তথায় নূতন প্রণালীতে ও নূতন উপায়ে স্থানীয় ফসলের উন্নতি ও বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা হইবে। সমাজ বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও অন্যান্য সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানও করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই বাবদে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা সমাজ ব্যয় করিয়াছিল। যৌথ সমাজের উপকারিতা সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা জলন্ত প্রমাণ কি হইতে পারে?

পঞ্জাবদেশে কৃষিজীবিগণের যৌথ সমাজের সংখ্যা তিন হাজার নয়শত সাইত্রিশ হইতে পাঁচ হাজার দুইশত আঠাশে উঠিয়াছিল। তবে এই বৃদ্ধি যাহাতে মজবুদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইতেছে। বোম্বাএও যৌথ সমাজের সংখ্যা ও তাহাদিগের মূলধনের সমষ্টি শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ষের শেষে রেজেষ্টারি করা সমাজের সংখ্যাছিল দুই হাজারেরও অধিক ও তাহাদিগের কাজ চালান মূলধনের সমষ্টি ছিল এক হইতে দেড় ক্রোড় টাকা। যৌথ সমাজ সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য ডবলিন নগরের আইরিশ কৃষি সমিতির আদর্শে একটি সমিতি আলোচা বর্ষে স্থাপিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ইতি পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ একটি সমিতি বিদ্যমানছিল। বোম্বাই প্রদেশে যৌথ সমাজের কাজে দক্ষ অনেক বেসরকারি লোক পাওয়া যায় ও সেই জন্যই উক্ত প্রদেশে এই শুভ অনুষ্ঠানের এত প্রসার হইতেছে। যুক্ত প্রদেশে দুই হাজার আটশত ছিয়াত্তর হইতে তিন হাজার একশত ছিয়াশিতে সমাজের সংখ্যা উঠিয়াছিল। সভ্যসংখ্যা ছিল বিরেনব্বই হাজার—কিছুবাড়ে নাই, তবে প্রত্যেক সভ্যেরই টাকা বাড়িয়াছিল। যুক্ত প্রদেশে যৌথ সমাজের তেমন উন্নতি হয় নাই, যেমন ভারতবর্ষের অন্যত্র হইয়াছিল। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কিন্তু এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ আছে ও সম্প্রতি অনেকগুলি অভিজ্ঞ কর্ম্মচারি নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বর্ম্মাদেশে যৌথ সমাজের সংখ্যা ছিল তিন হাজার ছয় শত বার, পূর্ব্ববর্ষের সহিত তুলনায় ছয় শত বাড়িয়াছে। এ প্রদেশে এই অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে লোকের বেশ আগ্রহ হইয়াছে। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে যৌথ সমাজের সংখ্যা ছিল দুই হাজার চুয়াল্লিশ। গত বর্ষের সহিত তুলনায় চারিশত আটাশ টি বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ ১৯১৯ সালে যৌথ সমাজের স্থাপনা কেবল টাকা ধার দিবার জন্য নহে, অন্যান্য উদ্দেশ্যে, উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া ছিল। রেলপথে মাল পাঠান অনেক স্থলে সম্ভবপর না হওয়াতে দোকানদারগণ

প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া দ্রব্যের দর অত্যন্ত বাড়াইয়া ছিল ও কোন কোন স্থানে আবশ্যকীয় দ্রব্য একেবারেই অপ্রাপ্য হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় যৌথ সমাজ মাল কিনিয়া গুদামজাত করিয়া শস্তায় বেচিয়া সভ্যগণের অনেক সুবিধা করিয়া ছিল ও স্থানে স্থানে ব্যাঙ্ক স্থাপনারও প্রবর্ত্তনা করিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অনেক সভায় ও সমিতিতে যৌথ সমাজের দ্বারা কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহার উপর সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে ও অন্যান্য দিকেও আরও কত উপকার হইতে পারে তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যৌথ সমাজের শ্রীবৃদ্ধির দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিবার চেষ্টাও অনেকটা সফলতা লাভ করিতেছে। এদেশের কৃষকগণ দরিদ্র। সুলভ কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রাদি কিম্বা জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য দামী সার ক্রয় করা তাহাদিগের সাধ্যাতীত। তাহাদিগের দরকার ভাল বীজ, ভাল যন্ত্র ও নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তনা। কেবল যৌথ সমাজের দ্বারা কৃষকের এইসব অভাব পূর্ণ হইতে পারে ও সুতরাং কৃষকগণের ভবিষ্যতে উন্নতির অনেক আশা আছে। যতদিন না কৃষক স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে যে নূতন যন্ত্র ব্যবহার নূতন সার প্রচলন, ও নূতন উপায় অবলম্বনের দ্বারা তাহার নিঃসংশয়ে অনেক লাভ হইবে, ততদিন এই কাজে বেশী টাকা খরচ করিতে সে সাহস করিবেনা। কৃষকের দারিদ্র্যই তাহার কারণ। এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে নূতন যন্ত্রের প্রচলন ও নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন হইতেছে। এসময় ভারতবর্ষের কৃষকগণের ও সেই পথ অনুসরণ করার প্রয়োজন হইয়াছে। বিশেষতঃ যুদ্ধের জন্য যে গোলযোগ হইতেছে, তাহার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেরও উৎপন্ন বৃদ্ধির আবশ্যক হইয়াছে। কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের সহিত ভারতবর্ষীয় কৃষিবিভাগের সম্বন্ধ এখন অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক স্থানেই ইতিমধ্যেই কৃষকগণ কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারিগণকে তাহা-দিগরে শুভানুধ্যায়ী ও পরামর্শ-দাতারূপে জ্ঞান করিতেছে। যখন কোন নূতন প্রণালী লাভকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন তাহার বিস্তার এবং প্রচলন সাধিত হইতেছে। উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে কৃষকগণ আর প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ থাকিতে প্রস্তুত নহে ও তাহারা বুঝিতে পারিতেছে যে জমী হইতে যে পরিমাণ লাভ হইতে পারে, পুরাতন প্রথার জন্য তাহা সে পরিমাণে হইতেছে না। মান্দ্রাজ প্রদেশে কৃষকগণ কৃষি প্রণালীর উন্নতি করণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

বাস্তবিক ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যের সুবন্দবস্ত ও উন্নতির অভাবে কত টাকা যে লোকসান হইতেছে তাহার সীমা নাই। অনেক জমী চাষ অভাবে পতিত রহিয়াছে

যেখানে জল ও সার দিলে হাজার হাজার মন মূল্যবান ফসল জন্মিতে পারে। মধ্য প্রদেশের কতকগুলি স্থান চাষের পক্ষে অযোগ্য বলিয়া এতদিন পতিত ছিল। এক্ষণে বৈজ্ঞানিক উপায় প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তথায় প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতেছে। তাহার পর চাষের জমী হইতেও ফসলের উন্নতি করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের কৃষিবিভাগ চাল ও পাট সম্বন্ধে নূতন উপায়ে চাষ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তনা করিয়া বঙ্গীয় কৃষকগণের লাভ পঁচিশ লক্ষ টাকা বাড়াইতে পারিয়াছে। অল্পদিন এই প্রথা যে বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে ও তখন কৃষকদিগের লাভ সাড়ে সাত কোটি টাকা বাড়িবে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রাদেশিক কৃষিবিভাগ দিগের দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হইতেছে। তাহাদিগের উপর যে ভার অর্পিত হইয়াছে, যদি এই প্রাদেশিক কৃষিবিভাগ গুলি যাহাতে তদুপযোগী হইতে পারে ও উপযুক্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে এদেশে কৃষির উন্নতি অবশ্যই হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের সকল বিভাগই যেমন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে টাকার অভাবে সম্যকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না, তেমনি যথেষ্ঠ অর্থাভাবে বৈজ্ঞানিক কৃষির উন্নতি ও বিস্তার ও যতদূর সম্ভব তাহা হইতেছে না। ভারতবর্ষীয় কৃষিবিভাগের প্রধান আপিস পুষায় ও ইহার জন্য বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। যতগুলি প্রাদেশিক কৃষিবিভাগ আছে, তাহাদিগের জন্য বার্ষিক সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে কিন্তু ইহাও যথেষ্ট নহে। কিছুদিন হইল প্রাদেশিক কৃষিবিভাগগুলির উন্নতি করিবার জন্য ভারত-সচিবের নিকট প্রস্তাব পাঠান হইয়াছে। এই প্রস্তাবে সাঁইত্রিশটি নূতন পদ সৃষ্টি করিবার কথা থাকে। কিন্তু শাসন বিধি সংস্কার প্রবর্ত্তনার জন্য এখন কেবল যে কয়টি সৃষ্ট না করিলে কাজের ক্ষতি হইতে পারে, সেই গুলিই সৃষ্টি করা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে কৃষিবিভাগের কার্য্য দেখিয়া প্রমাণ হইতেছে যে এই বিভাগ অতি গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছে ও ইহার উন্নতি ও বিস্তার একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। খাদ্য শস্যের বৃদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতেই এই বিভাগের অধিকাংশ সময় লাগিয়াছিল। ভাল বাছিয়া বাছিয়া বীজ বপন ও নূতন কৃষিপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে প্রায় সকল রকম খাদ্য শস্যেরই পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু এই সঙ্গে একটি অতি গুরুতর প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। যে বীজে শস্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে তাহার দোষ এই যে কিছুদিনে জমীর উৎপাদন শক্তি কমিয়া যাইতে পারে। সুতরাং কৃষিবিভাগকে এখন জমীর উর্ব্বরতা পরীক্ষা করিতে হইতেছে ওসেই পরীক্ষার ফল অনুযায়ী এমন বীজ বপন করিতে হইবে যে যাহাতে জমীর উর্ব্বরতা শীঘ্র নষ্ট না হয়। এই প্রশ্নের

সুমীমাংসা করিতে পারিলে কৃষিকার্য্যের উন্নতির পথ অনেকটা প্রশস্ত হইবে। কিন্তু এখন ভাল বীজ রোপণ করাই দরকার। পরে জমীর উর্ব্বরতা যাহাতে না কমে সে প্রশ্ন বিবেচনা করা যাইবে। তবে কৃষিবিভাগ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী আছে।

ভারতবর্ষে চালের জমীর পরিমাণ সাত কোটী পঁচানব্বই লক্ষ একার। পূর্ব্ববর্ষে ছিল আট কোটী একার। অনেক স্থানে ভাল ফসল না হওয়াতে মোটে দুই কোটী সাতচল্লিস লক্ষ টন চাল উৎপন্ন হইয়াছিল। এই ফসল শুধু ভারতবর্ষের পক্ষে নহে, সমগ্র এসিয়া মহাদেশের পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয়। বঙ্গোপসাগরের উপকূলস্থ ভূমি চাল চাষের একটী প্রধান কেন্দ্র। সেখানে কৃষকেরা যাহাতে উত্তম বীজ পাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত অনেক করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বসমেত দুইকোটী দশ লক্ষ একার জমীতে চালের চাষ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মোটে আড়াই লক্ষ একার ভূমিতে ভাল বীজ বপন করা হইয়া ছিল কিন্তু তত্রাচ উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ আটাশ হাজার টন বাড়িয়াছে। যদি কেবল চাউলের চাষের উন্নতি করা যাইতে পারে তাহা হইলে ভারতবর্ষে যত অধিক সংখ্যা লোকের মঙ্গল হইবে তেমন আর কোন ফসলের উন্নতি হইলে হইতে পারে না। বর্ম্মাপ্রদেশে ও কৃষিবিভাগের দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। সেখানে কৃষি বিভাগ যে ভাল বীজ সরবরাহ করিয়া থাকেন, তাহা পাইতে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। গমের চাষের সম্বন্ধেও অনেক উন্নতি করা হইয়াছে। দুর্ব্বৎসরের দরুণ গম চাষের জমীর পরিমাণ তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ একার হইতে দুইকোটি আটত্রিশ লক্ষ একারে কমিয়া ছিল ও উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ও এককোটী টন হইতে পঁচাত্তর লক্ষ টনে কমিয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষীয় গম মন্দ শ্রেণীর, পৃথিবীর বাজারে ইহার দরও কম। এ সম্বন্ধে কৃষি বিভাগ, যাহাতে ভাল বীজ সকলে পাইতে পারে, যাহাতে গমের গুণ বৃদ্ধি হইতে পারে ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। পুষা কৃষিক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত বার নম্বর ও চার নম্বর বীজে এই ফল পাওয়া যাইতেছে ও সুতরাং ইহার কাটতি ও খুব অধিক। এই গমের মূল্য প্রত্যেক একার হিসাবে দশ টাকা অধিক। ১৯১৮-১৯ সালে এই দুই জাতীয় গমের চাষের ভূমি ছিল পাঁচলক্ষ একার। পঞ্জাব প্রদেশে কৃষি বিভাগের কার্য্যদ্বারা এগার হাজার টন অধিক গম উৎপন্ন হইয়াছিল। এই দুই জাতীয় গমের চাষ বিদেশেও বাড়িতেছে।

তুলা সম্বন্ধে দেখা যায় যে ১৯১৮-৯ বর্ষে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ছিল চল্লিশ লক্ষ বস্তা। পূর্ব্ব বর্ষেও এই পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু চাষের জমী এবৎসর ছিল দুই কোটী দশ লক্ষ একার ও পূর্ব্ব বর্ষে ছিল দুইকোটী পঞ্চাশ লক্ষ একার।

কৃষি বিভাগ ভাল তুলার বীজ নির্ব্বাচন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। যাহাতে ভাল শোন প্রস্তুত হইতে পারে এ বিষয়ে ও উক্ত বিভাগ বিশেষ মনোযোগী ছিল। বোম্বাই প্রদেশে কতকগুলি ভালজাতীয় তুলা উৎপন্ন হইতেছে। উহা দ্বারা কৃষকের ও লাভ ও বণিক দিগেরও লাভ। কিন্তু ভাল জাতি গুলি যাহাতে খারাব না হইয়া যায় তজ্জন্য সদা সর্ব্বদা পরিশ্রমের প্রয়োজন। গুজরাট প্রদেশের ব্রোচ জাতীয় তুলার ন্যায় ভাল তুলা ভারতবর্ষে অল্পই আছে। কিন্তু খারাব জাতীয় তুলার সংশ্রবে ইহারগুণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। কৃষি বিভাগ এই অনিষ্ঠ নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতেছে। সুরাটের নিকট ছয় হাজার একার জমীতে উৎকৃষ্ট তুলার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে মন্দ শ্রেণীর তুলার চাষ একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। পঞ্জাব প্রদেশে কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলার চাষ হইতেছে। এই তুলার চাষে একার করা দশ টাকা অধিক লাভ। পাঁচ লক্ষ একার জমীতে এই তুলার চাষ হইতেছে ও ইহা দ্বারা কৃষকগণ অনেক টাকা লাভ করিয়াছে। লম্বা আঁসের তুলার চাষ বৃদ্ধি করিতে পারিলে ও উৎকৃষ্ট প্রণালীতে চাষ করিলে তুলার চাষে অনেক লাভ হইতে পারে। তুলার চাষের উন্নতি করিবার জন্য তদন্ত করণার্থে একটী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে অনেক উন্নতি হইতে পারিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। এই কমিটির একটি প্রস্তাব এই যে সমগ্র ভারতবর্ষে তুলার চাষের পক্ষে কোন ক্ষতি না হইতে পারে তজ্জন্য একটি সেণ্টাল তুলা কমিটি নিযুক্ত করা উচিত। ইহাতে এক্ষণে ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট দিগের বিশেষ লক্ষ আছে।

ইক্ষু চাষের উন্নতি সাধন করাও কৃষিবিভাগের একটি প্রধান কার্য্য। ভারতবর্ষে ইক্ষুর চাষের জমী পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশে ইক্ষু চাষের জমী অপেক্ষা অধিক। কিন্তু তত্রাচ ১৯১৮-৯ সালে বিদেশ হইতে পাঁচলক্ষ টন চিনি এদেশে আমদানি হইয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে ইক্ষুর চাষের জন্য যত জমী ব্যবহৃত হইতেছে এক ভারতবর্ষে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ জমীতে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু উৎপন্ন হয় পৃথিবীতে উৎপন্ন চিনির সিকি মাত্র। নিজের আবশ্যক দেশ জাত চিনিতে সংকুলান হয় না বলিয়া ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে অনেক পরিমাণে চিনি আনিতে হয় ও এখন দরও খুব চড়া। চিনির চাষের উন্নতির জন্যও একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। ইক্ষুর চাষ ও চিনি সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদ যোগাইবার জন্য পুষায় একটি আপিস স্থাপিত হইয়াছে ও কোইম্বাটুরে ইক্ষুর চাষের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে পুরাতন ইক্ষুর জাতির উপর কৃষকগণের

অনুরাগ কমিয়া গিয়াছে ও নূতন জাতি ইক্ষুর আদরই বাড়িতেছে। ইহা কৃষি বিভাগ সরবরাহ করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থানে নূতন জাতীয় ইক্ষুচাষ করা অপেক্ষা চাষের নূতন প্রণালী অবলম্বন করা অধিক প্রয়োজনীয় ও লাভকর দেখা যাইতেছে।

পাট চাষের পক্ষেও অনেক মঙ্গলকর কার্য্য কৃষিবিভাগ দ্বারা সাধিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে সুতা তন্ত্র কি পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে, সেবিষয়ে তদন্ত করণ আবশ্যক হইয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে একা ভারতবর্ষেই পাট জন্মিয়া থাকে। পাট চাষে কৃষকও তৈয়ারি মাল বিক্রেতা যত লাভ করিতে পারে, তত আর কোন ফসল চাষে হইতে পারে না। যে পরিমাণে পাটের দরকার, তাহাপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণে পাট জন্মিয়া থাকে। কৃষি বিভাগের পাট সম্বন্ধে কর্ত্তব্য এই যে কিসে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট জন্মিতে পারে ও কিসে অধিক পরিমাণে পাট জন্মিতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে চুণ, হাড় ও পটাসের সার ব্যবহার করিলে পাটচাষে জমী হইতে লাভ তিনগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ও যে টাকা খরচ করা হয়, তাহা উঠিয়া লাভ প্রায় সেই পরিমাণেই হইয়া থাকে। কৃষক দিগের সম্মুখে পরীক্ষা দ্বারা এই শস্যবৃদ্ধির উপায় দেখান হইতেছে ও যাহারা দেখিতেছে তাহারা সকলেই বুঝিতে পারিয়া উক্ত উপায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। যখন সকলেই এইরূপ কার্য্য করিতে থাকিবে, তখন পাট চাষের লাভ অনেক বাড়িয়া যাইবে।

যুদ্ধ ব্যাপারে যেমন পাটের চাষ বৃদ্ধি হইয়াছিল, নীলের চাষও সেইরূপ হইয়াছিল। ১৯১৮-৯ সালে নীলের ফসল ভাল হয় নাই। মোটে দুইলক্ষ ছিয়ানব্বই একার জমিতে নীল চাষ হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষে ইহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক জমিতে নীল বুনা হইয়াছিল। রংএর জন্য মসলা আগে জর্ম্মাণি হইতে এদেশে আসিত। কিন্তু যুদ্ধ সময়ে জর্ম্মানি হইতে আমদানি একেবারে বন্ধ হওয়াতে, নীলের উপর অত্যন্ত অধিক টান পড়িয়াছিল। কিন্তু কৃত্রিম নীলের সহিত প্রতিযোগিতায় যদি কৃষি লব্ধ নীলকে জয়ী হইতে হয়, তাহা হইলে এমন নীল বুনিতে হইবে, যাহাতে নীলের অংশ অধিক থাকিবে। বিলাতে কৃত্রিম নীল অনেক পরিমাণে প্রস্তুত হওয়াতে কৃষিলব্ধ নীলের টান অনেকটা কমিয়া গিয়াছে ও আলোচ্যবর্ষে কেবল চারি হাজার হান্দর নীল রপ্তানি হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষে নীল রপ্তানির পরিমাণ ছিল পাঁচ হাজার পাচশত হান্দর। কিন্তু এখন জাপান দেশে ও এদেশ হইতে অনেক নীল রপ্তানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

তামাকের চাষের বিলক্ষণ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। পুষায় সরকারি কর্ম্মচারি পরিচালিত আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট তামাকের বীজের এত কাটতি আরম্ভ

হইয়াছে যে গতবর্ষে উহা পূর্ণমাত্রায় সরবরাহ করা অসাধ্য হইয়াছিল। সুতরাং বিদেশ হইতে আমদানি তামাক চুরুট প্রভৃতির মূল্য পূর্ব্ব বর্ষের সহিত তুলনায় অনেক বাড়িয়াছিল। তামাক সিগারেটের ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ একান্ত আশাপ্রদ সন্দেহ নাই।

ব্রহ্ম দেশীয় কৃষিবিভাগকে সেখানে তৈল-প্রদ শস্যাদির ফসলের প্রতি মনোযোগ দিতে হইয়াছিল। নানাবিধ তৈলের বীজ লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল ও কি প্রণালীতে চাষ করিলে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে নারিকেল তৈলের ব্যবসায় একটি প্রধান ব্যবসায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এবিষয়ে ও উন্নতি করা যাইতে পারে। ব্রহ্মদেশে নারিকেল ক্ষেত্র স্থাপনা করিবার প্রস্তাব বিবেচিত হইতেছে ও আশা করা যায় যে আরাকান উপকূলে নারিকেল বৃক্ষ ভালরূপ জন্মিতে পারে।

চা, কফি ও রবার চাষ সম্বন্ধেও কৃষিবিভাগ অনেকটা উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে। উনিশকোটি সের চা আলোচ্যবর্ষে জন্মিয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষে ইহাপেক্ষা সাড়েচারি লক্ষ সের চা কম জন্মিয়াছিল। ভারতবর্ষীয় চা-সভা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত রাখিয়াছেন। মান্দ্রাজ প্রদেশে যে যে জেলায় চায় চাষ হইয়া থাকে, তাহার উন্নতির জন্য একজন সরকারি কর্ম্মচারি লাগিয়া আছেন। এক নূতন জাতীয় কফির লতা সৃষ্টি করা হইয়াছে। চায়ের মূল্য এ অঞ্চলে সাধারণ কফি অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহা কোন এক ক্ষেত্রে চাষ করা হইয়াছে ও ইহার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে নানাবিধ ফলের চাষ সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করা হইয়াছে। এবিষয়ে উন্নতি অনেকটা সময় সাপেক্ষ, ও কোন মৃত ব্যবসায় সঞ্জীবিত করা অল্প দিনে সম্ভব নহে। কিন্তু কোন কোন স্থানে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে, নিম্নে তাহার উদাহরণ প্রদত্ত হইল নাসিক ও আমেদনগরে দ্রাক্ষার চাষ প্রায় একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোন বিশেষ রোগে লতাগুলি নষ্ট হইয়া যাইত। কৃষি বিভাগ এই রোগের প্রতীকার করিতে সমর্থ হওয়ায় এই মৃত প্রায় দ্রাক্ষার চাষ পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বলদের দ্বারাই মাল একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে, ও এখানে অধিবাসিগণের অনুপাতে গাভীর সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক। সুতরাং গো বলদাদির খাদ্যের উপযোগী শস্য ও তৃণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ১৯১৯ সালে দুর্ভিক্ষের জন্য, বিশেষতঃ বোম্বাই প্রদেশে, এই প্রশ্নের মীমাংসা অপরিহার্য্য হইয়াছিল। গবাদির খাদ্যের অভাব সর্ব্বত্র দৃষ্ট হওয়াতে যাহা কিছু গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত

হইতে পারে তাহা সংগ্রহ করা ও দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইয়াছিল। এক্ষণে এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধেও কৃষি বিভাগ দেখাইয়াছে, যে কতকগুলি ফসল গবাদির খাদ্যের পক্ষে উপযোগী, যদিও তাহা এতাবৎ এইরূপে ব্যবহৃত হয় নাই, আবার কতকগুলি জমী পতিত রহিয়াছে যেখানে গবাদির খাদ্যের উপযোগী ফসল অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে। সঞ্চয়ের সম্বন্ধে ও নূতন ও সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তৃণাদি রক্ষণের গর্ত্তের প্রচলনের ও বন্দবস্ত হইতেছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে দাক্ষিণাত্যে তৃণপুঞ্জ গর্ত্তের ভিতর রাখিয়া তিন চারি মাস পরে বাহির করিলে ও উহার এগার থানা পরিমাণ সুন্দর অবস্থায় থাকে। ক্যাক্টস নামা মনসা জাতীয় বৃক্ষ ও গবাদির খাদ্যে পরিণত করা যাইতে পারে। সম্প্রতি যখন গবাদির খাদ্যের বিশেষ অনটন হয়, তখন এই মনসা জাতীয় বৃক্ষ দ্বারা আমোদনগরে অনেক জন্তুর প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।

কৃষি বিভাগের একটী রাসায়নিক শাখা আছে। কৃষি সম্বন্ধীয় রাসায়নিক পণ্ডিতগণের কাজ হইতেছে, জমী পরীক্ষা করা ও তাহার দোষ সংশোধন করা ও কিরূপে ফসলের উন্নতি ও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। তাঁহাদিগের এই চেষ্টার ফলে অনেক উপকারও সাধিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও এই শাখায় অনেক উন্নতি বাকি রহিয়াছে। সে সম্বন্ধে পুসার সভায় কতকগুলি প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। বাঙ্গালা প্রদেশে নানাবিঘ্ন সত্ত্বেও জমী পরীক্ষা শেষ হইয়াছে ও অন্য কোন কোন প্রদেশে জমী ও সার সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে।

গাছের শত্রু গাছ ও আছে, পতঙ্গ ও আছে। কিরূপে এই উভয়শত্রু হইতে গাছ রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার উপায় করা এদেশে একান্ত আবশ্যক। ব্যাংএর ছাতা ও পরগাছা গাছ বড়ই নষ্ট করে। এ সম্বন্ধে পরীক্ষা ও আলোচনা করিবার জন্য একটি শাখা আছে। ইহার কর্ম্মচারিগণ ইতিমধ্যেই অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বৃক্ষনাশী পরগাছা ও পোকা দ্বারা যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা অনেকটা হ্রাস করিতে পারিয়াছেন। এক্ষণে কেবল মান্দ্রাজ প্রদেশেরই নিজস্ব একজন ছত্রকতত্ত্বজ্ঞ আছেন, কিন্তু যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইএর জন্য প্রত্যেকের একজন ছত্রকতত্ত্বজ্ঞ নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। আলোচ্য বর্ষে ধান, পাট, ইক্ষু, লঙ্কা, চা, রবার ও তাল গাছ যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে তদ্বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। গাছ নাশক কীটের উৎপাত নিবারণের উপায় ও বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু এ জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে মোটে চারিজন

কর্ম্মচারি আছেন ও এত অল্প কর্ম্মচারি দ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র কৃষকগণকে কিরূপে গাছরক্ষা করিতে হয় সেবিষয়ে শিক্ষাদেওয়া অসম্ভব। তবে ভারতবর্ষে গাছের শত্রু যাহা যাহা হইতে পারে তদ্বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানা গিয়াছে। কৃষক দিগের ধারণা এই যে গাছনাশী পরগাছা ও কীট দেবতারা ক্রুদ্ধ হইয়া আকাশ হইতে নিক্ষেপ করেন। এই বহুদিন-পোষিত কুসংস্কার দূর করিতে ও যত্ন করিলে ও বুদ্ধি খরচ করিলে গাছ বাঁচান যাইতে পারে ইহা বুঝাইতে অবশ্য সময় লাগিবে। কৃষিবিভাগের একটি এনজিনিয়ারি শাখাও আছে। কিন্তু শস্যাদির ও নূতন কৃষি সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির দারুণ দুর্ম্মূল্যতা বশতঃ আলোচ্যবর্ষে অধিক কাজ করা অসম্ভব হইয়া ছিল। তবে বোম্বাই ও অন্যান্য প্রদেশে যেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল এই এন-জিনিয়ারি শাখার কার্য্যক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত হইয়াছিল। জলতোলা দমকলের কাট্‌তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। শস্য উত্তোলনকারি যন্ত্র প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা এক্ষণে বিবেচনা করা যাইতেছে। ফলে এই শাখার কাজ অনেক, তবে আরও বেশী কর্ম্মচারির দরকার।

গৃহপালিত পশু চিকিৎসা বিভাগের কার্য্য পূর্ব্ববর্ষের ন্যায়ই হইয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রতি একশতজন লোক হিসাবে পঁয়ষট্টি গরু আছে! সুতরাং যাহাতে এদেশীয় গরুর দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় ও গরুগুলি বেশ সবল হয়, সে ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্য-কীয়। পাল দিবার জন্য সবল বলদের বিশেষ প্রয়োজন আছে ও এই উদ্দেশ্যে দেশের স্থানে স্থানে মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কর্ত্তৃক পালের গবাদি রাখিবার স্থানের বন্দবস্ত করার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। পাল দেওয়া সম্বন্ধে এদেশের অনেক স্থানের লোকদিগের ধারণাটা ভ্রান্ত। সম্প্রতি কৃষিবিভাগ পালদিবারও দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য বন্দবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ও ভারতসচিব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। সৈনিকবিভাগে পাল দিবার যে উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে তাহা হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যায়। যে নূতন বন্দবস্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে ও উক্ত উপায় অবলম্বিত হইবে ও গোজাতির উন্নতি ও দুগ্ধ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইবে ও কৃষকগণকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে স্কুল খোলা হইবে। গবাদির মধ্যে মড়ক নিবারণ করা এই বিভাগের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কর্ম্মচারির অভাব সত্ত্বেও এবিষয়ে অনেক কাজ করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে চিকিৎসালয়ও খোলা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কৃষকগণের অজ্ঞতার জন্য উন্নতির ব্যাঘাত হইয়া থাকে। রোগের প্রতিকার না করিলে কিরূপ ভীষণ অনিষ্ট হইতে পারে তাহা তাহারা এখনও বুঝিতে পারে নাই।

গবাদির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক আবশ্যকীয় বিষয় কৃষকগণকে জানাইবার জন্য বিশেষ বন্দবস্ত করা আবশ্যক।

পূর্ত্তবিভাগের কার্য্যের বিস্তৃতির উপর এদেশে কৃষি সম্বন্ধীয় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করিতেছে। পূর্ত্ত কার্য্য চারি উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যে নদীতে বারমাস প্রবাহ থাকে তাহার মধ্যে বাঁধ স্থাপনা করিয়া খালের সাহায্যে নদী হইতে ক্ষেতে জল লইয়া যাওয়া। এই উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতবর্ষে খাল গুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই খালগুলিতে বার মাসই জল থাকে। দ্বিতীয় উপায়, বাঁধের সাহায্য না লইয়া, নদী হইতে খাল কাটিয়া ক্ষেত্রের সহিত সংযোগ। সিন্ধু দেশে ও পঞ্জাবের কোন কোন অংশে এই উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। এসব খালে কিন্তু বার মাস জল থাকেনা, কেবল যখন নদীতে অধিক জল থাকে, তখনই এইসব খালে জল আসে। তৃতীয় উপায় বাঁধ বাঁধিয়া বৃষ্টির জল ধরিয়া সঞ্চয় করা। এই রূপে যে জলাশয় সৃষ্টি হয় সেগুলি আয়তনে গ্রাম্য পুষ্করিণী হইতে পশ্চিমঘাট অঞ্চলের বড় বড় জলাশয় যাহার গভীরতা দুইশত সত্তর ফুট। চতুর্থ উপায় কূপ হইতে জল উত্তোলন। বড় বড় চামড়ার মশকে এই জল বলদের সাহায্যে কিম্বা দমকলের দ্বারা তোলা হইয়া থাকে। এই উপায়ই অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইতেছে।

চাষের জন্য বা যাতায়াতের জন্য যে সব খাল কাটা হয়, তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যেসব খাল হইতে জল বেচিয়া লাভ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ যাহাদিগের দ্বারা জমী জলমগ্ন হইতে রক্ষা করা যায়। তৃতীয়তঃ ছোট ছোট খাল। যে খাল কাটিলে তাহার রাজস্ব হইতে দশ বৎসরে খরচা উঠিয়া আসিবে, এমন আশা করা যাইতে পারে, সেগুলি প্রথম শ্রেণীভুক্ত। ১৯১৮-১৯ সাল পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর খাল খননে তিনকোটি সাতাশ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। কিন্তু যেগুলি কেবল গমনাগমনের সুবিধার জন্য নির্ম্মিত তাহাদিগের খরচা এই টাকায় ধরা হয় নাই। উক্ত বর্ষে এই শ্রেণীর খাল হইতে পঞ্চাশলক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব পাওয়া যায়, ও উহাদিগের বার্ষিক খরচা, খননে যে টাকা খরচ হইয়াছে তাহার সুদসমেত হয় প্রায় সাড়ে সাতাশ লক্ষ পাউণ্ড। সুতরাং লাভ হইয়াছিল বাইশ লক্ষ পাউণ্ড। মূলধনের অনুপাতে শতকরা সাড়ে পাঁচ টাকারও অধিক লাভ হইয়াছিল।

আর একপ্রকার খাল আছে যাহাদিগকে রক্ষণকারী বলা যাইতে পারে। যে সমস্ত স্থানে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আছে, তথায় এই সব খাল দুর্ভিক্ষ নিবারণে সহায়তা করে। তাহাদিগের অভাবে দুর্ভিক্ষের সময় অনেক টাকা ব্যয় করিতে হয়, ও খালগুলিদ্বারা এই ব্যয় বাঁচিয়া যায়। প্রতিবর্ষে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, এই

টাকা হইলেই এইসব খাল খননের ব্যয় বহন করা হইয়া থাকে। ১৯১৮-১৯ সাল পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর খাল খনন করিতে সত্তর লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। উক্তবর্ষে এই দরুন যে রাজস্ব সংগৃহীত হয় তাহা একলক্ষ সাত হাজার পাউণ্ড, উহাদিগের জন্য ব্যয় হয় সুদ সমেত তিনলক্ষ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড। মূলধনের হিসাবে শতকরা তিন টাকা লোকসান।

যে সব খাল,লাভ-কর ও নহে এবং রক্ষণকারিও নহে,কিন্তু চাষের জন্য ও গমনাগমনের সুবিধার জন্য কাটা হয়,তাহাদিগকে ছোট খাল বলা যায়। এইসব খাল খননের খরচা বার্ষিক রাজস্ব হইতে দেওয়া গিয়া থাকে। এই শ্রেণীর খালের সংখ্যা একশত কুড়ি ইহাদিগকে কাটাইতে খরচা পড়ে ছয়চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু আমদানির হিসাবে এগুলি লাভকর।

আলোচ্য বর্ষে বড় ও ছোট খাল ও তাহাদিগের শাখাসমূহ ধরিলে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়বট্টি হাজার একশত কুড়ি মাইল খাল আছে। ইহাদিগের সাহায্যে আনীত জল দ্বারা দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ একর ভূমি চাষ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আলোচ্যবর্ষে পনরটি বড় খাল খনন আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাদিগের জন্য ছাব্বিশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। এই খালগুলি হইতে বার্ষিক দশলক্ষ পাউণ্ডের ও অধিক রাজস্ব গৃহীত হইবে এইরূপ আশাকরা যায়। ইহা ছাড়া আরও সাতটি বড় খাল কাটিবার প্রস্তাব অনুমোদনের অপেক্ষা করিতেছে। এইগুলি খনন করিতে ব্যয় হইবে পঁয়ষট্টি লক্ষ পাউণ্ড ও চারিলক্ষ তিপ্পান্ন হাজার পাউণ্ড রাজস্ব আদায় হইবে এইরূপ অনুমান করা যায়। এই খালগুলির মধ্যে আছে বাঙ্গালা প্রদেশের বৃহৎ কর্ড খাল যাহা খনন শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। তাহা ছাড়া এগারটি নূতন প্রস্তাব প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগণ বিবেচনা করিতেছেন। এগুলি খনন করিতে তিন কোটি দশলক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে ও আনুমানিক রাজস্ব হইবে তেইশ লক্ষ পাউণ্ড। ইহাদিগের মধ্যে তিনটি পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে।

মান্দ্রাজ প্রদেশে কাবেরি নদী সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব এখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। ইহার জন্য আটাত্তর মাইল খাল খনন করিতে হইবে ও সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইবে ও মূলধনের উপর শতকরা পাঁচ টাকা দরে লাভ হইবে। ইহা দ্বারা তিন লক্ষ একাত্তর মাইল জমি চাষ করিতে পারা যাইবে। কিন্তু এই সম্বন্ধে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ও মহীশূর গবর্ণমেণ্টের সহিত মতান্তর হওয়াতে, উহা নিষ্পত্তি হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইতেছে। অযোধ্যায় প্রস্তাবিত সার্দা খাল বিবেচনাধীন আছে। এই খাল প্রস্তুত হইলে পৃথিবীর মধ্যে একটা প্রধান খাল হইবে। ইহা দ্বারা আশি লক্ষ একার জমির মধ্যে প্রতি বৎসর বিশ লক্ষ একার জমি চাষ করা যাইতে পারিবে। ব্যয় হইবে চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড ও যাহা রাজস্ব পাওয়া যাইবে, তাহা দ্বারা মূলধনের উপর শতকরা নয় টাকা

হারে সুদ পোষাইবে। শতলেজ উপত্যকায় খাল দ্বারা পাঞ্জাবে ও দেশায় রাজাদিগের রাজ্যে ত্রিশ লক্ষ একার চাষ করা যাইবে। এক্ষণে যত জমিতে চাষ হইয়া থাকে তাহার শতাংশের ত্রয়োদশাংশ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রস্তুত খালের জলের সাহায্যে চাষ হইয়া থাকে। তাহাদিগের নির্ম্মাণে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার এক চতুর্থাংশ এক বৎসরের ফসলের মূল্যেই উঠিয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের খাল দ্বারা পাঞ্জাবেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জমি চাষ হইয়া থাকে। তথায় নব্বই লক্ষ একার জমি খালের জলে চাষ হইয়া থাকে। গত পঁচিশ বৎসরে প্রত্যেক বর্ষেই গড়ে দুই লক্ষ সত্তর হাজার একারের অধিক জমি খালের জলে চাষ হইতেছে। ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত পাঞ্জাবের যে যে স্থানে অধিক লোকের বসতি কেবল সেই সব স্থানেই খাল কাটা হইত। তাহার জল হইতে শুষ্ক ও পতিত জমী চাষের দিকে মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। এই উপায়ে অনেক জমি যাহা পূর্ব্বে চাষ হইত না এক্ষণে চাষী জমির অন্তর্ভূত হইয়াছে। জলমগ্ন জমিকে চাষের উপযুক্ত করিবার জন্যও খাল কাটা হইয়াছে। নিম্ন চেনাব খালের দ্বারা যে সব জমী শত শত বৎসর পতিত ছিল, তাহাতেও চাষ হইতেছে ও তথায় বসতি হইতেছে। ভারতবর্ষে এমন লাভকর খাল আর নাই। ইহা দ্বারা পঁচিশ লক্ষ একার জমী চাষ হইয়া থাকে ও প্রতি বৎসর সাড়ে নয় লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। এই খালে মূলধনের উপর শত করা চল্লিশ টাকা হারে লাভ হইয়া থাকে। নিম্নঝেলম খাল দ্বারা আট লক্ষ একার জমী চাষ হইয়া থাকে ও মূলধনের উপর শতকরা কুড়ি টাকা হারে লাভ হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ প্রদেশে সত্তর লক্ষ একার জমী গবর্ণমেণ্টের খালের জলের সাহায্যে চাষ হইয়া থাকে। গত পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে খালের জলের সাহায্যে কর্ষিত জমির পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে পুষ্করিণী প্রভৃতির সাহায্যে চাষ হইত। ১৮৭৫ সাল পর্য্যন্ত যে সব খাল কাটা হইয়াছিল, তাহারা হয় নদী হইতে চাষের জমীর সহিত সংযুক্ত হইত অথবা পুষ্করিণীতে নীত হইত। ঐ বৎসরের পর হইতে জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা আরম্ভ হয়। ইহাদের মধ্যে পেরিয়ার হ্রদ উল্লেখযোগ্য। পেরিয়ার নদী পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতমালা হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে ত্রিবাঙ্কুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। সমুদ্রের সমতল রেখা হইতে তিন হাজার ফুট উচ্চে পাহাড়ের উপর এক শত পঁচাত্তর ফুট উচ্চ এক প্রকাণ্ড ইটের বাঁধ প্রস্তুত করা হয়। তদ্দ্বারা এমনি একটি জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছে যে তাহাতে নব্বই লক্ষ ঘন ফুট জল ধরিতে পারে। এই জলাশয় হইতে পার্ব্বত্য পথে সওয়া মাইল লম্বা একটী খাল দ্বারা পাহাড়ের অন্যদিকে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ১৯১৪ সালে এই হ্রদের জলের দ্বারা এক লক্ষ চুয়াত্তর একার জমী

চাষ করা হইত। সিন্ধুদেশে ও দাক্ষিণাত্যে ত্রিশ লক্ষ একার জমী গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত খালের জলে চাষ হইয়া থাকে। বোম্বাই প্রদেশের অন্যান্য অংশের হইতে সিন্ধুদেশের পূর্ত্তকার্য্যের প্রণালী বিভিন্ন। সিন্ধুদেশের জমি খুব উর্ব্বরা, কিন্তু যতদিন না খালের সাহায্য প্রাপ্ত হয়, ততদিন উহা মরুভূমিবৎ। এদেশের খালগুলি দেশ প্লাবন হইতে জলপূর্ণ হইয়া থাকে। সমগ্রদেশে চাষ করিবার জমির পরিমাণ এক কোটী একারের কম। ইহার এক চতুর্থাংশেরও অধিক জমি খালের জলে চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে চাষোপযোগী জমির পরিমাণ দুই কোটি আশি লক্ষ একার। ইহার মধ্যে মোটে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার একার খালের জলে চাষ হয়। এখানে ভবিষ্যতে খাল বিস্তারের সীমা নাই। সিন্ধুদেশে খাল খননের জন্য মোট বিশ লক্ষ পাউণ্ডেরও অধিক ব্যয় হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে আড়াই লক্ষ পাউণ্ডেরও অধিক রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে খাল খননে মোট তেতাল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে ও ১৯১৮-৯ বর্ষে পঁচাশী হাজার পাউণ্ড রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশে পঁয়ত্রিশ লক্ষ একার জমি গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত খালের জলে চাষ হইয়া থাকে। রাজস্ব হিসাবে বার্ষিক আয় প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ পাউণ্ড। এখানে সম্প্রতি আর্দা নদীর জল যাহাতে চাষের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহার উপায় করিবার জন্য একটী বিরাট অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। আর্দা নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত একটি বাঁধ তনকপুরের নিকট নির্ম্মাণ করা হইবে ও একটি করদ খাল অযোধ্যার উপকারার্থে খনন করা হইবে। ব্যয় হইবে আঠার লক্ষ পাউণ্ড ও উহা দ্বারা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ একার চাষ হইতে পারিবে ও ইহা হইতে যে রাজস্ব আদায় হইতে পারিবে তদ্দারা শতকরা ছয় টাকারও অধিক লাভ হইবে। এই অনুষ্ঠান সমাধা হইলে শাখা সংযোগে বরেলি, শাজেহানপুর, হার্দই, এলাহাবাদ, জৌনপুর, ও ফৈজাবাদ জেলার অনেক অংশে বিশেষ উপকার হইবে।

যেমন কৃষি কর্ম্মের সুবিধা ও উন্নতি সাধনে তৎপর থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশের ধন বৃদ্ধির উপায় করিয়াছেন, তেমনি বন বিভাগে ও অন্য এক বিভাগেও গবর্ণমেণ্ট সেইরূপ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এই দুইটিও ধন বৃদ্ধির উপায়। ১৯১৭—১৮ সালে গবর্ণমেণ্ট বন বিভাগ হইতে প্রায় তের লক্ষ পাউণ্ড মুনফা করেন। বন বিভাগের অধীন আড়াই লক্ষ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে এক লক্ষ বর্গ মাইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে কাজ চলিতেছে। আলোচ্য বর্ষে বন বিভাগের উন্নতির জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করা অসম্ভব ছিল, কিন্তু যাহাতে বাণিজ্যের হিসাবে উন্নতি হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ১৯২০ সালে জুলাই মাসে

লণ্ডনে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের বনজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী হয়। বিলাতের বাণিজ্য বিভাগ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদর্শনীতে যোগ দিতে নিমন্ত্রিত হন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদিগকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদিগের এলাকার মধ্যে উৎপন্ন যাবতীয় কাষ্ঠের নমূনা বিলাতে প্রদর্শনীর নিকট প্রেরণ করেন। তাহা হইলে বিলাতে ভারত জাত কাষ্ঠের কাটতি হইতে পারে। কাষ্ঠ নিষ্কর্ষণ ও ব্যবসায়োপযোগী অবস্থায় পরিণত করণের বিষয়েও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল। যুক্ত প্রদেশের ন্যায় মান্দ্রাজ প্রদেশও একজন কর্ম্মচারি নিযুক্ত করিয়াছেন যাঁহার কাজ কিসে নানাবিধ বনজাত দ্রব্য ব্যবহারোপযোগী করা যাইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা। ভারত সচিব প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদিগকে এই সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য দুই জন আমেরিকাবাসী বন বিভাগীয় কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। বন বিভাগে নূতন কতকগুলি ইঞ্জিনিয়ারের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। যাঁহারা এ বিভাগে চাকুরি পাইবেন তাঁহাদিগকে আমেরিকায় গিয়া কাজ শিখিয়া আসিতে হইবে।

গত পঞ্চাশ বর্ষে বনবিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্টের মুনফা দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। আয় সম্বন্ধে নানাবিধ উন্নতি করার ফলে ভবিষ্যতে এই লাভের মাত্রা আরও বাড়িবে সন্দেহ নাই। বন বিভাগের প্রধান ব্যবসায়ের মধ্যে নিম্নে কতকগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে। যুক্ত প্রদেশে ও পঞ্জাবে রজনের কারবার আছে। ইহার উন্নতি যুদ্ধের জন্য, কারণ আমেরিকা হইতে টার্পিনতৈলের আমদানি অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় ভারতের বনজাত রজনের বিক্রয় অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। সেই হইতে এই কারবারের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে ও ইহা ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ণ থাকিবে এরূপ আশা করা যায়। কিছুদিনের মধ্যে ভারতবর্ষে অন্ততঃ পনরলক্ষ গ্যালন টার্পিণ ও চল্লিশলক্ষ গ্যালন রজন্ উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। পাঞ্জাবে জাললো নামক স্থানে ফরাসি দেশ হইতে এদেশের জন্য উপযোগী এক নূতন কল আনা হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে ভাওয়ালি নামক স্থানে রজনের একটি নূতন কল নির্ম্মিত হইতেছে, যাহা দ্বারা উৎপন্ন মালের পরিমাণ অনেক বাড়িবার আশা আছে। ১৯১৭-৮ সালে ভারতবর্ষে চুয়াল্লিশ হাজার হান্দর রজন ও একলক্ষ ত্রিশ হাজার গ্যালন টার্পিণ উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ষে হয় ছয়চল্লিশ হাজার হান্দর রজন ও একলক্ষ চল্লিশ হাজার গ্যালন টার্পিন। কাগজের কারখানার উন্নতির ও ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিবর্ষে পঁচাত্তর হাজার টন পিজবোর্ড ও কাগজের খরচ। তন্মধ্যে ইহার এক তৃতীয়াংশ মাত্র এদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বনে বাঁশ ও হাতী ঘাস—যাহা হইতে কাগজ তৈয়ার করা যাইতে পারে—

এই দুই জিনিষের অভাব নাই। সেগুলি ব্যবহার করিতে পারিলে আর বিদেশ হইতে কাগজ ও পিজবোড আমদানি করিতে হইবে না। ব্রহ্ম দেশীয় গবর্ণমেণ্ট রেঙ্গুনের বিখ্যাত সওদাগর জামাল ব্রাদার্শের সহিত চুক্তি করিয়াছেন যে তাঁহারা বাঁশ হইতে কাগজের শাঁস নিষ্কর্ষণ করিবেন।

লাক্ষার কারবারের উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য বনবিভাগের কতকগুলি কর্ম্মচারিও লাক্ষা ব্যবসায়িগণ ১৯১৯ সালে এপ্রিল মাসে ডেরাডুনে সমবেত হন। তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে লাক্ষা সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারিকে কেবল এই কার্য্যেই নিযুক্ত করা হউক্। গবর্ণমেণ্ট বলিলেন যে অনুসন্ধান দুই দিকে করিতে হইবে। একজনকে লাক্ষা প্রস্তুত করণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী ও বাজারে বিক্রয়ার্থ কি অবস্থায় পাঠান উচিত ও কি কি দ্রব্যে লাক্ষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এই সব বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। আর একজনকে উৎপন্ন লাক্ষার জন্য বন জমা কি সর্ত্তে দেওয়া যাইতে পারে, উহা চাষ করিতে হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী কি, ও উহা সংগ্রহ করিবার সর্ব্বোত্তম উপায় কি এই সব বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। অতএব দুইজন কর্ম্মচারীকে এই দুই বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করিতে হইবে। বাস্তবিক বনজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে হইল প্রথমে বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য বাহির করিতে হইবে। ইনডাষ্ট্রিয়াল কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে ডেরাডুনে যে বন বিদ্যালয় আছে তাহাতে বিশেষজ্ঞের অভাব ও উহা দ্বারা দেশের আবশ্যকমত কাজ ও হয় না। এই সিদ্ধান্তের ফলে ডেরাডুনের বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিবার প্রস্তাব ভারতসচিবের নিকট অনুমোদনার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহাতে কর্ম্মচারির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করিবার ও নূতন স্থানে নূতন বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই বৎসর ভারতবর্ষীয়গবর্ণমেণ্ট কল কিনিবার জন্য একজন কর্ম্মচারিকে বিলাতে পাঠাইয়াছেন ও আর একজনকে বনজাত দ্রব্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য আমেরিকায় পাঠাইয়াছেন।

বনজাত দ্রব্যের ব্যবসায় অনেক দিন হইতেই গবর্ণমেণ্টের আলোচনা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছে। মৎস্য বিভাগে কিন্তু অল্প দিন হইল গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। ইনডাষ্ট্রিয়াল কমিশনের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে এই বিভাগেও চেষ্টা করিলে অনেক আয় বৃদ্ধি হইতে পারে। উপকূলের নিকটস্থ নগর সমূহে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মৎস্যের কাট্তি আছে। কিন্তু সকলেই আক্ষেপ করেন যে মূল্য অত্যন্ত অধিক ও সকল সময়ে নিয়মিতরূপে পাওয়া যায় না। ধীবরগণ অশিক্ষিত, অলস ও নিম্নজাতীয়। এজন্য এই বিষয়ে কিছু উন্নতি করা সহজ ব্যাপার নহে। তাহারা নিজের

স্বার্থ বুঝিতে সক্ষম নহে। তাহাদিগের লভ্যের অধিকাংশ ভাগ মধ্যবর্ত্তী মহাজনকে দিয়া নিজেরা অতি অল্প লাভে কোন উন্নতির চেষ্টা না করিয়া কায়ক্লেশ জীবন ধারণ করে। মধ্যবর্ত্তী মহাজনের শোষণে মাছের দামও বাড়িয়া যায় ও জেলেরা ও অধিক পরিমাণে মাছ ধরিতে উৎসুক হয় না। আলোচ্যবর্ষে বঙ্গদেশে এগার হাজার টন মাছ ধৃত হইয়া স্থানান্তরে চালান হইয়াছিল। বাঙ্গালা ও বিহার ও উড়িষ্যা এই দুই প্রদেশ লইয়া একটি সরকারি মৎস্য বিভাগ আছে, কিন্তু কর্ম্মচারির সংখ্যা এত কম যে তদ্দ্বারা অনেক বিষয়েরই মীমাংসা অসাধ্য হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশে অলবনাক্ত জলে যে মাছ জন্মে তাহা ধরিবার প্রথা এত খারাব যে ইহার দোষে মাছ ধরিবার স্থান গুলি হইতে ক্রমেই অল্প পরিমাণে মাছ পাওয়া যাইতেছে, এদিকে মাছের অভাব ও চারিদিকে। এই অভাব যতটা সম্ভব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ধীবর কুল এমনি নির্দ্দয় ভাবে মাছ ধরিয়া থাকে যে ছানা মাছ এমন কি ডিম পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। কিরূপে এই অদূরদর্শিতা ও অন্যায় মৎস্য নাশ নিবারণ করা যাইতে পারে সে বিষয় বিবেচনা-যোগ্য। প্রস্তাব হইতেছে যে জেলায় জেলায় মৎস্য রক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও অন্যায় সংহারের অপকারিতা সম্বন্ধে অজ্ঞ ধীবরগণকে বুঝাইবার জন্য বন্দবস্ত করা উচিত। একটা কিছু প্রতীকার করা উচিত নতুবা বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যায় মৎস্য কুলের বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাসই হইতে থাকিবে। এবিষয়ে মান্দ্রাজের অবস্থা অনেক ভাল। তথায় মৎস্য বিভাগের চেষ্টায় উপকূলে ধীবর দিগের দ্বারা আড়াই শত মাছের তেল বাহির করিবার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে এই মাছের তেল ও মাছের মলেরসার মান্দ্রাজের পশ্চিম উপকূল হইতে সাইত্রিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যে রপ্তানি হইয়াছিল। রেঙ্গুনে একটি মাছের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে ও এখানে নূতন কল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ধীবরকুলের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি না করিতে পারিলে কি মান্দ্রাজে কি বাঙ্গালায় এই কারবারের শ্রীবৃদ্ধি করা বড়ই কঠিন। মান্দ্রাজের মৎস্য বিভাগ ধীবরগণকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের বন্দবস্ত করিয়াছেন। তাহাদিগকে যৌথ সমাজ স্থাপনার উপকারিতাও দেখান হইয়াছে। ম্যালেরিয়া নিবারণের পক্ষে তাহারা একযোগে কার্য্য করিতে পারগ হইয়াছিল। শিক্ষার বিস্তার ও যৌথ সমাজ স্থাপনা করিতে পারিলে ভারতবর্ষের মৎস্য-ধন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষের প্রকৃতিদত্ত সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে চেষ্টা করা হইতেছে তাহা পূর্ব্বে দেখান হইল। কিন্তু এই ধন পূর্ণ মাত্রায় বৃদ্ধি করিতে হইলে ভারতবর্ষের নিম্ন স্তরের লোক দিগের অবস্থার উন্নতি করা আবশ্যক। যতদিন না দেশের আপামর সাধারণের অবস্থা ভাল হয়, ততদিন ভারতবর্ষের প্রকৃতি দত্ত সম্পদের দ্বারা দেশের যতদূর মঙ্গল সম্ভব

তাহা সাধিত হইতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয়দিগের আত্মোন্নতির যতই সুবিধা দিন না কেন, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতি না হইলে আশানুরূপ ফল প্রসূত হইবে না।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উন্নতি।

আলোচ্যবর্ষে গবর্ণমেণ্ট ও অধিবাসিগণ উভয়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতি করিতে হইলে উভয়েরই সম্মিলিত চেষ্টার আবশ্যক। অধুনা এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা ও হইতেছে। কিন্তু তত্রাচ বিশেষ যে কোন উন্নতি হইয়াছে তাহার ত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। একথা বলিলে ইহা বুঝিতে হইবে না যে স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের দোষেই সফলতার অভাব হইয়াছে। কেননা এদেশের লোক সংখ্যা ও তাহাদিগের দারিদ্র্যের বিষয় ভাবিলে, এই নিস্ফলতা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইবে না। ভারতবর্ষে মাঝে মাঝে যে ভীষণ মড়ক হইয়া থাকে তাহা নিবারণ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট ও জন সাধারণের সমগ্র দেশব্যাপী চেষ্টার আবশ্যক। যতই ভাল লোক স্বাস্থ্যবিভাগে নিযুক্ত থাকুন না কেন, উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে তাঁহাদিগের উদ্যম নিস্ফল হইবারই কথা। এখানে লোকে এতই অজ্ঞ যে সৎপরামর্শ ও শুনিবে না ও তাহাদের মঙ্গলের জন্য দত্ত যে আদেশ তাহাও মান্য করিবে না। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলকেই স্বাস্থ্য রক্ষার স্থূল নিয়মগুলি বুঝাইতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা ভালরূপ অবগত নহেন, তাঁহারা এই কার্য্যটী কিরূপ দুরূহ তাহা বুঝিতে পারিবেন না। গ্রীষ্ম মণ্ডলে যে সব রোগ হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অনেক তদন্ত করা হইয়াছে কিন্তু যথেষ্ট কর্ম্মচারির অভাবে এই তদন্তের ফল সকলের উপকারে লাগিতে ছেনা। গত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ কর্ত্তৃক দেশ আক্রান্ত হইবার পর গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আরও অধিক মনোযোগী হইয়াছেন। এদেশে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ দমনার্থ একরূপ বীজ প্রস্তুত করা হইয়াছে, যাহা সর্ব্বসাধারণকে যাহা খরচা পড়িয়াছে সেই মূল্যে বিতরিত হইতেছে ও সেই সঙ্গে ব্যবহারের নিয়ম ও নির্দ্দেশ দেওয়া হইতেছে। ওলাউঠা রোগ নিবারণের জন্য যে টীকা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তজ্জন্য অনেক পরিমাণে বীজ প্রস্তুত ও সরবরাহ হইতেছে।

বোম্বাই ও কলিকাতা নগরে গরীব লোকেরা যে অবস্থায় বাস করে তাহাতে তাহাদিগের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইয়া থাকে। সে বিষয়ে উন্নতি করিবার জন্য ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্ট গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে ও আনুকূল্যে অনেক কাজ করিতেছে। প্রথম প্রথম লোকের এবিষয়ে বিশেষ অনুরাগ দেখা যায় নাই, কিন্তু এখন আর সে উদাসীনতা নাই, ও যাহাতে

শীঘ্র কাজ সমাধা হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। কেবল যে শুধু বড় বড় সহরের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আছে, তাহা নহে। এদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে এক দশমাংশ মাত্র সহরে বাস করে, ও অবশিষ্ট নয় দশমাংশ পল্লীগ্রামে বাস করিয়া থাকে। সেখানকার অবস্থা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর কিন্তু পল্লীবাসিগণ নূতন প্রথার বিরোধী ও ইহার উপকারিতা তাহাদিগকে বুঝাইতে পারা সহজ নহে। তাহাদিগের এ বিষয়ে ধারণা পরিবর্ত্তিত না হইলে পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যোন্নতি কখনই সন্তোষজনকরূপে সাধিত হইতে পারিবে না। কিন্তু কেবল বাসস্থানের উন্নতি করিলেই হইবে না। এসম্বন্ধে আরও অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। যেমন শিশু মৃত্যু। পঞ্জাবে হাজার করা দুইশত আটচল্লিশটী শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। বিহারে হাজার করা একশত আশি শিশুর অকালে মৃত্যু হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা হাজার করা দুইশত ছয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রতিবর্ষে অনেক শিশু নষ্ট হইয়া থাকে। যতদিন না দেশের মনোযোগ এই শিশু মৃত্যু নিবারণের দিকে আকৃষ্ট হইবে, ততদিন গবর্ণমেণ্ট যতই চেষ্টা করুন না কেন, বিশেষ কোন ফল হইবে না। বোম্বাই, কলিকাতা ও অন্যান্য নগরে শিশু মৃত্যু হ্রাস করিবার জন্য কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে ও তাঁহারা খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতেছেন, ও দেশীয় ধাই দিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দিতেছেন। আর একটি গুরুতর বিষয় হইতেছে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা। ভারতবর্ষে একলক্ষ হইতে দেড়লক্ষ এই রোগী আছে। যাহাতে এই ব্যাধির বিস্তার না হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সাধারণের অধিক সাহায্যের প্রয়োজন। তাহার পর হইতেছে প্লেগ যাহা দেশের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। ১৯১৮ সালে পয়লা জুলাই হইতে ১৯১৯ সালের জুন পর্য্যন্ত পঁচাশি হাজার লোক এই রোগে মারা পড়িয়াছিল। গত বিশ বৎসরের মধ্যে গড়ে প্রতিবর্ষে পাঁচলক্ষ লোক এই রোগে মারা গিয়াছিল, সুতরাং মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু তত্রাচ যে রোগে প্রতিবর্ষে অন্ততঃ নব্বই হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। বস্তুতঃ প্লেগ দমনের জন্য যত কর্ম্মচারি নিযুক্ত থাকে, সমস্ত স্বাস্থ্যবিভাগে ততলোক নাই।

ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য বিভাগে লোক বৃদ্ধি করা ও প্রচলিত পন্থার সংস্কার করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। গত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ যখন দেশব্যাপী হইয়াছিল, তখন কোন প্রদেশেই প্রতীকারের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লোক ছিল না। কিন্তু ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগের কথা স্বতন্ত্র ও ইহা ছাড়িয়া দিলেও বলিতে হইবে যে জন সাধারণের এবিষয়ে উদ্যম না থাকিলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতির আশা অল্প।

আলোচ্যবর্ষে এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা দ্বিগুণ হইয়াছিল। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল। চিকিৎসকগণের এ বিষয়ে একটি সভার অধিবেশন হয় ও তথায় স্থিরীকৃত হয় যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটী কমিটি গঠন করিতে হইবে ও উক্ত কমিটি রোগের চিকিৎসা ও নিবারণের উপায় উদ্ভাবন ও নূতন তথ্য সংগ্রহ করিবেন। প্রতি প্রদেশে ও এইরূপ একটী কমিটি নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব বিবেচিত হইতেছে। এইরূপে এতজন লোক প্রস্তুত হইবেন যাঁহারা কোন স্থানে মহামারী হইলে তাহা দমন করিতে সক্ষম হইবেন। যদিও তাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশেই কার্য্য করিবেন, কিন্তু কোন স্থানে মহামারী হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে তথায় গিয়া কাজ করিবেন। চিকিৎসা ও চিকিৎসালয়ের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয় সে বিষয়েও চেষ্টা করা হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে একটি ভারতবর্ষীয় রেডক্রশ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যত সামরিক ও অসামরিক হাঁসপাতাল আছে তাহারা তথায় কার্য্য করিবে। ইংরাজি উপনিবেশ সমূহের রেডক্রশ সমিতিগুলির সহিত ভারতবর্ষের সমিতি সমপদস্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভারতবর্ষের ও দেশীয় রাজ্যের প্রধান প্রধান সহরে এই সমিতির শাখা স্থাপিত হইবে, সুতরাং সমিতি সমগ্র ভারতবর্ষেই কার্য্য করিতে পারিবে।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতি যাহাতে রোগে সুচিকিৎসা পাইতে পারে তাহার বন্দবস্ত করিবার জন্য একটী সভা আছে। লেডি ডফারিন ফণ্ডের টাকার সাহায্যে এই সভা কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা যে উপকার হইতেছে তাহা সামান্য নহে। এদেশে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতি করিবার পথে এক প্রধান অন্তরায় হইতেছে স্ত্রীজাতির উক্ত বিষয়ে ঔদাসিন্য। অনেক সময় স্ত্রীলোকদিগের দ্বারাই ভারতীয় স্ত্রীজাতিকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সদুপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। এদেশে স্ত্রীলোকেরাই অন্তঃপুরের গৃহিণী। সুতরাং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে স্থূল তথ্যগুলি তাহাদিগকে বুঝাইতে না পারিলে উন্নতির সম্ভাবনা অল্প। স্ত্রীলোকদিগকে ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য যুক্ত প্রদেশ পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালায় কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, ও এই সব স্থানে যাহা ফল পাওয়া যাইতেছে, তাহা অতীব সন্তোষজনক। কাউণ্টেস অফ ডফারিন ফণ্ডের চেষ্টায় ও ব্যয়ে শিশু মৃত্যু নিবারণার্থে প্রসবকালীন অবস্থার অনেক উন্নতি করা হইতেছে। ১৯২০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লীনগরে একটি শিশু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। এই সব বিষয়ে যাহাতে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তজ্জন্য নানাবিধ চেষ্টা করা হইতেছে।

এই ত গেল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কথা। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগণও এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী আছেন। মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রত্যেক জেলা হইতে প্রতিনিধি লইয়া

একটী মহাসভা স্থাপনা করা হইতেছে, যাহা শিশুরক্ষণ, দুগ্ধ, রোগও স্বাস্থ্যসম্বন্ধে লোক শিক্ষা ও তথ্যের প্রচার প্রভৃতি কার্য্য করিবে। বঙ্গদেশে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও দেশীয় প্রতিনিধিগণ লইয়া একটি স্বাস্থ্যসভা গঠনের কল্পনা আছে। জেলার স্বাস্থ্যবিভাগের ও উন্নতি করা হইতেছে। বিহার প্রদেশে স্বাস্থ্যবিভাগের সভার পর্য্যবেক্ষণে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। মধ্যপ্রদেশে গ্রামগুলির স্বাস্থ্য উন্নতি করিবার জন্য অতিরিক্ত লোক রাখা হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই গবর্ণমেণ্ট যাহাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জন সাধারণ মনোযোগী হয় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অনেকগুলি সভা সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে যাহাদিগের উদ্দেশ্য কেবল জন সাধারণের হিত সাধন করা। ইহাদিগের সভ্যগণ বিনাপারিশ্রমিকে, স্বইচ্ছায় অনেক সাধু অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য। গবর্ণমেণ্ট এই সভা সমিতিদিগের কার্য্যের প্রশংসা করেন ও তাহাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ দানও করিয়া থাকেন। যুক্ত প্রদেশের সামাজিক সেবা সভা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট মোটা টাকা সাহায্য পাইয়া থাকে। বোম্বাই নগরের স্বাস্থ্য বিভাগের সহিত স্বেচ্ছাসেবকগণ মিলিত হইয়া একই কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। সহরটী কতিপয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছ ও প্রত্যেক ভাগেরই ডাক্তার, ধাই, প্রভৃতির জন্য নিজস্ব বন্দবস্ত আছে।

এক্ষণে সামাজিক উন্নতি ও সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। আলোচ্য বর্ষে এই সম্বন্ধে লোকের বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। যুদ্ধের ফল স্বরূপ লোকের মতি গতি সাধারণ-তন্ত্র সম্বন্ধীয় আদর্শের দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার প্রভাব সামাজিক সংস্কার ক্ষেত্রেও অনুভূত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে সামাজিক সংস্কার যে অত্যন্ত আবশ্যক তাহা নিশ্চয়, তবে যাহারা ভারতবাসিগণের রাজনৈতিক উন্নতির বিপক্ষ তাহারা বটে বলিয়া থাকে যে আগে সামাজিক উন্নতি হইলে তবেত পরে রাজনৈতিক উন্নতি হইবে। কিন্তু জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারের মীমাংসা ইংরাজদিগের ন্যায় বিদেশী গবর্ণমেণ্টের দ্বারা, তাঁহারা যতই নিরপেক্ষ ও ন্যায়পর হউন্ না কেন, কখনই সন্তোষকর হইতে পারে না। শাসন সংস্কার আইনের ফলে নূতন প্রজা প্রতিনিধিগণ দ্বারা অর্দ্ধাংশে চালিত গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে ও ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইবে, তখন সামাজিক সংস্কার মূলক প্রস্তাব গুলি কিরূপে মীমাংসিত হইবে তাহা দেখিবার জন্য অনেকেই কৌতুহলী হইবেন। বাস্তবিক এ প্রশ্ন নূতন গবর্ণমেণ্টের মীমাংসা করিবারই কথা। এই সব সামাজিক সমস্যা গুলি কি নিয়ে

তাহাদিগের মধ্যে দুইটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে ব্যাপারগুলি কিরূপ গুরুতর। প্রথমটি হইতেছে দক্ষিণ ভারতে "অস্পৃশ্য" জাতিগণের দুরবস্থা। মালাবারের কোন কোন স্থানে ইহারা মানবের সামান্য ও সাধারণ সত্ব হইতেও বঞ্চিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে গ্রামের দূরে বাস করিতে হয়, সাধারণ রাজপথে তাহাদিগের গমনাগমনের অধিকার নাই। একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরে তাহাদিগকে থাকিতে হয়, যদি এই দূরত্বের কিছু কমতি হয় তাহা হইলে নিকটস্থ উচ্চ শ্রেণীরগণ অসুখী হয়েন। কাজেই তাহাদিগকে কুঁড়ে ঘরে বাস করিতে হয়, ও তাহারা বড়ই অপরিস্কার থাকে। মানুষের স্বভাবতঃই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ইচ্ছা হয়। ইহাদিগের সে ইচ্ছা একেবারেই লোপ পাইয়াছে। তাহারা লেখা পড়া জানে না, শিখাইবার বিনা বেতনে বন্দবস্ত করিয়া দিলেও শিখিবে না। তাহাদিগের কোন যে আশা বা লালসা আছে এমন ত বোধ হয় না। মজুরির মধ্যে অতি নীচ উপায়ে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কোনরূপ উন্নতি করিতে হইলে আগে তাহাদিগকে সামাজিক অবনতি হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। তাহারা যে অন্য মানুষেরই মত ও সমান তাহা জ্ঞান করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট যেন আদেশ দিলেন যে সাধারণ বিদ্যালয় সমূহে "অস্পৃশ্য" বালক দিগকে পড়িতে দিতে হইবে, তাহারা কুঁড়ে ঘর অপেক্ষা কিছু ভাল ঘরে বাস করিতে পারিবে, তাহারা সাধারণ জলাশয় হইতে জল লইতে পারিবে। কিন্তু এ আদেশ মত কার্য্য করান অসম্ভব। দেশের সকল লোকেই এই আদেশ মান্য করিতে অনিচ্ছুক। শত শত বৎসরের অভ্যাস পরিত্যাগ করান সহজ ব্যাপার নহে। এই "অস্পৃশ্য" দিগের দুরবস্থা কেবল দক্ষিণ ভারতের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় গুরুতর বিষয়টী সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত। ইহা হইতেছে ভারতীয় কৃষিজীবিগণের দুরবস্থা। সম্প্রতি উত্তর ভারতবর্ষে রাজস্ব বন্দবস্তের সময় দেখা গিয়াছিল যে অনেক ক্ষেত্রেই মজুরদিগকে অর্থের অভাবের জন্য অনেক সময় দাসখত লিখিয়া দিতে হয়। অতি অল্প টাকার জন্য মজুরকে তাহার দেনাদারের অধীনে খাটিতে অঙ্গীকার করিতে হয়। এদেনা কখন শোধ হয় না, সুতরাং বেচারাকে যাবজ্জীবন ক্রীতদাস রূপে জীবন যাপন করিতে হয়। এই খাটুনির বিনিময়ে সে কেবল দুই মুঠা খাইতে পায়। এই দুইটী উদাহরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে সামাজিক সংস্কার কতদূর আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয় ভারতীয় কৃষিজীবি এতই গরীব ও নিরুপায় যে ইউরোপে সেই শ্রেণীর মধ্যে সেরূপ দেখা যায় না। ইহাদিগের উন্নতি করিতে হইলে কেবল গবর্ণমেণ্টকে নহে সমগ্র জাতিকেও প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। এই বিরাট জনসংঘকে লেখা পড়া শিখাইতে

হইবে, যাহাতে স্বাস্থ্য লাভ করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে সুপরামর্শ দিতে হইবে ও যে সামাজিক দুরাচারের দ্বারা তাহারা পেষিত হইতেছে তাহা দূর করিতে হইবে। কিন্তু সমাজের এই নিম্নতম স্তরেই যে সংস্কার আবশ্যক তাহা নহে মধ্যবিত্ত ও ধনীগণের মধ্যে ও অনেক সামাজিক আচার আছে যাহার সংস্করণ হওয়া উচিত।

এদেশে স্ত্রীদিগকে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দিবার পথে বিষম অন্তরাল আছে। স্ত্রীশিক্ষার অনুকূলে লোকের মত ফিরিতেছে বটে, কিন্তু পুরুষ দিগের মধ্যে এখন যতদূর লেখাপড়ার বিস্তার হইয়াছে, স্ত্রীলোকগণেরও মধ্যে যখন অন্ততঃ সেই পরিমাণে শিক্ষার প্রসার হইবে, সেদিন এখনও বহুদূরে। অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে কেহই নহে, কিন্তু যে প্রণালীতে ও যে যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার বিরুদ্ধে অনেকেই বটে। ইহা যে একেবারে অজ্ঞানীর মত কথা, তাহা বলা যাইতে পারে না। অনেকেই আশঙ্কা করেন যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিলে বালিকা গৃহকর্ম্মে অপটু ও অযোগ্য হইয়া থাকে, অথচ এই গৃহকর্ম্মে অনুরাগ, আগ্রহ ও পটুতাই হিন্দুরমণীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরবের বিষয়। কিন্তু এখন যখন সামাজিক সংস্কারকগণের এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদিগের উভয়েরই লক্ষ্য হইতেছে যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ উন্নতি করা যে যাহাতে শিক্ষিতা বধূগণ গৃহকর্ম্মে অনুরক্তা হইবেন ও বিশেষ নিপুণতা দেখাইতে পারিবেন, তাহাতে আশা করা যায় যে তাঁহাদিগের চেষ্টা ও যত্ন সফল হইবে এবং স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে যে কুসংস্কার আছে তাহা ক্ষয় হইবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অবরোধ প্রথা, জাতিভেদ প্রথা ও স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহের উপযোগী বয়স বৃদ্ধির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবরোধ প্রথার বিপক্ষে সাধারণের মত দিন দিন বলবান হইতেছে, কিন্তু মুসলমানদিগের মধ্যে এ প্রথার ভিত্তি এখনও সুদৃঢ় রহিয়াছে। তবে পর্দ্দার প্রভাব যে ক্রমে ক্রমে কমিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান মহিলা গাড়ী করিয়া বেড়াইতে গিয়া থাকেন ও কেবল মাত্র অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া থাকেন। রঙ্গালয় প্রভৃতি সাধারণের আমোদ ভূমিতে দেশীয় স্ত্রীলোকগণের টীকিট অনেক বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রকাশ্য মজলিসে ও সভা সমিতিতে অনেকে আসিয়া থাকেন। বাল্য বিবাহ এদেশে অতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। সংস্কারকগণ যতই বলুন না কেন, যতই চেষ্টা করুন না কেন, এ প্রথা শীঘ্র এদেশ হইতে তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যখন ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তখন ইহার উদ্দেশ্য সাধু ও সময়োপযোগী ছিল ও ইহাদ্বারা অনেক মঙ্গলও সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু দেশেরও লোকের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়াতে ইহার উপকারিতা

অনেক হ্রাস হইয়াছে ও কোন কোন সংস্কারকের মতে ইহা দ্বারা এক্ষণে বিষম অনিষ্ট হইতেছে। ইহার লৌহ সম কাঠিন্যের জন্য ইহা জাতীয় উন্নতি ও সামাজিক সংস্কারের পথে কণ্টক হইয়াছে।

দিন দিন সংস্কারক দলের বলবৃদ্ধি হইতেছে। আলোচ্যবর্ষে সামাজিক সংস্কার উদ্দেশ্যে অনেক সভা সমিতি বসিয়াছিল। সংস্কারকগণের বক্তৃতা সংবাদ পত্রের সাহায্যে দেশময় প্রচারিত হইতেছে ও তদ্দ্বারা সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে ও চিন্তার বিষয় হইতেছে। দেশের কতকগুলি হিতকারী সভার দ্বারাও বিনা আড়ম্বরে অনেক সৎকার্য্য সাধিত হইতেছে। এখন কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ কিম্বা কোন রোগ প্রবল হইলে ভারতবর্ষের সেবক সমিতি ও সেবাসমিতিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া থাকেন। ইঁহারা কেবল লোকের দুঃখনিবারণে বা শিক্ষা বিস্তারে চেষ্টা করিয়া থাকেন এমন নহে, প্রয়োজন হইলে দুর্ভিক্ষ পীড়িতগণের উদ্ধারের ও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশের সামাজিক সেবক সভার রিপোর্ট পড়িলে জানা যাইবে কতদিকে সভার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। জলপ্লাবনে বিপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্য, দরিদ্রদিগকে বস্ত্রদান, রোগীদিগকে ঔষধ দান ও চিকিৎসার বন্দবস্ত, লোককে স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বারা পুস্তিকা প্রচার দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে শিক্ষা দেওয়া, এই সকল কার্য্যেই এই সমিতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রী জাতির অবস্থা উন্নতি করিবার জন্য ও অনেক চেষ্টা হইতেছে। পুনার সেবা সদন দশবর্ষের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোককে ধাত্রী, মেয়েডাক্তার ও শিক্ষয়িত্রী রূপে শিক্ষিতা করিয়াছেনও অনেককে শিল্প কর্ম্ম শিখাইয়াছেন। ইহা ব্যতীত বিপদের সময় অনেক বিপন্ন গণের দুঃখ মোচন করিয়াছেন।

সমাজ-সংস্কারকের পথ কিরূপ কণ্টকাকীর্ণ, আলোচ্য বর্ষের কতকগুলি ঘটনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। অনেক সামাজিক বিষয়ের সহিত ধর্ম্মের অভেদ্য সম্বন্ধ আছে। সুতরাং বিধর্ম্মী গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় একজন হিন্দু সভ্য একটি আইন করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যদ্দ্বারা এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের বিবাহ হইতে গেলে উভয়কে অহিন্দু বলিয়া স্বাকার করিতে হইবে না। এক্ষণে ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের বিবাহ দিতে হইলে বরকে স্বীকার করিতে হয় যে সে হিন্দু সমাজ-ভুক্ত নহে। উক্ত প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য এই ছিল যে অতঃপর ঐরূপ বিবাহ আইন সিদ্ধ করিতে কেননা তাহা হইলে আর অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে না। কিন্তু এই আইনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজ এরূপ ভীষণ আন্দোলনের অবতারণা করিলেন যে সম্ভবতঃ উক্ত আইন পাশ করা অসাধ্য হইবে। হিন্দু দেবালয়ের আয়ের অবৈধ ব্যয় নিবারণার্থ ও দাতব্যের জন্য

দত্ত টাকার অপব্যয় রহিত করিবার জন্য যে আইনের প্রস্তাব এখন বিবেচনাধীন আছে সে সম্বন্ধে ও কেহ কেহ ঘোর আপত্তি করিতেছে। সার উইলিয়ম ভিনমেণ্ট ভারত বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এইরূপ একটী আইনের যে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহারও বিরুদ্ধে আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পক্ষে এত অধিক হিন্দু ছিলেন, যে ব্যবস্থাপক সভা দ্বারা এই আইন বিবেচনা করান সম্ভব হইয়াছিল। ইহা একটি শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। এদিকেও যে কতকটা উন্নতি হইতেছে, তাহা ও স্বীকার্য্য। কালিকটে একজন বিলাত হইতে প্রত্যাগত ডাক্তার নীচকুলোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার নামে স্থানীয় লোকেরা নালিশ করে যে তিনি গ্রামের পুষ্করিণীর নিকট দিয়া গমন করিয়া পুষ্করিণীটী অপবিত্র ও তদ্দ্বারা সাধারণের অব্যবহার্য্য করিয়াছেন। বিচারে ডাক্তার অব্যাহতি পাইলেন ও এ সংবাদে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই অনেক উদার-চিত্ত ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে এরূপ সামাজিক অত্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত ও জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করণের জন্য কতকটা পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন প্রথার অনুরাগীদিগের পক্ষ হইতে বিষম আপত্তি হইতেছে। এই সম্বন্ধে উন্নতিও শিক্ষা বিস্তারের উপর নির্ভর করিতেছে।

ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে আলোচ্য বর্ষে অনেক উন্নতির সূচনা দেখা দিয়া ছিল—কি বিদ্যালয় সংক্রান্ত, কি মাধ্যমিক. কি প্রাথমিক সকল রকম শিক্ষার সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। অল্পদিনের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অনেক পরিবর্ত্তিত হইবে, ইহা আশা করা যাইতে পারে। এক্ষণে ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষের জন সংখ্যা চব্বিশ কোটি। তন্মধ্যে আশীলক্ষ বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেছে, অর্থাৎ সমগ্র অধিবাসিগণের মধ্যে এক শতের মধ্যে তিনজন মাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। বালকদিগের মধ্যে শতকরা পাঁচজন ও বালিকাদিগের মধ্যে শতকরা একজন মাত্র। শিক্ষা সম্বন্ধে বার্ষিক পঁচাশি লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইতেছে। অধিবাসি সংখ্যার অনুপাতে মাথা পিছু গড়ে সাড়ে আটআনা। এই উন্নতির মাত্রা সন্তোষকর বলা যাইতে পারেনা। শাসন বিধি সংস্কারের আইন পাশ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং শিক্ষা বিস্তার আর ও অবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছে। ১৯১১ সালের আদিমসুমারির তালিকা হইতে দেখা যায় যে তখন শতকরা ছয় জন মাত্র অতি সামান্য রকমের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেশের মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা যতদিন না বাড়াইতে পারা যাইতেছে, ততদিন দেশের জন সাধারণ দারিদ্র্য পীড়িত ও নিরুপায় থাকিবে।

আলোচ্যবর্ষে যে দেশের স্থানে স্থানে শান্তিভঙ্গ ও গোলযোগ হইয়াছিল, তাহার

কারণই লোক শিক্ষার অভাব। যেহেতু উক্ত গোলযোগ দ্বারা ইহাই প্রমাণ হইয়াছিল যে দেশের অনেকেই শিক্ষা অভাবে রাজনৈতিক বিষয় বুঝিতে অক্ষম। কিন্তু এখন যখন দেশীয় দিগের হস্তে অনেক পরিমাণে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্পিত হইতে চলিল, তখন দেশের অনেক লোক যদি রাজনৈতিক ব্যাপার বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে সেই রূপ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা আর ও বৃদ্ধি পাইবে। কেবল রাজনৈতিক বিষয় বুঝিতে পারিবার জন্যই শিক্ষা বিস্তার আবশ্যক হইয়াছে, এমন নহে। দেশের লোকে শিক্ষিত না হইলে কৃষি শিল্পাদি সংক্রান্ত উন্নতির আশা ও অল্প। দেশীয় দিগের হস্তে শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পিত হইলে রাজ্যশাসনের ব্যয় ও অনেক বাড়িবে। পৃথিবীর যে যে দেশে অধিবাসি গণের হস্তে এই ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে সেই সেই স্থানেই সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি সাধন করিতে হইলে ব্যয় বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়াছে। এই অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে সক্ষম হইবার জন্য কৃষি শিল্পাদি সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধন ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

বাস্তবিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধন কিরূপ গুরুতর ব্যাপার তাহা বুঝিতে হইলে কত লোক কি কি রকম শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহা দেখিতে হইবে। শতকরা দুই জনের কিছু অধিক লোক প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছে, ও শতকরা তিন জন লোকের ও কম লোক উহা হইতে ও নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা পাইতেছে। কিন্তু যে সমস্ত বিদ্যালয়ে মধ্য শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা দিগের ছাত্র সংখ্যা শতকরা দুই শতের মধ্যে একজন। মধ্য শিক্ষা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ও কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় বেশী উন্নতি হয় নাই। কিন্তু যদি স্ত্রীশিক্ষা ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এ দেশে পুরুষ দিগের মধ্যে হাজার করা নয় জন মধ্য শিক্ষা পাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা শিক্ষালাভ করিতেছে তাহাদিগের সংখ্যা হাজার করা ছাব্বিশ জন। কেবল বঙ্গদেশে, যথায় অধিবাসির সংখ্যা ইংলণ্ডের সমান, ইংলণ্ডে যতলোক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পাইতেছে, তাহা অপেক্ষা দশ গুণ অধিক লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতেছে। আবার বঙ্গদেশে শিক্ষিত দিগের মধ্যে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহাদিগের সংখ্যা ইংলণ্ডে যত শিক্ষিত লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতেছে তাহা অপেক্ষা অধিক। সুতরাং উচ্চশিক্ষা এ দেশে যত পরিমাণে বিস্তার হইয়াছে, নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার বিস্তার সে রূপ অধিক হয় নাই। এ দেশে সমাজের নিম্নতম স্তরের লোকেরা অশিক্ষিত কিন্তু মধ্যবিত্ত গণের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যেরূপ বিদ্যার প্রয়োজন, সেই বিদ্যাই অধিকাংশ লোকে শিখিতেছে। কেবল যে এ দেশের কোন স্থানে অধিক কোন স্থানে অল্পপরিমাণে শিক্ষার প্রচার হইয়াছে তাহা নহে। শিক্ষার স্রোত ও অতি সঙ্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে আবদ্ধ। শতকরা কিছুকম তিন জন সাহিত্য সম্বন্ধীয় বিদ্যার্জ্জনেই নিযুক্ত ও দুই হাজারের

মধ্যে একজন ডাক্তারি ওকালতী ইনজিনিয়ারি প্রভৃতি পেষা ও কৃষিশিল্প সম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ করিতেছে। সর্ব্বশুদ্ধ পঁচাশি লক্ষ পাউণ্ড বার্ষিক ব্যয় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বালকদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য উনত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড, প্রাথমিক শিক্ষারজন্য কুড়ি লক্ষ টাকা পাউণ্ড ও ডাক্তারি, ওকালতী, এনজিনিয়ারিং প্রভৃতি পেষার উপযোগী শিক্ষার জন্য মোটে আট লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়া থাকে। সাহিত্য সম্বন্ধীয় শিক্ষার প্রতিই লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ, কারণ ইহা দ্বারা সরকারি ও বেসরকারি চাকুরি পাওয়া যায় আর ওকালতী ব্যবসায়ের পক্ষে ইহাই দ্বারস্বরূপ। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শিল্পকরি বিদ্যার তত আদর নাই, মূল্যও নাই, সুতরাং ওদিকে বেশী লোকে যায় না। কিন্তু সম্প্রতি শিল্প বিদ্যার উৎসাহ দান আরম্ভ হইয়াছে ও ইহার উপকারিতা ও ইহা দ্বারা ধনার্জ্জনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে লোকের মতি গতি পরিবর্ত্তিত হওয়াতে ভবিষ্যতে অনেক অধিক লোকে এই শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই।

এ দেশের শিক্ষা প্রণালীর তিনটি প্রধান দোষ। প্রথমতঃ উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা বড়ই, কম তাঁহাদিগের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মাত্র শিক্ষকতা কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার শিক্ষকের মধ্যে কেবল পঁচাত্তর হাজার মাত্র এই কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। অথচ এই সব শিক্ষকদিগের হস্তেই জনসাধারণের শিক্ষার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। মধ্য শিক্ষার বিদ্যালয় সমূহে তেষট্টি হাজার শিক্ষক আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে চাব্বিশ হাজার মাত্র শিক্ষকতা কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাহার উপর শিক্ষকদিগের বেতন এত অল্প যে যেরূপ উপযুক্ত লোকের দরকার সেরূপ লোক এ কাজে আসিতে চাহেনা। শিক্ষক দিগের মধ্যে অনেকেই আর কোন চাকুরি না জোটাইতে পারিলেই এই কর্ম্ম লইতে বাধ্য হন্ ও অন্য কোথায় অধিক বেতনের কাজ পাইলেই ছাড়িয়া দেন। তাঁহাদিগের অধ্যাপনা কার্য্যে কোন অনুরাগ নাই, ও প্রায়ই শিক্ষক পরিবর্ত্তনের জন্য ছাত্রগণের ও অনেক ক্ষতি হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে চাকুরি পাওয়া অসাধ্য। সুতরাং কোন গতিকে অধিক সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিতে পারাই প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর একমাত্র লক্ষ্য।

এদেশের সর্ব্ব বিভাগেরই উন্নতির প্রধান অন্তরায় অর্থাভাব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শিক্ষার জন্য মাথা পেছু বার্ষিক আট আনার কিছু অধিক ব্যয় হইয়া থাকে এবং শিক্ষাও ভালরূপ হয় না। খরচা যাহাতে না বাড়ে সেইজন্য শিক্ষকদিগকে অল্প বেতন দেওয়া হয়, কাজেই তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষাও ভাল হয় না, ও যে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা বিশেষ ফলদায়ক হয় না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে টাকা ব্যয়

করিয়া থাকেন, তাহার কতকাংশ তাঁহারা স্বয়ং ব্যয় করেন ও অবশিষ্টাংশ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদিগের মধ্যে তাহা ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, যাহা, যেদিকে খরচ যোগাইতে তাঁহারা অক্ষম, সেই দিকে ব্যয় হইয়া থাকে। এই সব বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় হইতেছে শিক্ষা। এই সংক্রান্ত ব্যয়ের কিয়দংশ সাধারণ রাজস্ব হইতে দেওয়া হয় ও অবশিষ্টাংশ ছাত্রদিগের বেতন ও দাতাদিগের দানও চাঁদা হইতে সংকুলান হয়। মোট ব্যয় পঁচাশি লক্ষ পাউণ্ড। তন্মধ্যে ৩৬ লক্ষ পাউণ্ড ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত রাজস্ব হইতে দেওয়া হয়, স্থানীয় কর হইতে এগারলক্ষ পাউণ্ড দেওয়া হয় ও অন্যান্যরূপে গৃহীত টাকা হইতে সাড়ে দশলক্ষ পাউণ্ড দেওয়া হয়। ছাত্র দিগের নিকট প্রাপ্ত বেতন হইতে কুড়িলক্ষ পাউণ্ড পাওয়া গিয়াথাকে। মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে যে এগার লক্ষ পাউণ্ড পাওয়া গিয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধেক টাকা তাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্যরূপে পাইয়া থাকে। কিন্তু যদিও মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড শিক্ষা সম্বন্ধে বেশী টাকা খরচ করে না, তত্রাচ ইহা তাহাদিগের সমগ্র ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ। বোম্বাই ও সীমান্ত প্রদেশে যেসব মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আছে, তাহাদিগের আয়ের শতাংশের চল্লিশ অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। যুক্ত প্রদেশে, পঞ্জাবে, মধ্য প্রদেশে ও আসামে উক্ত আয়ের শতাংশের মধ্যে ত্রিশ অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। বেহারে আয়ের এক পঞ্চমাংশ ও মান্দ্রাজে এক ষষ্ঠাংশের ও কম এই জন্য ব্যয় হয়। কিন্তু মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড দিগের আয় অনেকটা বাড়ান যাইতে পারে, সুতরাং শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যয় বৃদ্ধি করা অসম্ভব নহে। দাতার দান চাঁদা আদায় ও মিশনরি দিগের নিকট প্রাপ্ত সাহায্য টাকার পরিমাণ খুব অধিক না হইলে ও ইহা অন্যদিক হইতে দেখিলে নিতান্ত অল্প হইবে না। কেননা মিসনারিগণ অল্প বেতনে খুব ভাল ভাল লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন, যাঁহারা টাকার জন্য লালায়িত নহেন ও অতি অল্প বেতনে সন্তুষ্ট থাকিয়া প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারের জন্য মিশনরিগণ যে কত বেশী সাহায্য করিয়াছেন তাহার সীমা করা যায় না। ছাত্র দিগের নিকট প্রাপ্ত বেতন হইতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যয়ের শতাংশের সাতাস অংশ পাওয়া গিয়াথাকে। কলেজের ছাত্র দিগের প্রত্যেককে গড়ে বার্ষিক সাড়ে চার পাউণ্ড বেতন দিতে হয়, মধ্য-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের প্রত্যেককে এক পাউণ্ড ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রত্যেককে চৌদ্দ পেনি দিতে হয়।

শিক্ষার উন্নতির জন্য অধিক টাকা চাই। কিছু কাল হইতে এদেশীয় সংবাদপত্র সমূহ শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিতেছে। কিন্তু টাকা তুলিবার পথে

যে সকল প্রতিবন্ধক আছে তাহা জানিবার কোন সুবিধা তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। ভারতবর্ষের সমগ্র বার্ষিক রাজস্ব বারকোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড। তন্মধ্যে শিক্ষার জন্য বার্ষিক ব্যয় হয় ছিয়াশি লক্ষ পাউণ্ড। অন্যান্য দিকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অনেক টাকা ব্যয় করিতে হয়। ভারতবর্ষের সীমান্ত অতি দীর্ঘ ও শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে অনেক টাকা খরচ হয়। সে দেশে নানা জাতীয় লোক বসতি করে ও তাহাদিগের মধ্যে শান্তি রক্ষা করা ও অল্প ব্যয়সাধ্য নহে। শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা ও প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিবেনা। কিন্তু যদি শান্তি রক্ষা না হইল, যদি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার বন্দোবস্ত না করা হইল তাহা হইলে শিক্ষার ভিত্তি টেঁকিবেনা। দেশীয় রাজ্যে সীমান্ত রক্ষার জন্য সৈন্য রাখিতে হয় না ও অন্যান্য বিষয়ে ও খরচ অনেক কম। সুতরাং প্রজাবর্গের উপর অধিক কর না বসাইয়া ও শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক ব্যয় করা সম্ভব। সেই জন্য দেশীয় রাজ্যে শিক্ষিত দিগের সংখ্যা ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক অধিক। যে সব দেশীয় রাজ্যে প্রজার সংখ্যা অল্প কিন্তু আয় অধিক তথায় শিক্ষা বিস্তারের উন্নতি দেখা গিয়া থাকে। মহীসুর রাজ্যে অধিবাসিদিগের মধ্যে শতকরা চল্লিশ জন শিক্ষিত। কোচিন রাজ্যে অধিবাসিগণের সহিত তুলনায়, শতকরা শাতাত্তর জন বালক ও বালিকা দিগের মধ্যে শতকরা ছত্রিশ জন শিক্ষিত।

শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয় বৃদ্ধির জন্য কিরূপে টাকা তোলা যাইতে পারে, এই প্রশ্নের মীমাংসা সহজ নহে। বিদেশী রাজাকে প্রজা বর্গ যাহাতে অধিক কর ভারে প্রপীড়িত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। কিন্তু নূতন শাসন বিধি সংস্কারের ফলে শিক্ষা বিভাগের ভার দেশীয় মন্ত্রীদিগের হস্তে অর্পিত হইবে। আশা করা যায় যে মন্ত্রীগণ নূতন উপায়ের দ্বারা কর বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু আয় বৃদ্ধির প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। কারণ যদি আয় বৃদ্ধির অভাবে শিক্ষা বিস্তারের উন্নতি না হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত অন্যান্য দেশের সহিত সে সমান আসন প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অধিকার করিতে অনেক বিলম্ব হইবে। এদেশে শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়াছে, এক্ষণে কেবল বিস্তারের আবশ্যক। বিস্তার অল্প পরিমাণেই হইয়াছে, কিন্তু যেটুকু হইয়াছে, তাহা দৃঢ় ও চিরস্থায়ী।

আলোচ্য বর্ষে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রধান ঘটনা হইতেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মন্তব্য প্রকাশ। ১৯১৭ সালে এই কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহার সভাপতি ছিলেন সার মাইকেল স্যাডলার ও ইহার সাতজন সভ্যের মধ্যে চারিজন বিলাত হইতে আসেন ও দুই জন এদেশীয় ছিলেন। ইহার কার্য্য অকটোবার মাসে আরম্ভ হয়। বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে চারিশত ব্যক্তির মত লওয়া হয় ও বিবেচনা করা

হয় ও ১৯১৯ সালে মার্চ মাসে কমিশনের কার্য্য শেষ হয়। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত মধ্যশিক্ষার সম্বন্ধে তদন্ত করেন, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষার দ্বারা ডাক্তারি, ওকালতী, ইঞ্জিনিয়ারি প্রভৃতি পেষা শিক্ষার ও কৃষিশিল্প সম্বন্ধীয় উন্নতি কতদূর সাধিত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করেন। ১৯১৯ সালে আগষ্ট মাসে কমিশনের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, ও উচ্চ ও মধ্য শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আছে উহা পাঠ করিলে তাহা সকলই জানা যাইতে পারে। কমিশনের মত এই যে যতদিন না মধ্যশিক্ষার উন্নতি হইতেছে, ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যের উন্নতি অসম্ভব, কেননা মধ্য শিক্ষার উন্নতির উপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমান মধ্যশিক্ষা প্রণালীর দোষগুলি কমিশন একে একে দেখাইয়া দিয়াছেন। অথচ এই মধ্যশিক্ষার প্রয়াসী ছাত্রই অধিক ও সুতরাং শিক্ষা যতই মন্দ হউক না কেন ছাত্র সংখ্যা হ্রাসের কোন আশঙ্কা নাই। এই সব বিদ্যালয়ে, শাসন, সংযম, নিয়ম পালন করা প্রভৃতি বিষয়ে কোন মনোযোগই দেওয়া হয় না। আজকালকার ছাত্রেরা শাসন, সংযম, নিয়ম পালন প্রভৃতি কিছুই পছন্দ করে না। যদি কোন শিক্ষক এসব দিকে লক্ষ্য রাখেন ও ছাত্রগণের উপর কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ছাত্রগণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয় ও তাহাদিগের অভিভাবকগণের নিকট উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে নালিস করিয়া থাকে। ইহার ফলে অভিভাবকগণও শিক্ষকের উপর চটিয়া যান, ও শেষে ছাত্রগণই শিক্ষকের মনিব হইয়া পড়েন। আবার কোথায়ও শিক্ষকের আদেশের বিরুদ্ধে ছাত্রগণ রাজনৈতিক আন্দোলনে অতি অধিক মাত্রায় মাতিয়া উঠে। ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য কোন কোন প্রদেশে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে ছাত্রগণ রাজনৈতিক সভা সমিতিতে বড় একটা যোগ না দেয়। ছাত্রদিগের পক্ষে রাজনৈতিক বিষয়ের চর্চ্চা একেবারে দূষনীয় নহে, কিন্তু ইহাতে মাতিয়া থাকিলে পড়া শুনার বিশেষ ব্যাঘাত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন দেখাইয়াছেন যে, শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে যে যে দোষ আছে তাহাদিগের উৎপত্তির কারণ চারটী। প্রথমতঃ শিক্ষকগণের অযোগ্যতা ও শিক্ষার আদর্শ অত্যন্ত নিম্ন বলিয়া ও সরঞ্জামের অভাবে সুচারুরূপে শিক্ষাদান করা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয় বলিয়া এ শিক্ষার পরিসর অতীব সংকীর্ণ। অনেক ছাত্রেরই প্রবেশিকা পরীক্ষার সহিত শিক্ষা সমাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এ পরীক্ষার মূল্য অধিক নহে; কারণ পাঠের বিষয় নির্ব্বাচনে বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় না, শিক্ষার আদর্শও উচ্চ নহে ও এমন অনেক বিষয় আছে যাহা দ্বারা ছাত্রদিগেরও উপকার হইতে পারে ও

দেশের আর্থিক উন্নতির ও সহায়তা হইতে পারে কিন্তু যাহা শিক্ষাদানে কোন উৎসাহদেওয় হয় না। কমিশন আর একটি দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। সেটি এই যে বিদ্যালয় সমূহের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও পরিচালন করিবার জন্য কোন ব্যবস্থাই নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে মধ্য শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রণালী প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য নাই। আর একটী কথা এই যে যাহাকে মধ্যশিক্ষা বলা গিয়া থাকে তাহার অনেকাংশ স্কুলের ছাত্রেরা লাভ করে না, তাহা কালেজেই শিক্ষা হইয়া থাকে। যাহাকে ইন্‌টার মিডিএট অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী পরীক্ষা বলা গিয়া থাকে তাহা বাস্তবিক স্কুলের পরীক্ষার বেশী নহে। স্কুলের শিক্ষা কলেজে দেওয়া হইলে নিস্ফল হইবারই কথা। কলেজে যে ছাত্রদিগকে বক্তৃতা দ্বারা এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা শিক্ষার এই অনুন্নত অবস্থায় অনুপযোগী। মোট কথা এই যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ভারত বর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গে মধ্যশিক্ষা প্রণালীর যে যে দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন তাহা এই :—

প্রচলিত মধ্যশিক্ষার মূল্য এত অল্প যে ইহা লাভ করিলে বিশেষ কিছু উপকারে লাগে না। ইহা এত অসম্পূর্ণ ইহাতে এত দোষ আছে ও ইহার আদর্শ এত নিম্ন যে যাহারা কিছু শিখিতে ইচ্ছা করে তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে হয়, যদি ও হয় ত তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন বৃত্তি অবলম্বন করিতে সংকল্প করিয়াছে, যাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। এইজন্য কমিশন বলেন যে মধ্য শিক্ষার উন্নতি না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উন্নতি ও হইবে না, ও সমগ্র জাতির উন্নতি ও হইবে না। মধ্য শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁহারা এই কয়টি প্রস্তাব করিয়াছেন (১) ইনটারমিডিএড শিক্ষা পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কিছুই দেখিবেন না ও করিবেন না, কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েডের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা আরম্ভ হইবে। এক্ষণে প্রবেশিকা পরীক্ষার পরই এই এলাকা আরম্ভ হইয়া থাকে। এইটি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ইন্‌টারমিডিয়েড পর্য্যন্ত শিক্ষার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্ত হইতে নূতন ধরণের বিদ্যালয়ের হস্তে দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে 'হাই স্কুল' নামে যে শ্রেণীর স্কুল ছিল, সেই শ্রেণীর বিদ্যালয় হইলে চলিবে। কিন্তু তাহাদিগের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, সুতরাং কমিসন বলেন যে "ইনটারমিডিএড কলেজ" নাম দিয়া কতকগুলি নূতন কলেজ স্থাপিত করিতে হইবে। তন্মধ্যে কতকগুলি কলেজ নির্ব্বাচিত উচ্চ শ্রেণীর স্কুলের সংশ্লিষ্ট হইবে ও অপর গুলি একেবারেই স্বতন্ত্র স্থাপনা করিতে হইবে। বাঙ্গালা সম্বন্ধে কমিশন বলেন যে প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একটী ইন্‌টার মিডিয়েট কলেজ স্থাপিত হওয়া উচিত ও কলিকাতা ও ঢাকা নগরে অনেকগুলি থাকা

উচিত।এই কলেজ গুলিতে যে যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা দ্বারা পরে যে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের দত্ত বি এ, বি, এস্‌সি পদবী লাভ করা যাইবে তাহা নহে। কেননা ডাক্তারি, এনজিনিয়ারি, অধ্যাপনা এবং কৃষি বাণিজ্য, ও শিল্প সম্বন্ধীয় পেশা অবলম্বনের পক্ষে ও তাহা উপযোগী হইবে। উদ্দেশ্য যে যে বালকের উচ্চাঙ্গের শিক্ষা লাভ করিবার ইচ্ছা নাই ও যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক, সে ইন্‌টারমিডিয়েট কলেজে এরূপ শিক্ষা পাইতে পারে যে যাহা দ্বারা সব রকম কাজই চালাইতে পারিবে। এই জন্য সরকারি শিক্ষা বিভাগ পুনর্গঠিত করিতে হইবে। কেননা এই নূতন শ্রেণীর বিদ্যালয় পর্য্যবেক্ষণের জন্য বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণ উপযুক্ত নহেন। কমিশন আরও প্রস্তাব করেন যে মধ্য শিক্ষাও ইন্‌টারমিডিয়েট শিক্ষা সম্বন্ধে একটি সভা গঠিত করা হউক। এই সভার সভ্যদিগের মধ্যে কেবল সরকারি কর্ম্মচারি, শিক্ষা ব্যবসায়ী ও ধর্ম্ম সম্প্রায়দিগের প্রতিনিধিগণ থাকিবেন না, শিল্প, কৃষি ও ঔষধ ব্যবসায়িগণ ও ইহার সভ্য নিযুক্ত হইবেন। এই সভার কার্য্য হইবে উচ্চাঙ্গের স্কুল ও ইন্‌টারমিডিয়েট কলেজে যে যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার তত্ত্বাবধান করা ও তাহার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা, মধ্যশিক্ষা ও ইন্‌টারমিডিয়েট শিক্ষার উন্নতি কল্পে ও অভাব মোচনার্থ গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেওয়া ও গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিদ্যালয়গুলির সাহায্যার্থে যে টাকা দিবেন তাহা ভাগ করিয়া দেওয়া।

শিক্ষকগণের সুশিক্ষিত হইয়া যে উচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কমিসন বলেন যে সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য শিক্ষকের আবশুক। শিক্ষা বিভাগ নুতন ভাবে গঠিত করিতে হইলে মধ্য ও ইন্‌টারমিডিয়েট শিক্ষার জন্য ইউরোপে শিক্ষিত লোকের সাহায্য লইতে হইবে ও উপযুক্ত বেতন দিয়া বিশেষ যোগ্য লোক বাছিয়া একটি নুতন বিভাগ স্থাপিত করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কমিসনের এই মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের প্রস্তাবগুলি মৌলিক পরিবর্ত্তনের প্রতিকূল। তাঁহারা বলেন সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত শিক্ষাদানকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করা উচিত। এ পর্য্যন্ত এ দেশে যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলি বিদ্যালয় সহযোগকারি। কতকগুলি দুর স্থানীয় কলেজ লইয়া এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে একটিতেও বোধ হয় উত্তম অঙ্গের শিক্ষা দিবায় বন্দবস্ত নাই। ইহারা প্রত্যেকেই এক একটি ছোট খাট বিশ্ববিদ্যালয়। ইহাতে ব্যয় ও অনর্থক অনেক পড়ে ও শিক্ষার গুণ ও অনেক হ্রাস হয় বস্তুতঃ কলেজগুলি ছাড়িয়া দিলে, বিশ্ববিদ্যালয় ছায়া-মূর্ত্তিতে পরিণত হয়। বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের আদর্শ যেন সর্ব্বাপেক্ষা অধম কলেজগুলির ক্ষমতা সাধ্য করিবার জন্য ক্রমেই অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। আদর্শ উন্নত করিতে হইলে পরীক্ষা কঠিন করা ছাড়া উপায় নাই, কিন্তু দেশীয় সংবাদ পত্রে তাহার বিপক্ষে ভীষণ প্রতিবাদ হইয়া থাকে। ইহাদিগের ভয় এই যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের সংখ্যা কমাইলে শিক্ষার বিস্তারের পথও রাজনৈতিক উন্নতির পথ উভয়ই রুদ্ধ হইবে।

কিন্তু কমিশনের প্রস্তাবগুলি যদি কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে এই সব বিষয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে। প্রথম প্রস্তাব এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার অধীন অধ্যাপক দিগের দ্বারা ও কর্তৃপক্ষগণের পরিচালনায় শিক্ষা দিবার বন্দবস্ত করা হউক। এবং তথায় ছাত্রদিগের বাসস্থানের ও বন্দবস্ত করা উচিত। একজন বেতনভোগী ভাইস চান্সেলর নিযুক্ত করিতে হইবে ও কার্য্যকরি বিভাগ পুনর্গঠিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান সেনেটের স্থানে একটি ইউনিভার্সিটি কোর্ট ও একটি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল স্থাপনা করিতে হইবে। প্রথমটির সভ্যগণ যে কেবল শিক্ষক ও অধ্যাপক হইবেন এমন নহে অন্য লোকে ও ইহার সভ্য হইতে পারিবেন। দ্বিতীয়টির সভ্য কেবল যাঁহারা অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাই হইতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত একটি অল্প সংখ্যক সভ্য লইয়া কাউন্সিল গঠিত হইবে, যাহার কার্য্য হইবে আয় ব্যয়ের বিষয় বিবেচনা করা। মোটামুটি কমিশনের প্রস্তাব উল্লেখ করা গেল। ঢাকার জন্য যে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে তাহাতে কমিশনের প্রস্তাব অনেক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সম্বন্ধে কমিশনের মত এই যে উহা অত সহজে হইবে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাব্বিশ হাজার ছাত্র আছে। ছাত্র সংখ্যার হিসাবে এত বড় বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীতে আর নাই। বিশেষতঃ এই বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট অনেকগুলি কলেজ অতিশয় সন্তোষজনক কার্য্য করিয়া আসিতেছে ও তাহাদিগকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। সুতরাং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সম্বন্ধে প্রস্তাবিত হইয়াছে যে কলেজগুলি দুই বিভিন্ন শ্রেণীয় হইবে। ইহার মধ্যে কতকগুলির মালিক হইবেন স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহাদিগের পরিচালনাভার বিশ্ববিদ্যালয়ই গ্রহণ করিবেন। আইনদ্বারা কতগুলি ছাত্র লওয়া হইবে, কতগুলি শিক্ষক, ছাত্রসংখ্যা অনুসারে নিযুক্ত করিতে হইবে, শিক্ষকদিগের বেতন অন্যূন কত হইবে, ছাত্রদিগের বাসের বন্দবস্ত কিরূপ হইবে, এইসব বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইবে। যে সমস্ত কলেজগুলি যে রূপ বন্দবস্ত করা আইনে বলিতেছে তাহা এই দণ্ডে করিতে অক্ষম তাহাদিগকে পাঁচ বৎসরের সময় দেওয়া হইবে, যাহার মধ্যে তাহাদিগকে আইনমত বন্দবস্ত করিতে হইবে। দূরস্থানে যে সমস্ত কলেজ আছে

তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত থাকিবে কিন্তু তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণের ভার একটি সমিতির উপর ন্যস্ত হইবে। এই দূরস্থানে অবস্থিত কলেজগুলি সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বন্দবস্ত এই হইবে যে তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকুক।

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে কমিশন আলোচনা করিয়াছেন ও সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন বলেন যে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়কে এইসব শিক্ষার জন্য পাঠ্যবিষয় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ও কমিশন সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে সামাজিক আচার হেতু যে প্রতিবন্ধক আছে তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি বিশেষ সমিতি নিযুক্ত করা উচিত। কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে দেশে খুব আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ফলে ইহা অনেকেরই নিকট আদৃত হইয়াছিল। কমিশনের সভ্যগণ দেড়বৎসর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমন করিয়া শিক্ষাসম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তাঁহারা দেশের সর্ব্বত্র এ বিষয় লইয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, ও তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে কি করা উচিত সে বিষয়েও তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। বস্তুতঃ শিক্ষাপ্রণালী সংস্কার সম্বন্ধে লোকের মনে একটা অনুরাগ ও ঔৎসুক্য সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কমিশন যে অনেক ভাল কাজ করিয়াছেন, সে বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কোন সন্দেহ ছিলনা। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় সেপ্টেম্বর মাসে যে অধিবেশন হয় তাহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছিল। এযাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা এতদিন প্রচলিত ছিল, ও যাহাতে লোকে অভ্যস্থ হইয়াছিল, প্রস্তাবিত আইন তাহা হইতে বিভিন্ন বলিয়া ইহা বিবেচনা করিবার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হইয়াছিল ও ১৯২০ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা পাশ করিবার সংকল্প করা হইয়াছিল। এই আইনের প্রস্তাব প্রবর্ত্তিত হইবার পর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন যাহাতে কমিশনের প্রধান প্রধান প্রস্তাবগুলির প্রতি লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছিল, ও যে সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি বাঙ্গালা প্রদেশ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের পক্ষেও প্রযুজ্য তৎ সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদিগকে বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। শীঘ্রই যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য আইন প্রস্তুত করা হইবে তাহা ও প্রকাশ করা হইয়াছিল।

কিন্তু ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান অভাব হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি করা। এই

শিক্ষার অতিরিক্ত কোন শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার করা বহুদিন অসাধ্য হইবে। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির সংখ্যা এক লক্ষ একত্রিশ হাজার হইতে দেড় লক্ষ হইয়াছিল ও ছাত্র সংখ্যা পঞ্চান্ন লক্ষ হ তে উনষাট লক্ষে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা বিভিন্ন। এবিষয়ে বর্ম্মাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি করিয়াছে। তথায় অধিবাসিদিগের মধ্যে শতকরা সাত জন প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। তাহার নিম্নে মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা ও আসামের স্থান। এসব প্রদেশে শতকরা পাঁচ ছয় জন প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছে। মধ্য প্রদেশে ও বেহারে শতকরা চার জন, সীমান্ত প্রদেশে ও পঞ্জাবে শতকরা তিন জন ও যুক্ত প্রদেশে তাহারও কম। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যয় পাঁচ বৎসরের মধ্যে সতর লক্ষ পাউণ্ড হইতে তেইশ লক্ষ পাউণ্ডে উঠিয়াছে। আলোচ্যবর্ষে ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি কল্পে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। উন্নতির পরিমাণ যতই অল্প হউক না কেন, ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশে অন্ন কষ্ট হওয়াতে ছাত্র সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই, অনেক স্থানে পূর্ব্বে যেমন ছিল তাহাই আছে। যাহা হউক ছাত্র সংখ্যা যে কমে নাই, ইহাই সুখের বিষয়। সকলকেই শিক্ষা লাভে বাধ্য হইতে হইবে, এই ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতেছে। যুক্ত প্রদেশে একটি আইন পাশ হইয়াছে, যাহা মিউনিসিপালিটি দিগকে বেতন না লইয়া অবশ্য পালনীয় প্রাথমিক শিক্ষাদানের প্রস্তাব প্রচলিত করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট যাহাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা দ্বিগুণ হয় ও বিদ্যালয় গুলির সংখ্যাও দ্বিগুণ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নপর হইয়াছেন। যাহাতে উত্তম শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে তজ্জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিগের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যেখানেই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য লোকের আগ্রহ দেখা যাইতেছে, সেখানেই বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, যদ্দ্বারা এক স্থানে বিদ্যালয় থাকিলে, তাহার খুব নিকটে অন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করা নিষিদ্ধ। কিন্তু এক্ষেত্রে এ নিয়ম অমান্য করা হইতেছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড দিগকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহারা বেতন মাপকরা যেখানে আবশ্যক বোধ করিবেন. করিতে পারিবেন, কেননা গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য এই যে বেতন দিতে অক্ষমতা হেতু কেহ যেন শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত না হয়। এই জন্য যাহা অধিক ব্যয় হইবে, গবর্ণমেণ্ট তাহা বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তিন বর্ষের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যয় পাঁচলক্ষ পাউণ্ড উঠিবে অনুমান করা যায়।

পঞ্জাবেও একটি আইন পাশ হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য স্থানীয় লোকেরা অনুমোদন

করিলে বাধ্যশিক্ষার প্রবর্ত্তনা করা। এই আইন বলে যে যদি কোন গ্রামের অধিবাসি গণের দুই তৃতীয়াংশের মত হয় যে এখানে বাধ্য শিক্ষা প্রচলিত হউক, তথায় উহা প্রবর্ত্তিত হইবে। যে যেখানে বাধ্যশিক্ষ প্র লিত হইতেছে, তথায় বেতন মাপের ও নিয়ম করা হইতেছে। কেননা অনেক ছাত্র বাধ্য শিক্ষা আইন প্রচলিত না হইলে বিদ্যালয়ে যাইত না, ও তাহাদের জন্য বেতন মাপ করা আবশ্যক। তজ্জন্য ইহা নিয়ম করা হইযাছে, যে যেখানে মিউনিসিপ্যালিটী বাধ্য শিক্ষা প্রচলিত করিবে, তথায় মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়ে বেতন লওয়া হইবে না ও মিউনিসিপালিটি সে সব বিদ্যালয় স্থাপিত করে নাই, সেই সব বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগকে বেতন দিতে হইলে বিদ্যালয়ে যে টাকা আয় হইত, সে টাকা মিউনিসিপালিটী ছাত্রদিগের পক্ষ হইতে দিবে। দেশীয় ভাষা শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। ডিষ্টিক্ট বোর্ড, যেসব গ্রামে অন্ততঃ পঞ্চাশটি ছাত্র পাওয়া যাইবে, সেই সব গ্রামে একটি স্কুল স্থাপিত করিবেন। পাচ বৎসরের মধ্যে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। ইহাতে যাহা ব্যয় হইবে তাহার কতক অংশ গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন; আর শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতে উন্নতির যে প্রস্তাব পাঁচ বর্ষে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত হইবে তাহার জন্য বার্ষিক ব্যয় হইবে আশীহাজার পাউণ্ড। বিদ্যালয় সঙ্ক্রান্ত গৃহ নির্ম্মাণ ও সরঞ্জামের জন্য তিন লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে এতদিন বড় বেশী উন্নতি করিতে পারে নাই। সুতরাং এরূপ স্থানেও যে এই সব উন্নতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে, ইহা নিশ্চয়ই আশা-প্রদ।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে বোম্বাই প্রদেশ অন্যান্য অনেক প্রদেশ অপেক্ষা অধিক উন্নতি করিয়াছে। সেখানে শিক্ষা সম্বন্ধে মোট ব্যয়ের অর্দ্ধেক কেবল প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্যই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তথায় প্রত্যেক গ্রামে, যেখানে এক হাজারেরও অধিক লোক আছে, একটি প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয় খুলিবার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতেছে, ও কিছুদিন পরে যে সব গ্রামে পাঁচশত অধিবাসী আছে, তথায় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হইবে এরূপ সংকল্প করা হইয়াছে। ভার্ণাকুলার স্কুল গুলির শিক্ষকদিগের বেতন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে ও গবর্ণমেণ্ট প্রতি জেলায় একটি করিয়া গুরু ট্রেনিং স্কুল খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। সেখানে এক বৎসর অধ্যাপনা কার্য্য শিক্ষা করিতে হইবে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট আর একটী অতি উদার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাতে মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগের নিজ নিজ এলাকার মধ্যে বাধ্যশিক্ষা প্রচলন করেন, তদুদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যাহা খরচা হইবে তাহার অর্দ্ধেক বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

কতকগুলি মিউনিসিপালিটি ইতি মধ্যেই বাধ্য শিক্ষা প্রচলন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদিগের দৃষ্টান্ত অনেকেই অনুসরণ করিবে, এরূপ আশা করা যায়।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে আইন দ্বারা মিউনিসিপালিটী ও ইউনিয়ন দিগকে বালকদিগের পক্ষে বাধ্যশিক্ষা প্রচলন করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। মিউনিসিপালিটি ও ইউনিয়নের সভ্যগণ, দুই পাঁচজন ছাড়া, প্রায় সকলেই এদেশের লোক, সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ভার তাঁহাদিগের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। যাহাতে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি ও টাকার সদ্ব্যবহার হয় সে বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মধ্য প্রদেশে ও একটী বাধ্যশিক্ষা আইন পাশ হইয়াছে কিন্তু যেহেতু শাসনসংস্কার আইন অনুসারে অতঃপর একজন দেশীয় মন্ত্রীর হস্তে শিক্ষা বিভাগের ভার প্রদত্ত হইবে সেজন্য অধুনা এবিষয়ে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় বিবেচনা হয় নাই। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের তালিকা সংশোধিত করিয়া তৎসম্বন্ধে জন সাধারণের মতের জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

যাহা হউক এই পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে ও ভবিষ্যতে তাহার ফল দেখা দিবে। যদি উন্নতির গতি এইরূপ থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালা প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার অনেকটা সন্তোষকর হইবে।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে এদেশে অনেকগুলি প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমতঃ পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব। দ্বিতীয়তঃ পাঠ্যপুস্তক যত সতর্কতার সহিত নির্ব্বাচিত করা যাউক না কেন, স্বধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। বিশেষতঃ ইঁহারা স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকীয়তা কিম্বা উপকারিতা সম্বন্ধে বড় আস্থাবান নহেন। তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী পরীক্ষা প্রথা দ্বারা শাসিত ও এই প্রথা স্ত্রী জাতির পক্ষে কখনই উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তাহার উপর আছে অবরোধ প্রথা ও বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অন্তরায়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা উন্নতির গতি যে এত মন্দ হইতেছে তাহার প্রধান কারণ অধিকাংশ লোকই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী নহে ও তাহারা ইহা চায় না। গত পাঁচবর্ষের মধ্যে কিন্তু এদিকেও উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এই সময়ের মধ্যে যে স্ত্রীলোকেরা শিক্ষালাভ করিতেছে তাহাদিগের সংখ্যা বাড়িয়াছে ও ছাত্রীগণের জন্য কতকগুলি উৎকৃষ্ট কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিরুদ্ধে অনেক বলবান কারণ রহিয়াছে, অথচ ইহাও নিশ্চয় যে যতদিন সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীজাতি অশিক্ষিতা

থাকিবে, ততদিন, অপর অর্দ্ধাঙ্গ, অর্থাৎ পুরুষজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পরিসর ও সংকীর্ণ থাকিবে। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে সম্যক উন্নতি হইতেছে না—ইহা একটি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ভাবনার বিষয়। আলোচ্যবর্ষের শেষে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রশ্ন আলোচনা করিয়া একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যাহাতে তাঁহারা কি কি বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিলেন ও কোনপথে উন্নতির সম্ভাবনা তাহা নির্দ্দেশ করিয়াদিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রথমটি পাঠ্যপুস্তক ও বিষয়ের তালিকার এরূপ সংশোধন, যদ্দ্বারা উহা সকলশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী হয় ওদ্বিতীয়টি শিক্ষা-প্রণালী সংশোধন যাহা স্ত্রীলোকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া করিতে হইবে। এই দুইটি প্রস্তাবই গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাও দেখাইয়াছেন যে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা অনেকটা সাহায্য করিতে পারেন এবং যে যে স্থানে স্থানীয় লোকদিগের মতানুযায়ী বাধ্য শিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে তথায় বালিকাদিগকেও শিক্ষাদান করিবার জন্য উক্ত আইন তাহা-দিগের পক্ষেও প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বলিতে কি ভারতীয় নারীগণকে শিক্ষিতা করিলে দেশের কতদূর উপকার ও উন্নতি হইবে, তাহা এ দেশের লোকেরা এখনও বুঝিতে পারে নাই। কেবল অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। কিন্তু এখন যখন শিক্ষাবিভাগের ভার, শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হস্তে অর্পিত হইতে চলিল, আশাকরা যায় যে তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে অনেকটা সফলতা লাভ করিবেন ও এই বিষয়ে সাধারণের উৎসাহলাভ করিতে পারিবেন। মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে কতকগুলি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। শিক্ষাসম্বন্ধে হিন্দুদিগের সহিত তুলনায় ইঁহারা পশ্চাতে আছেন বটে, কিন্তু গত পাঁচবৎসরের বিশেষ চেষ্টারফলে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত তুলনায় শিক্ষাসম্বন্ধে ইঁহারা যে স্থান অধিকার করেন সমগ্র অধিবাসি সংখ্যার সহিত তুলনায় বাঙ্গালার সমগ্র মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণ ও সেইস্থান অধিকার করেন। মুসলমানদিগের বড়ই প্রশংসার বিষয় এই যে শিক্ষাবিষয়ে এই বর্ত্তমান উন্নতি অনেকটা তাঁহাদিগের নিজের চেষ্টার ফল ও আলোচ্যবর্ষে সেই আত্মো-ন্নতি চেষ্টার নিদর্শন আরও অধিক পরিমাণে দেখা গিয়াছিল। স্থানে স্থানে মুসলমান-দিগের শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল ও বক্তাগণ মুসলমানগণ যে শিক্ষা সম্বন্ধে কতদূর পশ্চাতে রহিয়াছে তাহা দেখাইয়া সমগ্র সমাজের প্রতি ঔদাসীন্যের নিন্দারোপ করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় আলীগড়ের মুসলমান এংগ্লো ওরিএণ্টাল কলেজ সম্বন্ধে

সকল গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে ও কলেজ এক্ষণে পুনরায় ভারতবর্ষের মধ্যে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কলেজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। শীঘ্রই ইহাকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার কল্পনা আছে। কেবল মুসলমানদিগের মধ্যে প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষার উন্নতি করিবার জন্য কোন কোন প্রদেশে, বিশেষতঃ যুক্তপ্রদেশে, বাঙ্গালায় ও বোম্বাই এ কতক পরিমাণে টাকা দেওয়া হইয়া থাকে ও মুসলমান শিক্ষা পরিদর্শনের জন্য স্বতন্ত্র পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছে ও মুসলমান শিক্ষকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে মুসলমানগণ এখনও অনেক পশ্চাতে রহিয়াছেন। কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে মুসলমানদিগের সংখ্যা অতি কম।

দেশীয় রাজ্য সমূহের মধ্যে কোন কোন স্থানে শিক্ষা সম্বন্ধে উন্নতির গতি অপ্রতিহত ছিল। দক্ষিণে হায়দরাবাদে যে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এখানে উর্দ্দু ভাষায় সকল পড়া শুনা হইয়া থাকে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সকল বিষয়ে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক অন্য ভাষা হইতে উর্দ্দুতে অনুবাদ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। মহীসুর রাজ্যে ইতিমধ্যেই একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও উহা উত্তমরূপে চলিতেছে। বরোদা ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার উদ্যোগ হইতেছে। অনেক দেশীয় রাজ্যেই শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বরোদা রাজ্যই এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী। এই রাজ্যে রাজস্বের শতকরা এগার টাকা বিদ্যা বিস্তারের জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। এ রাজ্যে বাধ্যশিক্ষা আইন পাস হইয়াছে, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে দুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক রোগের প্রভাবের জন্য ইহা আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে দেশীয় রাজ্যদিগের মধ্যে যাহারা অধিক উন্নতিশালী, তাহারা শিক্ষা বিস্তারের উপকারিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছে ও কিছুদিনের মধ্যে তাহাদিগের অধিবাসিগণ শিক্ষিত হইতে পারিবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

ইউরোপীয় ও এদেশবাসী শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ভালই হইতেছে। নূতন শাসন সংস্কার আইন প্রচলিত হইলে, শেষোক্ত অধিবাসিগণের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা একটি ভাবনার বিষয় ছিল। কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং তাঁহাদিগের মধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হয়, সে বিষয়ে যত্নপর হইয়াছেন। অধিবাসি শ্বেতাঙ্গগণ তাঁহাদিগের শিক্ষার জন্য ব্যয়ের অর্দ্ধেকেরও অধিক নিজেরা বহন করিয়া থাকেন।

অস্পৃশ্য জাতি, অসভ্য জাতি ও স্বভাবতঃ দুর্ব্বৃত্ত জাতিদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য খ্রীষ্টান পাদরীগণ ও মুক্তিফৌজ পূর্ব্বের ন্যায় চেষ্টা করিতেছেন। দুর্ব্বৃত্ত জাতিদিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিতেছেন ও

পাঞ্জাব ও বোম্বাই প্রদেশে তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যা বিস্তার মন্দ হইতেছে না। ইহা-দিগের সংখ্যা সর্ব্বসমেত চল্লিশ লক্ষ ও ইহাদের মধ্যে মোটে হাজার করা পাঁচ জন লোক শিক্ষিত হইতেছে। অসভ্য জাতিদিগের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। ইহাদিগের মধ্যে হাজার করা পনর জন শিক্ষা পাইতেছে। অস্পৃশ্য জাতিদিগের সংখ্যা তিন কোটী কুড়ি লক্ষ। ইহাদের মধ্যে শতকরা একজন মাত্র শিক্ষা পাইতেছে সুতরাং এখনও অনেক বাকি আছে। তবে যেটুকু হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে আশাপ্রদ বলা যাইতে পারে।

শিল্প শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, বাণিজ্য সম্বন্ধীয় ও কৃষি সম্বন্ধীয় শিক্ষার প্রতি লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে। যুদ্ধ উপলক্ষে ভারতবর্ষের কল কারখানা গুলি বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বাণিজ্য সংক্রান্ত নানাবিধ অনুষ্ঠানের জন্য শিল্প শিক্ষার বন্দবস্ত করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল। প্রতি বর্ষে দুইলক্ষ পাউণ্ড টাকা শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য বরাদ্দ হইয়া থাকে। ১৯১৮-১৯ সালে উক্ত বরাদ্দ হইতে ষাট হাজার পাউণ্ড টাকা কেবল শিল্প বিদ্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার উপর গম বিক্রয় লব্ধ লাভ হইতে আরও বার হাজার পাউণ্ড এই জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং শিল্প শিক্ষা বিস্তারের উন্নতির কল্পে আলোচ্যবর্ষে ব্যয় বড় কম হয় নাই। দিন দিন যেমন কল কারখানার সংখ্যা বাড়িবে, সেই সঙ্গে শিল্প শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকদিগের চাকুরী যোগাড় করা সহজ হইয়া পড়িবে। এই চাকুরি যোগাড় দুঃসাধ্য বলিয়াই এদেশে শিল্প শিক্ষা বিস্তারে এত দেরী হইতেছে। কিন্তু কি গবর্ণমেণ্ট কি জন-সাধারণ উভয়েই শিল্প শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়কেই শিল্প সম্বন্ধীয় উচ্চ শিক্ষার বন্দ-বস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু অতঃপর শিক্ষা বিভাগের ভার দেশীয় মন্ত্রী-দিগের হস্তে অর্পিত হইতেছে, সুতরাং দেশের লোকেদের চেষ্টার উপর শিল্প শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার অনেকটা নির্ভর করিবে। আশা করা যায় যে এখন যেমন লোকে শিল্প শিক্ষা উন্নতির প্রস্তাব সাদরে অনুমোদন করিয়া থাকেন, তখনও তাঁহারা এই প্রস্তাবগুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হইবেন। কিন্তু দেশের অধিবাসীগণের মধ্যে শতকরা সত্তর জন কৃষিকার্য্য হইতেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সুতরাং কৃষি শিক্ষার উন্নতি করিলেই দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনবৃদ্ধির সম্ভাবনা। পুষায় কৃষি-বিদ্যালয়ে কৃষি সম্বন্ধীয় অনেক উন্নতির প্রস্তাব পরীক্ষিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, ও বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ও কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ম্মাপ্রদেশে কৃষিবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব প্রস্তুত হইয়াছে, ও বাঙ্গালাপ্রদেশ

ও নিজের কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনে মনস্থ করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও কৃষি সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষার বন্দবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মোটামুটি কৃষিশিক্ষার বন্দোবস্ত ও করা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মধ্য প্রদেশে দুইটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এখানে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কৃষি বিদ্যালয়ের চেষ্টার ফলে কৃষকগণ এখন নূতন সার, নূতন যন্ত্র, ও নূতন প্রথার পক্ষপাতী হইতেছে। সেই জন্য তাহারা তাহাদিগের ছেলেদের জন্য এমন রকমের শিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে যদ্দারা তাহারা কৃষি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে। ইতি মধ্যেই যাহারা কৃষি বিদ্যায় উপাধি লাভ করিয়াছে, তাহাদিগের বাজারে দাম বেশী হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে তাহাদিগের চাকুরীর অভাব নাই। পঞ্জাব প্রদেশে গ্রাম্য বিদ্যালয় সমূহে কৃষি শিক্ষার বন্দবস্ত হইতেছে ও শিক্ষকগণও যাহাতে উক্ত বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে, লায়ালপুর কলেজে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। বাঙ্গালা-প্রদেশে দুইটী মধ্যশ্রেণীর কৃষিবিদ্যালয় খুলিবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে ও যুক্তপ্রদেশে বুলন্দসহর নগরে শীঘ্রই একটি বৃহৎ কৃষি বিদ্যালয় খোলা হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাজা ও প্রজা

ভারতবর্ষের ন্যায় একটী বৃহৎ দেশে স্বাস্থ্যরক্ষা বড় সহজ ব্যাপার নহে। দেশীয় রাজ্যগুলি বাদ দিয়া কেবল ইংরাজ শাসিত ভারতের অধিবাসী সংখ্যা চব্বিশ কোটী ও শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে তাহাদিগের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। ইউরোপের ন্যায় মহাদেশে যত বিভিন্ন জাতি আছে তাহাদিগের মধ্যে পরস্পরের যত প্রভেদ, ভারতবাসী বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে প্রভেদ তাহা অপেক্ষাও অধিক। এই জাতিদিগের মধ্যে অনেকেই বহুকাল হইতে পরস্পরের সাহত মারামারি কাটাকাটি করিয়া আসিতেছিল ও যদিও ইংরাজ শাসনে ইহা এখন অসম্ভব হইয়াছে, তথাপি সুবিধা পাইলেই এখনও মধ্যে মধ্যে সেই পুরাতন বিদ্বেষের চাপা আগুন জলিয়া উঠে ও কোন প্রবল জাতি কর্ত্তৃক নিকটস্থ কোন দুর্ব্বল শান্তিপ্রিয় জাতি আক্রান্ত হইয়া থাকে। অপরদিকে সহরের সুশিক্ষিত সম্প্রদায় যাঁহারা সমাজের অন্য অন্তে রহিয়াছেন ও যাঁহারা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় অভ্যস্ত ও পুলিশের কৃত অত্যাচারের ও প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত। এই দুই অন্তের মধ্যে অসংখ্য বিভিন্ন থাক্ আছে। সুতরাং এ দেশে যে শান্তি ভঙ্গ প্রায়ই হয় না, এটা পুলিশ কর্ম্মচারিগণের প্রশংসার বিষয় বটে। সমগ্রভারতবর্ষে ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও তদপেক্ষা উচ্চ কর্ম্মচারির সংখ্যা একহাজারের ও কম ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারি ও পাহারাওয়ালার সংখ্যা দুইলক্ষের কিছু অধিক। আলোচ্যবর্ষে পুলিশ কর্ম্মচারিগণ যে শিক্ষিতদিগের চক্ষে অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সংবাদপত্রে তাহাদিগের উপর আক্রমণ অনেক কমিয়াগিয়াছিল ও পুলিসের বিরুদ্ধে নালিসের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখনও জনসাধারণে পুলিসকে বিশ্বাস করে না। লোকের এখনও বিশ্বাস যে কনষ্টেবলগণ নিরীহব্যক্তিকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করা অপেক্ষা তাহার উপর জুলুম করিতেই অধিক অভ্যস্ত। অবশ্য এক সময় ছিল যখন ঘুষ ও অত্যাচার খুবই চলিত ও সেই সংস্কার এখনও দূর হয় নাই। তবে অন্যান্য বিভাগে যেমন অনেক উন্নতির স্থান আছে, তেমনি পুলিসবিভাগেও আছে। উন্নতির প্রধান উপায় ব্যয় বৃদ্ধি করা কিন্তু টাকার অভাবে সব বিভাগেই উন্নতির গতি ক্ষীণ হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষে পুলিসের বাবদে খরচা ১৯১৭ সালে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল। অধিবাসি সংখ্যা ধরিলে মাথা পিছু চারপেনি মাত্র।

পুলিসবিভাগে যে দোষ আছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে অর্থাভাবে নিম্নতন কর্ম্মচারিদিগকে উপযুক্ত বেতন দেওয়া হয় না। সুতরাং যাহারা উৎকোচ গ্রহণের লোভ সম্বরণ করিতে পারে এরূপ ভাল লোক পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্ট একথা বেশ বুঝিয়াছেন ও আলোচ্যবর্ষে বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে কতকটা কার্য্য করা হইয়াছে। সরকারি বিভাগ সমূহের কর্ম্মচারিগণকে উপযুক্ত বেতন না দিলে কার্য্য ভালরকম হয় না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু যতদিন না জন সাধারণে একথা বুঝিতে পারে, ততদিন বিশেষ কিছু উন্নতি করা সম্ভব হয় না। বেতনবৃদ্ধি, ভবিষ্যতে পদোন্নতি ও বাসস্থানের বন্দবস্তের উন্নতি সংক্রান্ত প্রস্তাব অনেকস্থলেই হয় কার্য্যে পরিণত হইয়াছে অথবা হইবার উপক্রম হইতেছে। কিন্তু এখনও লোকাভাবে অনেক পদ খালি আছে। তবে এইসব চাকরি বোধহয় বেশীদিন খালি থাকিবে না, এরূপ সূচনা দেখা দিতেছে। পুলিস বিভাগে নিয়ম অমান্য করা অপরাধ অনেক কমিতেছে ও সুতরাং বিভাগীয় শাস্তিপ্রাপ্ত কর্ম্মচারির সংখ্যাও কমিতেছে। বিভাগীয়লোকদিগের বেতনবৃদ্ধি ও অন্যান্য হিসাবে উন্নতির জন্য আলোচ্যবর্ষে দুইলক্ষ পাউণ্ড ব্যয়করা মঞ্জুর হইয়াছিল ও ইহার সুফল ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে। বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়া বর্ষের শেষে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। সত্যগ্রহ সম্বন্ধীয় পাঞ্জাব ও বোম্বাইএ হাঙ্গামার জন্য এই বৎসর পুলিসের উপর বিষম গুরুভার পড়িয়াছিল। কেননা যখনই কোথাও শান্তিভঙ্গ হয় তখন পুলিসই সর্ব্বপ্রথম আক্রান্ত হইয়া থাকে। এখানেও তাহাই হইয়াছিল। পুলিস যদি বিশেষ কর্ম্মক্ষম না হইত, তাহা হইলে ব্যাপার আরও ভীষণ আকার ধারণ করিত। কিন্তু ইউরোপীয় যুদ্ধের জন্য লোকের মনে একটা উদ্বেগ জন্মিয়াছিল ও তাহার উপর জিনিষপত্র দুর্ম্মূল্য হওয়াতে চুরি ডাকাতিও বাড়িয়াছিল। এদেশে দেখাযায় যে যে পরিমাণে দ্রব্যাদি মহার্ঘ হয় সেই পরিমাণে চুরি ডাকাতিও বাড়িয়া থাকে। দেশের স্থানে স্থানে খাদ্য লুণ্ঠন ব্যাপার লইয়া হাঙ্গামা হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্জাবেও সীমান্ত-প্রদেশে এই সংক্রান্ত অপরাধের বৃদ্ধি হয় নাই ও হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামা এবর্ষে আদৌ ঘটে নাই।

এ দেশে ডাকাতি দমন সহজ ব্যাপার নহে। যুক্তপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশে এখনও অনেক স্থান আছে যথায় অধিবাসিদিগের সংখ্যা অতি অল্প ও পথ অভাবে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনও সুসাধ্য নহে। সুতরাং এই দুই প্রদেশে ডাকাতি দমনের পথে অনেক বিঘ্ন আছে। যুক্ত প্রদেশে ১৯১৯ সালে স্থানে স্থানে পুলিসের সহিত ডাকাতদলের রীতিমত যুদ্ধ হইয়াছিল। এই ডাকাতদলদিগকে ধৃত করা কি শাস্তি দেওয়া সহজ নহে, কেননা যে স্থানে ইহারা ডাকাতি করে, তথাকার অধিবাসিগণের

উপর এমন নির্ম্মম ভাবে অত্যাচার করে, যে তাহারা ভয়ে ডাকাতদিগের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে নারাজ। সুতরাং যখন ডাকাতি করিতেছে সেই সময় তাহাদিগকে ধরিতে না পারিলে আর কিছুই করিতে পারা যায় না, কারণ ডাকাতরা খুব শীঘ্র তাহাদিগের কাজ চুকাইয়া পলায়ন করে। সুখের বিষয় কোন কোন স্থানে গ্রামবাসীগণ এখন পুলিসের সহিত একযোগে ডাকাত দমনে প্রবৃত্ত হইতেছে, ও এক্ষণে কোন কোন স্থানে তাহারা এবং অল্প বেতনভোগী চৌকিদারগণ বিলক্ষণ সাহসের পরিচয় দিতেছে। কতকগুলি ডাকাতের সর্দ্দারদিগকে ধৃত করিতে পারিলে পুরস্কার দিবার ঘোষণা করা হইয়াছিল। মধ্যপ্রদেশে সাগর জেলায় ধীরাজ ও কুঞ্জল সিংহ নামে দুইজন সর্দ্দার ছিল। তাহাদিগের অত্যাচারে জেলা কম্পমান হইয়াছিল। তাহাদিগের দ্বারা পঁয়তাল্লিশটী চুরি ও ডাকাতি হইয়াছিল। তাহাদিগের দৃষ্টান্তে আবার অনেকগুলি ছোট ছোট ডাকাতের দল সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা একজন হেড কনষ্টেবলকে খুন করিয়াছিল ও একজন গোয়ান্দাকে ধরিয়া গাছে বাঁধিয়া তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে। অনেক পুলিশ কর্ম্মচারি ও চৌকিদার এই ডাকাতের দল ধৃত করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু ডাকাত দিগের ভয়ে কেহ পুলিসকে ডাকাত দিগের আগমনের খবর যথা সময়ে দিতে পারিতনা, ও পুলিশ তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ডাকাত গণ অন্য স্থানে পলাইয়া যাইত। যাহা হউক অনেক চেষ্টার পর পুলিস এই ডাকাতের দলের সর্দ্দার দিগকে হত্যা করিতে ও দল ভাঙ্গিয়া দিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

অতি অল্পসংখ্যক পুলিশের সাহায্যে এত বড় একটি দেশে চুরি ডাকাতি নিবারণ করা সম্ভব নহে, যগ্যপি জন সাধারণের নিকট এ বিষয়ে পুলিশ যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত না হয়। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে সাধারণের দায়িত্ব বোধ অল্প দিনে হয় না। তবে আশা করা যায় যে দেশে স্বায়ত্ব শাসন প্রচলনের সঙ্গে এই দায়িত্ব বোধ ও বৃদ্ধি পাইবে। কোন কোন স্থানে জন সাধারণ পুলিসকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাহা দিগের প্রতিকূলতাচরণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় হাঙ্গামায় ইহা প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে। যুক্ত প্রদেশ হইতে দুইটি নরবলির সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। কোন দেবতা বা দেবীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য একটি বালক ও একটি বালিকাকে বলি দেওয়া হইয়াছিল। যাহারা বালকটিকে হত্যা করিয়াছিল, তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা বালিকাটিকে হত্যা করিয়াছিল স্থানীয় লোকদিগের বিপক্ষতায় তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে নাই। সুখের বিষয় এ সম্বন্ধে সাধারণের ভাবগতিক ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের একটি কারণ লোকের মনে চোর ডাকাতের অত্যাচারের প্রতি বিরক্তি জন্মিতেছে ও দ্বিতীয় কারণ পুলিশের

উক্ত অত্যাচার দমনে অধিক পরিমাণে সাফল্য। ইহার একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। মালাবার উপকূলে মোপ্‌লা নামে একটি মুসলমান অর্দ্ধসভ্য জাতি আছে, ইহারা বড়ই কুসংস্কারাপন্ন। ইহারা একবার ক্ষেপিয়া অনেক লোককে হত্যা করে ও পরে দুর্গের ন্যায় একটি সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় লয়। তাহা দিগের বিরুদ্ধে গোলা গুলি সহিত কতকগুলি সৈন্য প্রেরিত হয় ও মোপলা গণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। এই সব দেখিয়া ও লোকের মনে ডাকাত দমনে কতক সাহস সঞ্চার হইয়া থাকে।

অরাজকতা ঘটাইবার উদ্দেশে অপরাধের সংখ্যা আলোচ্যবর্ষে কমিয়া গিয়াছিল। ১৯০৭ সালের পর এই বর্ষই প্রথম যাহার মধ্যে একটি ও বেসরকারি লোক অরাজকতা-কারি দল দ্বারা নিহিত হয় নাই। কিন্তু তিনজন সাহসী পুলিস কর্ম্মচারি দুর্বৃত্ত দিগকে ধরিতে গিয়া তাহাদের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিল। এই বৎসর অনেক গুলি অরাজকতা-কারি দলের দলপতি ধৃত হইয়াছিল ও বাঙ্গালার স্থানে স্থানে হত্যাকারিদের অনেক লুক্কায়িত অস্ত্রও যুদ্ধের উপকরণও পাওয়া গিয়াছিল। এবর্ষে অরাজকতা-কারি দল দমনে পুলিস যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিল তাহা হইতে আশা করা যায় যে তাহারা কিছুদিনের মধ্যে একার্য্যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারিবে। এইসব দল এখন ও বিদ্যমান আছে তবে ইহা দিগের ক্ষমতা অনেক কমিয়া যাইতেছে। আশা করা যায় যে এখন যখন দেশের শাসন ভার দেশীয় দিগের হস্তে দেওয়া যাইতেছে, বিপ্লব কারিগণ হত্যা কাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া অন্য ও সাধু উপায়ে তাহাদিগের উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। আলোচ্য বর্ষের মধ্যে কেবল একটি মাত্র রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করণের মোকর্দ্দমা উঠিয়াছিল। ইহা মৈনপুরি জেলায় হইয়াছিল ও সেপ্টেম্বর মাসে বিচারকের রায় প্রকাশ হইয়াছিল। এই মোকর্দ্দমায় প্রমাণ হইয়াছিল যে ষড়যন্ত্রকারি দিগের পঞ্চাশ জন লোক ছিল ও তাহারা যুক্ত প্রদেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বয়স্ক ব্যক্তি দিগের দুষ্পরামর্শে কতকগুলি বালক ইংরাজ দিগকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার সংকল্প করে। ইহাদিগের কার্য্য প্রণালী চারি রকম ছিল। প্রথমতঃ তাহাদিগের বিপ্লবকারি মত প্রচার করা, দ্বিতীয়তঃ দেশীয় সৈন্য দিগকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা, তৃতীয়তঃ চরের দ্বারা গুপ্তসমাচার সংগ্রহ করা ও চতুর্থতঃ শ্রমজীবি দিগের মধ্যেগোলযোগ ঘটান। ইহারা অতি অল্প পরিমাণে আগ্নেয়যন্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল ও তাহার সাহায্যে কতকগুলি লোমহর্ষণ অত্যাচার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। হর্দ্দয় জেলায় এক ধনশালী ব্রাহ্মণ বিধবা বাস করিত। তাহার দুই একটি চাকরাণিছিল, কিন্তু বাড়ীতে একটি ও পুরুষ বাস করিতনা। দুর্বৃত্তগণ তাহার বাড়ী আক্রমণ করিয়া একটি চাকরাণীকে গুলি করিয়া হত্যাকরে ও গৃহস্বামিনীকে ভয় দেখাইয়া ও যন্ত্রণা দিয়া তাহার টাকা কোথায় রাখিয়াছে তাহার সন্ধান

লয়। প্রায় ছয় হাজার টাকা লুট করিয়া তাহারা প্রস্থান করে, কিন্তু পথিমধ্যে দুই জন গ্রামের লোক তাহা দিগকে বাধা দেওয়াতে এই দুই ব্যক্তিকে গুলি করিয়া হত্যা করে। পুলিসের ডিটেকটিব বিভাগের যত্নে এই দুর্ব্বৃত্তগণ ধরাপড়ে, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা ও এ বিষয়ে পুলিসের অনেক সাহায্য করিয়াছিল। যদিও স্থানে স্থানে এইরূপ অত্যাচার হইয়া ছিল কিন্তু তত্রাচ বিপ্লবকারি দিগের দমনের জন্য যে নূতন আইন করা হইয়াছিল (রৌলাট আইন) তাহার সাহায্য লওয়া হয় নাই।

আলোচ্যবর্ষে দেশের কয়েদীদিগের অবস্থা সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ছিল। এ দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কয়েদী দিগের সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে ও সুতরাং সর্ব্বত্র বন্দোবস্ত সফল হয় নাই। এযাবৎ কয়েদি দিগের উন্নতি সম্বন্ধে যে যে চেষ্টা হইয়াছে সে সম্বন্ধে ইউরোপে লোকের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জেলের অধ্যক্ষ গণের মধ্যে পরস্পর মতামতের বিনিময় হয় না ও সুতরাং একজন অপরের অভিজ্ঞতার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। অবশ্য সব প্রদেশেই এক প্রণালী প্রবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয় নহে কিন্তু তবু কয়েদি পালনের প্রধান প্রধান বিষয় সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই এক নিয়ম প্রচলিত হইতে পারে। ভারতবর্ষের জেল সম্বন্ধীয় কার্য্যের তদন্তের জন্য ১৯১৯ সালের মে মাসে একটি কমিশন নিযুক্তকরা হইয়া ছিল। এই তদন্তের উদ্দেশ্য ছিল এই যে ইউরোপে জেলখানা চালনের প্রণালী যে যে বিষয়ে সংশোধিত হইয়াছে, সেই সংশোধন যতদূর সম্ভব এই দেশীয় জেল সমূহে প্রচলন করা। এই কমিশনের বৈঠক লণ্ডন নগরে হইয়াছিল ও কমিশন বিলাতে জেলখানা গুলি কি ভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশে জেল সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে এই কমিশন তাহাও স্বচক্ষে দেখিয়া ছিলেন। অবশেষে আলোচ্য বর্ষের শেষে কমিশন এ দেশে আগমন করিয়া তাঁহাদিগের কার্য্য আরম্ভ করেন। তাহাঁরা এ দেশের জেল সমূহ পরিদর্শন করিয়া বর্ত্তমান প্রণালী কি পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছে ও এ দেশের উপযোগী তদ্বিষয়ে মত প্রকাশ করিবেন। তাঁহারা আন্দামান দ্বীপে কয়েদিগণ কিরূপ অবস্থায় থাকে, দুষ্কর্ম্মকারি জাতিদের উপনিবেশ গুলি কিরূপ চলিতেছে, কয়েদি গণ সম্বন্ধে অবস্থা ও বয়স ভেদে পৃথক বন্দবস্ত করিলে তাহাদিগের চরিত্র সংশোধনে কতদূর সহায়তা হইতে পারে এ সব বিষয়ে ও মত প্রচার করিতে আদিষ্ট হইয়া ছিলেন।

কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া ইহা যেন কেহ অনুমান না করেন যে ইতি পূর্ব্বে কয়েদি দিগের অবস্থা বহুকাল হইতে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে যে সব জেলের বন্দোবস্ত সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম তাহারা কোন কোন বিষয়ে

ইউরোপের জেল গুলির অপেক্ষা ভাল। কোন কোন প্রদেশে গুণের জন্য কয়েদি দিগকে পদোন্নতি, স্বতন্ত্র পোষাক ও এমন কি কিছু কিছু বেতন দিবার প্রথা অনেক দিন হইতেই প্রচলিত আছে। কয়েদি দিগের চরিত্র সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। তাহা দিগকে অর্থকরি নানা রকম শিল্প বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে যদ্দ্বারা তাহারা কারা মুক্তির পর গতর খাটাইয়া সৎ উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। ভারতবর্ষে কয়েদির সংখ্যা একলক্ষ সত্তরের উপর হয় না। তাহাদের মধ্যে নব্বই হাজার কৃষিজীবি। এই জন্য জেলে তাহা দিগকে কৃষি সম্বন্ধীয় অনেক নূতন ও প্রয়োজনীয় বিষয় কৃষিবিভাগের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে। কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারি গণ তাহা দিগকে লইয়া আদর্শক্ষেত্রে নানা রকম আবশ্যকীয় বিষয় বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। মধ্য প্রদেশের জেল সংশ্লিষ্ট কৃষি ক্ষেত্রে উৎপন্ন দ্রব্য হইতে কয়েদি দিগের মজুরির খরচা পোষাইয়া বর্ষ শেষে কিঞ্চিৎ লাভ থাকে। বহুদিন হইতে ভারতবর্ষীয় জেল সমূহে কয়েদি দিগের পরিশ্রমে অনেক রকম কাজ হইতেছে। যথা ছাপাখানা চালান, তৈল নিষ্পেশন করা, ইট ও টালী নির্ম্মাণ করা কার্পেট কাগজ ও কাপড় প্রস্তুত করা প্রভৃতি। সে গুলি ভালই চলিতেছে ও তদ্দ্বারা জেল বিভাগের খরচার কতকাংশ আদায় হইতেছে। খরচা কিন্তু প্রতি বর্ষেই বাড়িতেছে। ১৯১৭ সালে ছিল ছয় লক্ষ পাউণ্ড। ১৯১৮ সালে ইহা বাড়িয়া হইয়াছিল সাড়ে সাতলক্ষ পাউণ্ড। এই ব্যয় বৃদ্ধির কারণ প্রথমতঃ কয়েদি দিগের সংখ্যা ১৯১৭ সালের অপেক্ষা পরবর্ষে চারি হাজার বাড়িয়া ছিল ও দ্বিতীয়তঃ খাদ্য দ্রব্যের দাম অনেক বাড়িয়াছিল। ১৯১৭ সালে কয়েদি দিগের পরিশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ে নব্বই হাজার পাউণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। পরবর্ষে ইহা আট হাজার পাউণ্ড বাড়িয়াছিল। জেল শিল্প সম্বন্ধে এখন ও অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং এ বিষয়ে কমিশনের প্রস্তাব অপেক্ষা করা হইতেছে। জেল খানার প্রধান উদ্দেশ্য কেবল শাস্তি দেওয়া নহে, শাস্তির সহিত শিক্ষা দেওয়া ও চরিত্র সংশোধন করা।

এ দেশে সমাজ সংস্কারের প্রতি শিক্ষিত সমাজের অনুরাগ সঞ্চার হইবার সঙ্গে সঙ্গে বালক কয়েদি দিগের বিষয় ও বিবেচনাযোগ্য হইয়াছিল। অনেক প্রদেশের জেলে ষোল হইতে তেইশ বর্ষ পর্য্যন্ত কয়েদি দিগকে অন্য কয়েদি হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইয়া থাকে। তাহা দিগের কেবল নৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখা হয় না, তাহার সঙ্গে ব্যায়াম ও ড্রিল শিক্ষা ও দেওয়া হইয়া থাকে। যে সমস্ত প্রদেশে রাজদ্রোহ অপরাধে দণ্ডিত যুবক দিগকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করা হইতেছে, তথায় এ সম্বন্ধে অনেক সফলতা লাভ করা হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে যুবক কয়েদির সংখ্যা একশত চল্লিশ হইতে একশত আশী হইয়াছে। ইহারা ক্লাসে সন্তোষজনক কার্য্য দেখাইয়াছে ও বর্ষ শেষে ছুতর কামার রাজমিস্ত্রি ও মালির কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পঞ্জাবে ও বরষ্টলজেলের কয়েদি দিগের কারখানায় কাজ অতি উত্তম হইতেছে ও তাহাদিগের শিক্ষার উন্নতি করা হইয়াছে। ধারিওয়ালে পশমী কাপড়ের কল সমস্ত বৎসর কেবল গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই জেলায় কয়েদিরাই শ্রমজীবির কার্য্য করিয়াছিল। তাহাদের কাজ এত সন্তোষজনক হইয়াছিল যে কলের ম্যানেজারের বিশেষ অনুরোধে কয়েদি শ্রমজীবি দিগের সংখ্যা গড়ে দৈনিক প্রায় চারিশতে উঠিয়াছিল। আরও সুখের বিষয় এই যে এই কয়েদিদিগের মেয়াদ ফুরাইলে উক্ত কাজেই তাহারা চাকুরি পাইবে ও বাসস্থান ও পাইবে। কলের কর্ত্তৃপক্ষগণ আরও অঙ্গীকার করিয়াছেন, যে উহাদিগের আরও উচ্চশিক্ষার বন্দবস্ত করিবেন যদ্দারা ভবিষ্যতে উহাদিগের পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হইতে পারিবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কয়েদিদিগকে কেবল ভাল শিক্ষাদানেরই বন্দবস্ত করিতে পারেন, জন সাধারণে তাহাদিগকে উপযুক্ত কাজ না দিলে কোন সুফলই হইবে না। এদেশে কারামুক্ত কয়েদিদিগের সাহাষ্যার্থ কতকগুলি সভা আছে যাহারা ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতেছেন কিসে মেয়াদমুক্ত কয়েদীগণ চাকরি পাইয়া ভবিষ্যতে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকে। ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মুক্তিফৌজের উল্লেখ করা উচিত। বোম্বাই সহরে কয়েদিদিগের মঙ্গলার্থ তিন বৎসর বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। এই প্রদেশের অন্যান্য স্থানেও এই উদ্দেশ্যে সভা স্থাপিত হইয়াছে। বলিতে কি ভারতবর্ষের প্রত্যেক বড় সহরেই এইরূপ সভা আছে। তবে সাধারণে যদি একার্য্যে অনুরাগী হন, তাহা হইলে এখন অপেক্ষা অনেক অধিক গুণ কাজ হইতে পারে।

এদেশে কতকগুলি অসভ্য জাতি আছে, তাহাদিগের মামুলি পেশাই হইতেছে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অসৎউপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করা। ইহাই তাহারা স্বধর্ম্ম বিবেচনা করে। ইহাদিগের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ। কোন কোন প্রদেশে ইহাদিগের দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চুরি হইয়া থাকে। ১৯১১ সালে ইহাদিগের সম্বন্ধে এইটী আইন করা হয়। ইহা দ্বারা তাহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে বাধ্য করা হয় ও তাহাদের তত্বাবধারণের জন্য ও তাহারা যাহাতে সদুপায়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে উৎসাহিত হয় তাহার বিশেষ বন্দবস্ত করা হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে, পঞ্জাবে, বোম্বাইএ ও কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে ইহারা বাস করে। পাঞ্জাব ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের জন্য উপনিবেশ স্থাপিত করিতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বড় একটা অধিক ব্যয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহারা মুক্তি ফৌজের সহায়তা অবলম্বন করিয়া অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যাহা হউক বোম্বাই পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে এই সম্বন্ধে অনেক কাজ হইতেছে, তবে বোম্বাই ও পঞ্জাবে

অধিক সফলতা লাভ হইয়াছে ও ইহার মধ্যে তথায় চুরি ডাকাতি অনেক কমিয়াছে। এবিষয়ে দেশীয় রাজ্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করা আবশ্যক হইয়াছে, কেননা যখন ইহাদিগের পূর্ব্বের অসৎবৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হয়, তাহারা উপনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশীয়রাজ্যে প্রবেশ করে ও তখন তাহাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় না। এই সম্বন্ধে একটি ব্যবস্থা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি মন্ত্রণা সভা আহুত করিয়াছিলেন। ইহার মন্তব্য এখনও প্রকাশিত হয় নাই তবে জানা গিয়াছে যে গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষগণ এক যোগে কার্য্য করিবেন। যাহা হউক মুক্তিফৌজ ও দেশীয় অনেকগুলি সভা এদিকে অনেক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতেছেন বলিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

স্বায়ত্ব শাসন প্রথা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যখন এদেশ ইংরাজাধিকৃত হয়, তখন এরূপ কোন বন্দবস্ত ছিল না। মিউনিসিপালিটি স্থাপনা সম্বন্ধে ইহা খুব সত্য কথা। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথমে কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে ইহা স্থাপিত হয় ও ১৮৪২ সাল পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে ইহার বিস্তার হয়। পরে ১৮৫০ সালে প্রধান প্রধান নগরে ইহা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য একটি আইন পাশ হয়। এইরূপে বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটি সমুহ স্থাপনের ভিত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে ১৮৮১-৮২ সালে লর্ডরিপনের আদেশে কিরূপে মিউনিসিপালিটিদিগের কার্য্য চলিবে তৎসম্বন্ধে নিয়ম করা হয়। এই প্রথা এখনও চলিতেছে।

মিউনিসিপালিটীদিগের কার্য্য হইতেছে সাধারণের স্বাস্থ্য, সুবিধা ও শিক্ষার বন্দবস্ত করা ও এই জন্য আইনের দ্বারা তাহাদিগের উপর কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। মিউনিসিপালিটির আয়ের দুই তৃতীয়াংশ ট্যাক্স হইতে আদায় হইয়া থাকে, তন্মধ্যে জমী ও বাড়ীর টেক্সই প্রধান। এই ট্যাক্স হইতে সমগ্র আয়ের এক পঞ্চমাংশ পাওয়া গিয়া থাকে। চুংগী হইতে আয়ের শতাংশের সতর অংশ ও জলের ট্যাক্স হইতে শতাংশের এগার ভাগ লভ্য হইয়া থাকে। মিউনিসিপালিটির বাড়ী ও জমি বিক্রয় হইতে আলোচ্যবর্ষে সমগ্র আয়ের শতাংশের সতর অংশ পাওয়া গিয়া ছিল। মোটের উপর মিউনিসিপালিটী দিগের আয় অধিক নহে। ইহার পাঁচ ভাগের দুই ভাগ কলিকাতা, মান্দ্রাজ বোম্বাই ও রেঙ্গুন নগরে আদায় হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় মিউনিসিপালিটি সমূহের মোট আয় ষাটলক্ষ পাউণ্ড। মিউনিসিপালিটীর সংখ্যা সাতশত পচিশ ও তাহাদিগের এলাকায় এককোটী সত্তর লক্ষের ও অধিক লোক বাস করিয়া থাকে। সমগ্র ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষের অধিবাসিদিগের মধ্যে শতকরা সাতজন মাত্র মিউনিসিপালিটীর এলাকায় বাস করিয়া থাকে। সাতশত পঁচিশটী মিউনিসিপালিটির মধ্যে

পাঁচশত বত্রিশটীর অধিবাসি সংখ্যা বাইশ হাজারের ও কম। সবগুলি মিউনিসিপালিটিকে ধরিলে নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা শতকরা চুয়ান্ন, সরকারি সভ্যের সংখ্যা শতকরা তের ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত বেসরকারি সভ্যের সংখ্যা শতকরা তেত্রিশ। সবগুলি মিউনিসিপালিটী ধরিলে বেসরকারি সভ্যের সংখ্যা সরকারি সভ্যের পাঁচগুণ। কলিকাতায় সভ্যগণের মধ্যে শতকরা চোরনব্বই জন বেসরকারি। সবগুলি মিউনিসিপালিটি ধরিলে দেশীয় সভ্যদিগের সংখ্যা শতকরা একানব্বই জন। মিউনিসিপালিটিদিগের খরচা, দেনা ও অসাধারণ খরচা ১৯১৭-১৮ বর্ষে পঞ্চাশ হইতে ষাটলক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে। আবর্জ্জনা তুলিয়া লইবার জন্য সমগ্র ব্যয়ের শতাংশের সতর অংশ ও রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি জন্য শতাংশের চৌদ্দ অংশ খরচ হয়। পানীয় জল ও নর্দ্দামার হিসাবে শতাংশের ষোল অংশ ও শিক্ষা ও চিকিৎসা হিসাবে শতাংশের সাত অংশ পড়ে।

সহরে যে কাজের ভার মিউনিসিপালিটির উপর, পাড়া গাঁয়ে সেই কাজ ডিষ্টীক্টের বোর্ডদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক জেলাতেই একটি বোর্ড ও তাহার অধীন দুই কি ততোধিক সববোর্ড আছে। তদ্ব্যতীত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষা ও মান্দ্রাজ প্রদেশে ইউনিয়ন কমিটি আছে। ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত দুইশত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড পাঁচশত উনচল্লিশ অধীন (সব) বোর্ড ও ছয়শত উনচল্লিশটী ইউনিয়ন কমিটি আছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডদিগের এলাকার মধ্যে একুশকোটি ত্রিশলক্ষ বাস করে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক নির্ব্বাচিত ও অর্দ্ধেক সরকারি কর্ম্মচারি ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্য। নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের সংখ্যা যুক্ত প্রদেশে শতকরা পঁচাত্তরজন, মধ্যপ্রদেশে শতকরা চুয়াত্তর জন, পঞ্জাবে শতকরা আটত্রিশ ও বিহারে শতকরা ত্রিশ। সভ্যদিগের মধ্যে শতকরা চোবনব্বই জন এদেশীয়।

আলোচ্যবর্ষে ভারতবর্ষীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড দিগের আয় হইয়াছিল কমবেশী পঞ্চাশলক্ষ পাউণ্ড। গড়ে প্রত্যেক ডিষ্ট্রীক বোর্ড ও তাহার অধীন সববোর্ড দিগের আয় ছিল ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ড। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের আয় হয় প্রধানতঃ প্রাদেশিককর হইতে। মধ্য প্রদেশে ইহা হইতে সমগ্র আয়ের প্রায় এক চতুর্থাংশ পাওয়া যায় বিহারে আর ও অনেক অধিক। আয়ের অর্দ্ধেকের বেশী। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড দিগের প্রধান কার্য্য (১) রাস্তা নির্ম্মাণ ও সংস্কার ও যাতায়াতের সুবিধা করা ও এই বাবদে আলোচ্যবর্ষে কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল। (২) শিক্ষা বিস্তার—খরচ বার লক্ষ পাউণ্ড ও (৩) চিকিৎসার বন্দবস্ত যাহার জন্য খরচ হইয়াছিল পাঁচলক্ষ পাউণ্ড।

আলোচ্যবর্ষে ভারতবর্ষের অনেক প্রধান প্রধান নগরে সহরের উন্নতি কল্পে চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। কলিকাতা ও বোম্বাই নগরে ইনপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের দ্বারা সহরের স্বাস্থ্য

উন্নতি সম্বন্ধেও যথেষ্ট বাসগৃহের অভাব মোচনের জন্য অনেক ভাল কাজ হইতেছিল, ও তাহাদিগের সফলতা দেখিয়া অনেক বড় বড় নগরে উন্নতির ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছিল। লক্ষ্ণৌ সহরে আলোচ্যবর্ষে একটি ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্ট গঠিত হইয়াছিল, ও অনেকে আশা করেন যে কিছু দিনের মধ্যে লক্ষ্ণৌ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্যশালী নগর হইয়া উঠিবে। কোন সহরের কোন কোন অংশ একবারে নূতন করিতে হইলে রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে এন্‌জিনীয়ারি কাজ অনেক থাকে। কিন্তু যুদ্ধের কাজে ও বিলাত হইতে মাল মসলা আমদানীর সুবিধা না হওয়াতে এই সব কাজে দেরি পড়িয়াছিল। তত্রাচ এই সব বিঘ্নসত্তে ও ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রষ্ট গুলি অনেক কাজ করিতে সমর্থ হইয়া ছিল। কলিকাতার ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রষ্ট সহরের উপকণ্ঠ গুলির উন্নতিকল্পে যে যে স্থানে লোকের সংখ্যা এত বেশী যে অস্বাস্থ্যকর হইবারই কথা, সেই সব স্থানে রাস্তা বাহির করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি করা, রাস্তা চওড়া করা, পয়ঃপ্রণালীর সুবন্দবস্থের ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

অধুনা কেবল বড় বড় সহর গুলিতে মিউনিসিপালিটির কাজ ইউরোপীয় নগরের মত ভালরূপ চলিয়া থাকে কিন্তু অনেকগুলি ছোট ছোট মিউনিসিপালিটির সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ শোনা গিয়া থাকে ও তাহা অনেকদিন হইতে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিল। অতঃপর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালটি দিগের উন্নতি কি উপায়ে ও কোন দিকে সাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে একটি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। সংবাদ পত্রে এই মন্তব্য লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিয়া ছিল। এক দল বলেন যে মিউনিসিপালিটি গুলি যে অকর্ম্মণ্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অপর পক্ষ তাহার উত্তরে বলেন যে সরকারি সভাপতি স্বয়ং ই সব কাজ করিতেন ও সভ্যদিগকে বড় একটা কিছু করিতে হইত না। সুতরাং তাঁহারা অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুবিধা পান নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের মন্তব্যে স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন, যে মিউনিসিপালিটি স্থাপনার চরম লক্ষ্য হইতেছে লোক দিগকে সাধারণের কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া। সুতরাং তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এখন হইতে সরকারি সভাপতি আর গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিবেন না, কিন্তু সভ্যদিগকে তাঁহাদিগের সভাপতি রূপে একজন বেসরকারি সহোযোগীকে নির্ব্বাচিত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে। এক্ষণে মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান দিগের মধ্যে মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত সরকারি কর্ম্মকারি, এক তৃতীয়াংশ নির্ব্বাচিত সরকারি কর্ম্মকারি ও এক তৃতীয়াংশ নির্ব্বাচিত বেসরকারি ভদ্রলোক। প্রত্যেক মিউনিসিপাল সভাপতি একজন নির্ব্বাচিত বেসরকারি লোক হন্ ইহাই এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্য যে অন্ততঃ একটি প্রদেশে মিউনিসিপালিটির সভ্যগণ একজন বেসরকারি সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার

অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও এই অধিকারের ব্যবহার করিতে সকল সময় আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সম্প্রতি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড মিউনিসিপালিটি প্রভৃতির উপর গবর্ণমেণ্টের প্রভাব ও প্রভুত্বের মাত্রা ক্রমে ক্রমে হ্রাস করিবার চেষ্টা হইতেছে। আশা করা যায় যে যখন সভ্যদিগের উপর অধিক ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে তখন তাঁহারা মিউনিসিপালিটির কার্য্যে অধিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিচয় দিতে পারিবেন। ইতিমধ্যেই ইহার সূচনা দেখা যাইতেছে। পাঞ্জাবে সভ্য নির্ব্বাচনের সময় বড় বড় সহরে খুব উৎসাহ ও উদ্যোগ দেখা যায়, যদি ও ছোট ছোট নগরে অধিবাসি দিগের মধ্যে ঔদাসীন্য এখনও একেবারে দূর হয় নাই। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে এখন যে সহর যত বড়, সেখানে জন সাধারণের মত ও তত প্রবল ও যেখানে সাধারণ মত প্রবল সেখানে মিউনিসিপালটির সভ্যগণকে অন্ততঃ বাধ্য হইয়া কতকটা কাজ করিতে হয়, একেবারে ফাঁকি দেওয়া চলেনা। তবে সরকারি প্রভাবের অভাব হইলে ছোট ছোট মিউনিসিপালিটি গুলিতে ও সভ্যগণ যে কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে সীমান্ত প্রদেশে স্বায়ত্ব শাসন অতি অল্পদিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে কিন্তু সেখানে ও দেখা যাইতেছে যে অনেকগুলি মিউনিসিপালটির সভ্যগণ সাধারণের হিতকর কার্য্যে বিশেষ অনুরাগী হইয়াছেন। কোন কোন স্থানে বটে সভ্যগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কাজ করিতে এখনও অভ্যস্ত হয় নাই। কিন্তু মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে অনেক স্থানেই কাজ ভালরূপ চলিতেছে। কেবল সীমান্ত প্রদেশেই মিউনিসিপালিটির সভ্যগণের পক্ষে এ কথা খাটে এমন নহে অন্যান্য স্থানের সম্বন্ধে ও একথা বলা যাইতে পারে। বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে এ বিষয়ে বেশী কাজ হইতেছেনা কিন্তু এখানেও সভ্য নির্ব্বাচনের সময় বিলক্ষণ উৎসাহ দেখা গিয়া থাকে। পাটনা মিউনিসিপালিটির সভ্য গণের মধ্যে একটি দল আছে, তাহাদিগের উদ্দেশ্য কিসে অপব্যয় নষ্ট হয় ও টাকার সঞ্চয় হয়। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে কোন মিউনিসিপালিটির সভ্যগন তাঁহাদিগের যে পরিমাণে ট্যাক্স বসাইবার ক্ষমতা আছে তাহার ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক নহেন। অনেকেরই বিশ্বাস যে টাকার দরকার হইলে গবর্ণমেণ্ট আছেন। অনেক বড় বড় মিউনিসিপালিটির সভ্যগণ সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বহু ব্যয় সাধ্য প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছুক হন্ কিন্তু টাকা কোথা হইতে আসিবে সে প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে তাঁহাদিগের মিউনিসিপালিটীর টাকা নাই ও গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা ভিক্ষা করিয়া থাকেন। অনেক মিউনিসিপালিটিতেই অধিবাসিদিগের ক্ষমতা-সাধ্য কর বসান হয় নাই। মিউনিসিপালিটীদিগের আয় বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই, অনেকেরই ইহা ধারণা। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে, কেননা কোন কোন স্থানে এখনও কর

খসান কি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে কোন তদন্ত কখন করা হয় নাই। সম্প্রতি অনুসন্ধানের দ্বারা জানা গিয়াছে যে মিউনিসিপালিটি যে কর আদায় করিয়া থাকেন, অনেক জেলায় তাহার পরিমাণ অধিবাসিদিগের আয়ের শতকরা আট আনা মাত্র। কিন্তু যতদিন না কর-দাতাগণ বুঝিতে পারিবেন, যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উন্নতি করিতে গেলে টাকার দরকার ও সে টাকা পাইতে হইলে কর বৃদ্ধির প্রয়োজন, ততদিন এদিকে বিশেষ কিছু উন্নতির আশা অল্প। জন সাধারণকে স্বাস্থ্যোন্নতির উপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া ছাড়া গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে আর কিছুই করিতে পারেন না। কোন কোন প্রদেশে সাধারণকে এই বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য বন্দবস্ত হইতেছে। আলোচ্যবর্ষে বাঙ্গালা প্রদেশে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডদিগের প্রতিনিধিগণ লইয়া মন্ত্রণার্থ একটি সভার অধিবেশন হয়। যে যেখানে বোর্ডের সভ্য দিগের মধ্যে ঔদাসিন্য দেখাগিয়াছিল, সেই সব বোর্ডে সরকারি সভাপতি থাকার দরুণ, তিনিই সব কাজ করিতেন ও অপর সভ্যগণকে বড় কিছু করিতে হইত না, ও সেই জন্য এসব বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুরাগ হইত না। জেলার মাজিষ্ট্রেটকে জেলার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, জেলার প্রত্যেক অংশের অবস্থা তাঁহার ভালরূপ জানা আছে—সুতরাং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতির কার্য্য তাঁহার দ্বারা অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবারই কথা। কিন্তু একদিকে যেমন ভাল কাজ হয়, তেমনি বেসরকারি সভ্য গণের অনুরাগও লোপ পায়। কিছুদিন হইল বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট পাঁচটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যদিগকে বেসরকারি সভাপতি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করেন ও পূর্ব্বোক্ত সভায় প্রকাশ করা হয় যে আরও পনরটি বোর্ডের সভ্যগণকে পরবর্ষে উক্ত ক্ষমতা প্রদান করা যাইবে। এই সভায় সভাপতি ছিলেন স্বয়ং বঙ্গের গবর্ণর, সুতরাং ইহার কার্য্যাবলীর উপর সাধারণের ও সংবাদপত্র দিগের মনোযোগ বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। আশা করা যায় যে ইহাহইতে অনেক সুফল প্রসূত হইবে ও ডিষ্টিক্ট বোর্ডের বেসরকারি সভ্যগণ বোর্ডের কার্য্যে অধিক পরিমাণে মনোযোগী হইবেন। কিন্তু এখন হইতে স্বায়ত্ত শাসনের ভার দেশীয় মন্ত্রী দিগের হস্তে অর্পিত হইবে বলিয়া কোন কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে উন্নতির জন্য যে আইনের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন তাহা নূতন সংশোধিত ব্যবস্থাপক সভার বিবেচনার্থ আপাততঃ স্থগিদ রাখিয়াছেন। সেইজন্য স্বায়ত্ব শাসন প্রণালীর বিস্তার কল্পে আলোচ্যবর্ষে, পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় অধিক কাজ হয় নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক আলোচ্যবর্ষে স্বায়ত্ব শাসন সম্বন্ধে কি কি আইন করা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পাঞ্জাবে বাঙ্গালায় ও বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। বোম্বাই নগরে ও রেঙ্গুনে বাড়ী ভাড়া অত্যন্ত বাড়িয়া ছিল। তাহার প্রতীকারার্থে বোম্বাই ও বর্ম্মা প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক

আইন পাশ হইয়াছিল। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় ও ঐরূপ একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে মাদ্রাজ নগরে মিউনিসিপালিটির সংস্কারের জন্য মার্চমাসে একটি আইন পাশ হয় ও অক্টোবর মাসে তদনুযায়ী কার্য্য হইতে থাকে। উক্ত প্রদেশে গত সালের মিউসিপালিটি দিগের সম্বন্ধে ও একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছিল। বোম্বাই এর ব্যবস্থাপক সভা একটি আইন পাশ করেন যাহারা বাজি রাখিবার আপিসগুলির উপর বোম্বাইএর বাজিখেলা সম্বন্ধীয় আইন প্রয়োগ করা হয় ও রাজ পথে ও সাধারণ যে স্থানে সমবেত হয় তথায় বাজীখেলা নিষিদ্ধ হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা আলোচ্যবর্ষে রৌলাট আইন দ্বয় সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেই প্রধানতঃ নিযুক্ত ছিল, এ বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব যখন ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষে আনীত হয়, তখন এবার এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল। এবার আয় ব্যয় হিসাব বিভাগের কর্ত্তা সার জেম্স্ (এক্ষণে লর্ড) মেষ্টন উক্ত হিসাব দাখিল করিবার সময় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, ও তাহাতে গতবর্ষের আয় ব্যয় সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। যখন এই হিসাব লইয়া তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল, তখন অনেকগুলি প্রস্তাব অনুমোদনার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শর্ম্মা মহাশয় প্রস্তাব করেন যে এবারে দেনা করিবার জন্য দশকোটি পাউণ্ড ধার্য্য হইয়াছে, তাহা কমাইয়া চারিকোটি পাউণ্ড করা হউক ও যে টাকা উদ্বর্ত্ত থাকিবে, তাহা স্বাস্থ্যোন্নতি, শিক্ষারবিস্তার ও পল্লীগ্রামে জলকষ্ট দূর করিবার জন্য খরচ করা হউক। এই প্রস্তাবে আপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু মেষ্টন সাহেব ইহা সম্বন্ধে এমনি একটি আশাপ্রদ বক্তৃতা করিলেন. যে তাহাতে আশ্বস্ত হইয়া শর্ম্মা মহাশয় তাঁহার প্রস্তাব প্রতিহার করিলেন। শর্ম্মা মহাশয়ের আর একটী প্রস্তাব ছিল যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা আরও দশলক্ষ পাউণ্ড বাড়ান হউক। এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছিল বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দেখান হইয়াছিল যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টার ও ত্রুটি করিতেছেন না ও অর্থব্যয়েও কৃপণতা করিতেছেন না। আর একটী প্রস্তাব ছিল যে রেল নির্ম্মাণ কিম্বা বিস্তৃতির জন্য যে টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কমান হউক। এ প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইয়াছিল। এই প্রস্তাবের উত্তরে দেখান হইয়াছিল যে যুদ্ধের সময় কল কব্জা, লোহা, লক্কর আমদানি বন্ধ হওয়াতে রেলগুলির সংস্কার অভাবে এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, যে উহা মেরামৎ করিতে অর্থব্যয়ে কৃপণতা করিলে দেশের বিশেষ ক্ষতি হইবে, কেননা রেলগুলি হইতে বার্ষিক পাঁচকোটি পাউণ্ড আয় হইয়া থাকে।

রৌলাট আইন পাস হওয়াতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য গণের মধ্যে চারিজন বেসরকারি নির্ব্বাচিত সভ্য তাঁহাদিগের অসন্তোষ প্রকাশ করিবার উদ্দেশে পদত্যাগ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের স্থানে পুনঃ নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দুইটী নির্ব্বাচন আইন সঙ্গত হয় নাই বলিয়া আপত্তি করা হইয়াছিল ও তদন্তের ফলে একটী ঠিক হইয়াছিল বলিয়া সাব্যস্ত হয়। কিন্তু অপরটি সম্বন্ধে অনেক অবৈধ কার্য্য হইয়াছিল বলিয়া উহা বাতিল হইয়াছিল।

১৯১৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সিমলায় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হয়, তথায় অনেক সভ্যই অনুপস্থিত ছিলেন, কেননা তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শাসন সংস্কার আইন সম্বন্ধে আন্দোলন করিবার জন্য তখন বিলাতে গিয়াছিলেন। তত্রাচ সভার দ্বাদশটী অধিবেশন হইয়াছিল ও অনেক প্রয়োজনীয় কাজ ও নির্ব্বাহ হইয়াছিল। তিনশত কুড়িটি প্রশ্ন সভ্যগণ পাঠাইয়াছিলেন ও তন্মধ্যে একশত নিরানব্বইটী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছিল। তেইশটী প্রস্তাবের সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বারটী প্রস্তাব সভা দ্বারা বিবেচিত হয়। কুড়িটী আইনের খসড়া প্রবর্ত্তিত হয় ও তন্মধ্যে ষোলটী পাস হয়। নিম্নোল্লিখিত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ হয় তাহা হইতে বেসরকারি সভ্যগণ সভার কার্য্যে কতটা মনোযোগ দিয়া থাকেন তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে সভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিলেন—"গবর্ণরজেনেরালকে অনুরোধ করা হউক যে তিনি ইউরোপীয় সমরে জয়লাভ ও শান্তির জন্য সম্রাটকে ভারতবাসিদিগের পক্ষ হইতে রাজভক্তি-মূলক এবং আনন্দসূচক অভিনন্দন প্রেরণ করেন, সম্রাটের জাহাজি সেনা, স্থলস্থ সেনা ও আকাশগামী সেনাগণ যুদ্ধে যে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়াছেন ও অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সূচক অভিনন্দন করা হউক, সম্রাটের রাজ্যশাসন কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণকে ও যাঁহারা যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করণে নিযুক্ত ছিলেন কিম্বা রেলবিভাগে ডাক বিভাগেও তারের খবর বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদিগকে যুদ্ধের সময় তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যকার্য্যে অনুরাগ ও ক্ষতিস্বীকার ও আত্মোৎসর্গের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হউক। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল। এই অভিনন্দনের উত্তরে সম্রাটের পক্ষ হইতে ভারত সচিব বড়লাট সাহেবকে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন।

"ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার পক্ষ হইতে সম্রাটকে যে অভিনন্দন পাঠান হইয়াছে, তাহা আমি সম্রাটের অবগতির জন্য তাঁহার সমক্ষে দিয়াছি। তিনি তদুত্তরে আমাকে আদেশ দিয়াছেন যে উক্ত সভার সভ্যগণকে অবগত করা হউক যে তিনি সমরে

বিজয়ান্তে ও সন্ধিস্থাপনের পর তাঁহাদিগের নিকট হইতে এই অভিনন্দন পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। সম্রাটের আদেশ ক্রমে এই অভিনন্দনের কথা প্রধান মন্ত্রী মহাশয়কে ও পার্লামেণ্ট মহাসভাকে ও জানাইতেছি কারণ তদ্দ্বারা যাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারাও সেকথা জানিতে পারিবেন। আমি আরও আদিষ্ট হইয়াছি যে এইযুদ্ধে ভারতবর্ষ যে সহায়তা করিয়াছে ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তজ্জন্য ইংলণ্ডবাসিগণ মোহিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছেন একথা ও আপনি সকলকে জানাইবেন ইহা অনুরোধ করিতেছি।"

সেই দিনে পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন যে পাঞ্জাবে যে হাঙ্গামা হইয়াছিল তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ও উক্ত হাঙ্গামা দমনের জন্য রাজকর্ম্মচারিগণ যাহা যাহা করিয়া ছিলেন তাহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছিল তাহা বিচার করিবার জন্য একটী তদন্তকারি কমিটী নিযুক্ত করা হউক। কিন্তু ইতি পূর্ব্বেই বড়লাট সাহেব এইরূপ একটী কমিটী নিযুক্ত হইবে বলিয়া ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতজী কিছু মুস্কিলে পড়িয়া ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রস্তাব পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহার মূল প্রস্তাবই বাহাল রাখিবার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রস্তাব লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিল ও ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই তর্কের শেষ হইল এবং প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চান্দা মহাশয়েরও দুইটি প্রস্তাব ছিল। তাঁহার প্রস্তাব ছিল এই যে দিল্লী নগরে যে হাঙ্গামা হইয়া ছিল তাহার তদন্তের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হউক। ইহার উত্তরে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট বলিলেন যে পঞ্জাব সম্বন্ধে যে কমিটি নিযুক্ত হইবে, তাহা দিল্লীতে হাঙ্গামার বিষয়ও তদন্ত করিবে। সুতরাং চান্দা মহাশয় এই প্রস্তাব উঠাইয়া লইলেন। তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল যে কলিকাতা নগরে এপ্রিল মাসে যে পুলিশের সহিত দাঙ্গা হইয়া ছিল তাহা তদন্তের জন্য ও একটি কমিটি নিযুক্ত হউক। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের প্রতিনিধিগণ কিম্বা অন্যান্য সভ্য গণ এ প্রস্তাবের সমর্থন না করাতে ইহা ও পরিত্যক্ত হইল।

১৫ই সেপ্টেম্বর মাসে চান্দা মহাশয় একটি প্রস্তাব করেন যে গ্রীষ্মকালে সিমলা শৈলে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের বাস করা অনুচিত। কিন্তু পঞ্জাব প্রদেশীয় সভ্যগণ এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না ও সার উইলিয়ম এই প্রস্তাবে আপত্তি করাতে ইহাও অগ্রাহ্য হইল। সার উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট দেখাইলেন যে ১৯০৩ ও ১৯০৫ সালে লর্ড কর্জ্জন প্রস্তাব করিয়া ছিলেন যে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে সিমলা পরিত্যাগ করিতে হইবে ও শিমলাতে কেবল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টই থাকিবেন। কিন্তু কি কারণে ভারতসচিব উক্ত প্রস্তাবে

সম্মতি দান করেন নাই তাহা ও দেখাইলেন। সার উইলিয়ম আর ও জানাইলেন যে এই বিষয় ১৯১৭ সালে একটি কমিটি দ্বারা বিবেচিত হইয়াছিল ও উক্ত কমিটি এখন যে বন্দবস্ত চলিতেছে তাহা পরিবর্ত্তন করার প্রস্তাব করেন নাই। বলা বাহুল্য এই প্রস্তাব ও অগ্রাহ্য হইল। চান্দা মহাশয় আর একটি প্রস্তাব করেন যে খাদ্য বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা হউক। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ম্যাণ্ট সাহেব দেখাইলেন কি কারণে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে ও তাহার প্রতিকারার্থে গবর্ণমেণ্ট কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ১৬ই তারিখে এই তর্ক পুনরারম্ভ হয় ও তখন লি সাহেব কাপড়ের দাম কমাইবার জন্য কি কি করা হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া দিলেন। এই প্রস্তাবটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রাহ্য হইল। সার দিনশা ওয়াচা মহাশয় এই সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন যে বিক্রেতা গণের অত্যধিক লোভের দরুণ কি পরিমাণে দাম বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার তদন্ত করিবার জন্য ও আবশ্যক বোধে তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হউক। এই প্রস্তাব ও পরিবর্ত্তিত আকারে অনুমোদিত হইল। সেই দিনে শ্রীযুক্ত নাথমল নাগপুরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা খাঁ বাহাদুর মহম্মদ শাফি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন কিন্তু কবে হইবে ও আইন ভারত বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় হইবে কি নাগপুরের ব্যবস্থাপক সভায় হইবে সে বিষয় বিচারাধীন রহিল। কলিকাতার সাহেব বণিক দিগের প্রতিনিধি ক্রম সাহেব কলিকাতার ট্যাক শাল বড়বাজার হইতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। কলিকাতার অপর প্রতিনিধি গণের মধ্যে আবদর রহিম সাহেব ও কাশীমবাজারের মহারাজা এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন, কিন্তু রায় বাহাদুর সীতা নাথ রায় ইহার বিপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে হাউআর্ড সাহেব উত্তরে বলিলেন যে গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এ বিষয় কিছু বলিতে পারেন না। তবে উপযুক্ত স্থান পাওয়া যাইলে ও খরচা কত হইবে তাহা ঠিক হইলে, এ প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্রস্তুত আছেন। এ প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছিল। ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত শর্ম্মা মহাশয় এদেশে একটি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যাঙ্ক স্থাপনার প্রস্তাব আনয়ন করেন। কাশিমবাজারের মহারাজা ও মালবীয় মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন, কিন্তু অন্য কোন সভ্য এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে হাউয়ার্ড সাহেব উত্তরে বলিলেন যে শ্রীযুক্ত শর্ম্মা যাহা বলিয়াছেন তাহার অনেকাংশের সহিত গবর্ণমেণ্টের মতের মিল আছে ও ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় সুবিধা বৃদ্ধি করিবার উপকারিতা ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কোন সন্দেহ নাই। দেশে এখন নানাবিধ শ্রমশিল্প ব্যাপারের

অনুষ্ঠান হইতেছে ও ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। যাহাতে লোকে টাকা মাটির ভিতর প্রোথিত না রাখিয়া উহার সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত শর্ম্মা যে উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে চাহেন গবর্ণমেণ্ট তাহা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত নহেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের নিজের একটি প্রস্তাব আছে ও উহা অনুমোদনার্থ ভারত সচিবের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের তিনটি ব্যাঙ্ক মিলিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শর্ম্মার প্রস্তাব সুতরাং অগ্রাহ্য হইল। ক্রম সাহেব প্রস্তাব করেন যে কলিকাতার উপকণ্ঠে বৈদ্যুতিক বলের দ্বারা চালিত ট্রামওয়ে প্রচলিত করা ও লোকের যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। বাণিজ্যবিভাগের কর্ত্তা এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন যে তিনি আগামী শীতকালে কলিকাতায় যাইয়া রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিবেন। অতঃপর ক্রম্ সাহেবের প্রস্তাব অনুমোদিত হইল। শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে সৈন্যবিভাগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে একজন বেসরকারি দেশীয় সভ্য নিযুক্ত করা হউক। ইহার উত্তরে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মেজর জেনারাল বিংলি বলিলেন যে গবর্ণর জেনেরালের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতসচিব ইতিমধ্যেই মেজর মালিক সার উমার হাইয়ৎ খাঁকে এই কমিশনের সভ্যপদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

আলোচ্যবর্ষে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে আইনগুলি পাস হইয়াছিল তাহাদিগের সম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলা যাইতেছে। বিষ সংক্রান্ত আইনের দ্বারা বিষ বিক্রয় সম্বন্ধে নিয়ম করিবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদিগকে কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হয়। সামুদ্রিক শুল্ক আইনের পরিবর্ত্তন করিয়া কুংঘরের কর্ম্মচারি গণকে ক্ষমতা দেওয়া হয় যে তাঁহারা বিদেশ হইতে আমদানি ঔষধ ও বিষ গুলির নমুনা উচিত মূল্যে ক্রয় করিয়া পরীক্ষা করিবেন ও পরে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণ দেখিবেন যে উহা আসল কি ভেজাল জিনিস্। আর একটি আইন পাস হইয়াছিল যাহারা বিদেশে যে ছাল ও চামড়া রপ্তানি হয় তাহার উপর শতকরা পনর টাকা শুল্ক বসান হইয়াছে। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যাহা রপ্তানি হইবে তাহার উপর শতকরা দশ টাকা বাঁটা দেওয়া হইবে। এই আইনের উদ্দেশ্য হইতেছে এদেশে যাহাতে চামড়ার জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে। এতাবৎ বিদেশী কারখানায় ইহা প্রস্তুত হইতেছিল ও বিদেশী বণিকগণ ইহাহইতে লাভ করিতেছিল।

আলোচ্য বর্ষে সাতটি নূতন বিধান প্রচলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ছয়টি পঞ্জাব

ও অন্যান্য স্থানে যে হাঙ্গামা হইয়াছিল তাহা সংক্রান্ত। এই বিধানগুলি ছয় মাস মাত্র বাহাল থাকে। এই বিধান গুলির কারণ নিম্নে উল্লেখ করাগেল। ভারত সচিবকে এসম্বন্ধে এইরূপ লেখা হইয়াছিল। "পঞ্জাব প্রদেশের কোন কোন স্থানে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যাওয়াতে গবর্ণরজেনেরেলকে বাধ্য হইয়া আদেশ দিতে হইতেছে যে লাহোর ও অমৃতসহর জেলায় রাজদ্রোহ সম্বন্ধীয় অপরাধের বিষয় আদালতে বিচার হইবেনা এবং উক্ত জেলাদ্বয়ে সামরিক আইন প্রচলিত করা গেল ও পূর্ব্বোক্ত অপরাধিগণের বিচার সামরিক আদালতে হইবে। তবে এই সামরিক আদালতের বিচার-পতি হইবেন তিন জন ও তাঁহাদিগের মধ্যে অন্তত: দুই জন সেসনস্ কিম্বা অতিরিক্ত জজ দিগের মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হইবে। এবিষয়ে বিলম্ব করা অযৌক্তিক বলিয়া এই বিধান প্রচলিত করা গেল, ও এই সামরিক আদালতের বিচারপতিগণ ১৩ এপ্রেলে কিম্বা তাহার পরে যে হাঙ্গামা হইয়াছিল তাহার বিচার করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন হইলে এইরূপ আদালতের সংখ্যা বাড়াইতে পারিবেন। সপ্তম বিধানটির উদ্দেশ্যছিল এদেশে রূশিয়ার রুবল নোটের প্রচলন রহিত করা। বলশেভিকগণ এদেশে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে যে হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে এই উপলক্ষেই এদেশে পূর্ব্বোক্ত নোট গুলির প্রচার হইয়াছে।

এই বর্ষে একটি গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে বিবেচনা করিতে হইয়াছিল। এটি এই—সংস্কার বিধি প্রচলিত হইলে রাজপুরুষগণের অবস্থা ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে। সকল জিনিসের দর বৃদ্ধি হওয়াতে এই কর্ম্মচারিগণের অবস্থা বড় সন্তোষজনক ছিলনা সুতরাং যুদ্ধ শেষ হইলে তাঁহাদিগের বেতন বৃদ্ধির বন্দবস্ত করা আবশ্যক হইয়াছিল। এই বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে পবলিক সার্ভিস কমিশন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাই অনেকটা গৃহীত হইয়াছিল। এদেশে শাসন প্রণালীর জন্য ব্যয় যত কম হইতে পারে তাহাই করা হইয়াছে। ত্রিশকোটি লোক শাসন করিবার জন্য বারকোটি পাউণ্ড বজেট হইয়া থাকে। কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণকে খুব ভারি কাজ করিতে হয়। তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বেতন না দিলে কাজের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এই বৎসর আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে বেতন বৃদ্ধি না করিলে নূতন লোক আর পাওয়া যাইবে না। সুতরাং বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়াছিল ও সৈন্য বিভাগ, সিভিল কর্ম্মচারিগণ, পুলিশ বিভাগ শিক্ষাবিভাগ, বনবিভাগ ও অন্যান্য বিভাগে কর্ম্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অবশ্য দেশীয় সংবাদপত্রে এই বেতন বৃদ্ধির বিপক্ষে প্রতিবাদ হইয়াছিল, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে ভাল লোক নিযুক্ত করিতে হইলে বেতন বৃদ্ধি

করা একান্ত আবশ্যক। তবে এক্ষণে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেক দেশীয় লোক নিযুক্ত করা স্থির হইয়াছে, ও তজ্জন্য বেতনবৃদ্ধির বিপক্ষে আন্দোলন ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে রাজপুরুষগণের অবস্থা ও উন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় দিল্লীনগরে যে অধিবেশন হয় তথায় বড়লাট বাহাদুর এইরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন—"শাসন সংস্কার বিধি প্রবর্ত্তিত হইলে রাজকর্ম্মচারিগণের ভবিষ্যতে কি অবস্থা হইবে, সে বিষয়ে ভাবনা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করিতেছি। প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে, যে যুদ্ধের সময় এদেশীয় রাজপুরুষগণকে যারপর নাই পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল ও তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধে যোগ দেওয়াতে, সংখ্যাও অনেক কমিয়া গিয়াছিল। কাজের ভিড়ের জন্য তাঁহাদিগের ছুটি একরকম রহিত হইয়াছিল, ও তাঁহাদিগকে দ্বিগুণ কাজ করিতে হইয়াছিল। এজন্য অনেকেরই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তাহার উপর জিনিষের দর বাড়াতেও তাঁহারা বিলক্ষণ অসুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন। কখন কখন আন্দোলনকারিগণ তাঁহাদিগের উপর অন্যায় আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু তবু তাঁহারা দেশে শান্তিরক্ষা করিতে ও যুদ্ধে জয়লাভ করিতে চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। এক্ষণে যুদ্ধ শেষ হওয়াতে তাঁহাদিগকে আরও অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইতেছে। তাঁহাদিগকে এইজন্য আমি যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতেছি। যে সংস্কার বিধি প্রবর্ত্তিত হইতেছে তাহার ফলে ভবিষ্যতে রাজপুরুষদিগের অবস্থা নিশ্চয়ই অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইবে। এযাবৎ উচ্চ কর্ম্মচারিগণ বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন, যথা সিবিলিয়ানগণ, পুলিশ কর্ম্মচারিগণ, সরকারি চিকিৎসকগণ, শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণ, বনবিভাগের কর্ম্মচারিগণ ও ইন্‌জিনিয়ারগণ। কেহ কেহ বলেন যে এই কর্ম্মচারিগণ যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা পার্লামেণ্ট অর্পন করে নাই। একথা ঠিক নহে। এই কর্ম্মচারিগণকে পার্লামেণ্টই এদেশে নিযুক্ত করিয়া পাঠান্ ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে রাজ্যশাসন করাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা যে কাজ করিয়াছেন, অন্য কেহ তাহা করিতে পারিত না। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যদি অন্যরূপ বন্দবস্ত করা হইত তাহা হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা ও একার্য্য সম্পন্ন হইত না। কিন্তু এখন দেশে শাসন ভার দেশীয় দিগের হস্তে ক্রমে ক্রমে অর্পিত হইবে, সুতরাং তাঁহাদিগের অবস্থারও অনেকটা পরিবর্ত্তন হইবে। দেশীয় মন্ত্রীগণ নিযুক্ত হইলে তাঁহারাই কর্ত্তা হইবেন ও রাজপুরুষদিগকে মন্ত্রীদিগের আদেশ পালন করিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া রাজপুরুষ গণ কেবল হুকুম পালন করিবেন ও তাঁহাদিগের কোন ক্ষমতা থাকিবে না অথবা তাঁহাদিগের নিজের মতের বিরুদ্ধে অনভিজ্ঞ শত্রু স্থানীয় মন্ত্রীগণের আদেশ

পালন করিতে হইবে, একথা ঠিক নহে। তাঁহাদিগের এরূপ আশঙ্কার কোন সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষে রাজ্যশাসন-বিধি সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা কিছু ইংরাজগণ ভারত শাসনে অক্ষম হইবার জন্য কিম্বা এ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য হইবেনা। কেবল ভারতবাসিগণ এই ভার গ্রহণে উৎসুক বলিয়াই পার্লামেণ্ট তাঁহাদিগের উপর এই ভার অর্পণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। সকলেই স্বীকার করিবেন যে এখনও সে দিন আইসে নাই যে দিন ভারতবাসি গণ এ দেশ শাসনের ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে উপযুক্ত হইবেন। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য কিছু সহজ ব্যাপার নহে। নূতন শাসনপ্রণালী সফল করিতে হইলে বহুদর্শী, চরিত্রবান, কর্ম্মদক্ষ ও উচ্চ আদর্শের দ্বারা চালিত রাজপুরুষগণের সাহায্য অতীব আবশ্যক। যতদিন না ভারত-বাসিগণ এই কার্য্যে সম্পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করিতে পারিবেন, ততদিন এই রাজপুরুষগণের সাহায্য প্রয়োজনীয় হইবে।

ভারত সচিব ও আমি উভয়েই রাজপুরুষগণকে জানাইয়াছি যে তাঁহাদিগের স্বার্থ সংরক্ষণে ও তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদনে যাহাতে কোন বিঘ্ন হইতে না পারে, তজ্জন্য আমরা বিশেষ যত্ন করিব। কিন্তু তবুও কাহার কাহার সন্দেহ ঘুচে নাই। সুতরাং আমি এই বিষয়ে আরও খুলিয়া বলিতেছি। প্রথমতঃ বিলাতে নিযুক্ত কর্ম্মচারি গণের বেতন, ছুটি ও পেন্সন প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা প্রাপ্য তাহা স্বয়ং ভারত-সচিব ধার্য্য করিয়াছিলেন, ও এদেশে কাহারও উহা পরিবর্ত্তন বা অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা থাকিবেনা। বস্তুতঃ অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণ, যাঁহারা এদেশে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা ও ঐ ছাঁচে গঠিত হইবেন। সুতরাং এবিষয়ে ইংরাজ রাজপুরুষগণের ভাবনার কোন কারণ নাই।

আমি জানি ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকেই ভাবিতেছেন যে তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা দেশীয় মন্ত্রীগণের অধীনে থাকিবেন, তাঁহাদিগের অবস্থা কিরূপ হইবে। আমি জানি এই বিষয়ে হয়ত কিছু গোলযোগ হইতে পারে। আমি এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছি ও কিরূপে গোলযোগ হইতে পারে তাহাও কল্পনার সাহায্যে বুঝিতে পারিতেছি। সুতরাং কিরূপে এই গোলযোগ নিবারিত হইতে পারে তাহাও ভাবিয়াছি। প্রথমতঃ, এরূপ ধরণের লোক মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইবেন যাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদের কার্য্যে রাজপুরুষগণ কতদূর সহায়তা করিয়া থাকেন। অন্যান্যদেশে যাহা হইয়াছে, তাহা দেখিলেও তাঁহারা এবিষয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে যখন কেহ মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন প্রথম প্রথম তাঁহার রাজপুরুষগণের সম্বন্ধে ঘোর কুসংস্কার ছিল। কিন্তু

যখন সাধারণে উক্ত মন্ত্রীকে আক্রমণ করিলেন—যাহা প্রায়ই হইয়া থাকে—তখন মন্ত্রী দেখিলেন যে তাঁহার প্রধান সহায় হইতেছেন তাঁহার অধীন ইংরাজ রাজপুরুষগণ। এইরূপে প্রথম কুসংস্কার ঘুচিয়া যাইলে রাজপুরুষগণ মন্ত্রীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজপুরুষগণ সম্বন্ধে মন্ত্রীগণ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন না। আমি গবর্ণর গণকে জানাইয়া দিব যে রাজপুরুষগণের মঙ্গলের জন্য তিনি স্বয়ং গবর্ণরকে দায়ী করিবেন যাহাতে তাঁহাদিগের অনিষ্ট হইতে পারে এমন প্রস্তাব তিনি যেন কখন অনুমোদন না করেন। মন্ত্রীর অধীনে যে যে বিভাগ থাকিবে তাহাদিগের প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইবেন। কোন গোলযোগ বাধিবার পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহারা গোলযোগের সম্ভাবনা গবর্ণরকে দেখাইয়া দিতে পারিবেন ও তাহাহইলে গবর্ণর মন্ত্রীকে উপদেশ দিয়াই হউক কিম্বা নিজের ক্ষমতা চালনা দ্বারাই হউক, গোলযোগের সম্ভাবনা দূর করিবেন। তাহার পর, যদি কোন রাজপুরুষ বেতন বা পেন্‌সন সম্বন্ধে মন্ত্রীর আদেশে সুবিচার প্রাপ্ত হন নাই মনে করেন, তাহাহইলে তিনি ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ভারতসচিবের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। এই সব বন্দবস্ত কিরূপ চলিবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। কিন্তু যাহা বলা হইল তাহা হইতে রাজপুরুষগণ বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট যাহাতে না হয়, তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে। হয়ত আরও কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যক বোধ হইবে। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বলিতে ইচ্ছা করিনা। তবে আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে রাজপুরুষদিগের যে কোনরূপ ক্ষতি হইতে পারে এরূপ অনুমানের আমি প্রশ্রয় দিতে চাহিনা।

বস্তুতঃ রাজপুরুষগণের প্রতি সুব্যবহার করা, নূতন শাসন প্রণালীর সফলতার একটি প্রমাণরূপে বিবেচনা করা যাইবে।"

১৯১৯ সালের ঘটনার মধ্যে ভূমি সংক্রান্ত রাজস্বের বন্দবস্ত করা উল্লেখযোগ্য। যে দেশের অধিকাংশ লোক কৃষি কর্ম্মদ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তথায় জমী সংক্রান্ত রাজস্ব একটী অতীব গুরুতর বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একজন রাজপুরুষ বলিয়াছিলেন যে, যে রাজপুরুষের হস্তে জমী সংক্রান্ত বন্দবস্তের ভার আছে, দেশে শান্তিরক্ষা তাঁহার উপর নির্ভর করে। এই বর্ষে বিহার প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কোন কোন জেলায় দাস প্রথা প্রচলিত আছে কিনা তদ্বিষয়ে এক তদন্ত করেন। প্রথা এই যে মনিব চাকরকে টাকা ধার দিয়া তাহার নিকট লিখাইয়া লয়েন যে তাহাকে এতদিন বিনা পারিশ্রমিকে খাটিতে হইবে। এই বিষয়ে চাকরের উপর কোন অত্যাচার যাহাতে না হয় তজ্জন্য আইন করিবার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। পল্লীগ্রামে ড্রেন কাটিয়া

স্বাস্থ্যের ও শস্যের উন্নতি করণাভিলাষে একটী আইন বাঙ্গালায় পাশ হইয়াছে। আগেকার আইনের সাহায্যে একাজ করা বড়ই মুস্কিল ছিল। নূতন আইনে সহজে একাজ করা যাইতে পারিবে। কেহ কেহ বলেন যে ভূমি সংক্রান্ত রাজস্ব প্রভৃতি কর গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে হুকুমের দ্বারাই ধার্য্য করিতে পারেন ও আইনের দরকার হয় না। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত নিয়মাদি এতই জটিল, যে যাহাদিগকে রাজস্ব দিতে হয় তাহারাই ভাল বুঝিতে পারে না। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আসাম ও মধ্য প্রদেশে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টগণ রাজস্বের হার নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে জন সাধারণকে জানাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়া থাকেন। অন্যান্য গবর্ণমেণ্টকেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য এই যে যদি কাহারও রাজস্বের হার প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু আপত্তি থাকে, তাহা হইলে হুকুম বাহির হইবার পূর্ব্বেই যেন এই আপত্তি রাজপুরুষগণকে জানান হইয়া থাকে। যে সব প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত নাই, সেই সব প্রদেশেই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ম্মাদেশে রাজস্বের বিষয় একটী কমিটী দ্বারা তদন্ত করা হইয়াছে বলিয়া সে প্রদেশে এখনও কিছু করা হয় নাই। যে জএণ্ট কমিটী কর্ত্তৃক শাসন সংস্কারের আইন বিবেচিত হইয়াছিল তাঁহাদিগের সমক্ষে ও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল ও তাঁহাদিগের সম্মুখে অনেকে হাজির হইয়া বর্ত্তমান রাজস্ব প্রণালীর যে অনেক দোষ আছে তাহা দেখাইয়াছিলেন। এই কমিটী প্রস্তাব করেন, যে কিরূপে ভূমির রাজস্ব নির্দ্ধারণ করা হইবে, কি পরিমাণে রাজস্ববৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে এ সমস্ত বিষয় সম্বলিত করিয়া একটী আইন পাশ করা হউক। কমিটী আরও বলেন যে যতদিন না জমীদার ও প্রজা উভয়ই সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার পাইবেন ততদিন জমীর খাজনার বিভাগ দেশীয় মন্ত্রীর হস্তে অর্পণ করা অযৌক্তিক হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শাসন সংস্কার বিধি।

১৯১৯ সালের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ঘটনা ভারত শাসন সংস্কার আইন পাশ হওয়া। পূর্ব্ববর্ষে মণ্টেগু-চেমশফোর্ড রিপোর্টে ইহার পূর্ব্বাভাষ দেওয়া হইয়াছিল ও আলোচ্য বর্ষে ডিসেম্বার মাসে পার্লামেণ্ট মহাসভা কর্ত্তৃক এই আইন পাশ হইয়াছিল। এই বিষয়টি বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে এত গুরুতর যে কিরূপে বর্ত্তমান প্রণালী হইতে ক্রমে ক্রমে শাসন সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়া পরে আইনে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা উচিত। নূতন আইনে অবস্থার কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা দেখানই এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য।

পার্লামেণ্ট মহাসভা ভারতসচিবের সাহায্যে ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীর উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন ও এই সভাই ভারত সংস্কার আইন পাশ করিয়াছেন। ১৯১৫ সালের আইনের দুই ধারায় ভারত-সচিবের ক্ষমতা কি তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। উক্ত আইনের এক ধারা অনুযায়ী ইংরাজাধিকৃত ভারত ইংলণ্ডের রাজা ও ভারত সম্রাটের নামে শাসিত হইয়া থাকে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বর্ত্তমান থাকিলে ভারত শাসন সম্বন্ধে যাহা করিতেন তাহা সমস্তই ভারত সম্রাটের নামে করা হইয়া থাকে। ভারত সচিব ভারত শাসন কার্য্যে তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন ও সকল রাজপুরুষ দিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। ভারত শাসন সম্বন্ধে সকল খবরই ভারত সচিবকে লইতে হয়। যদি ভারত শাসন সম্বন্ধে ভারত সচিব কোন হুকুম দেন তাহাহইলে পার্লামেণ্ট সভায় যে কোন সদস্য ইচ্ছা করিলে তাহার বিপক্ষে আপত্তি করিতে পারেন। প্রতিবর্ষে ভারত সচিবকে ভারতবর্ষের আয় ব্যয়ের একটি তালিকা পার্লামেণ্ট সভায় দিতে হয়, কিন্তু যদিও এই আয় ব্যয়ের তালিকা লইয়া আন্দোলন করা হয়না, অথাচ এই উপলক্ষে ভারত সংক্রান্ত অনেক বিষয় সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে।

ভারতসচিবের অধীনে দুইটি সহকারি সম্পাদক ও তাঁহার সভার সদস্যগণ আছেন। দুইটি সহকারি সম্পাদক দিগের মধ্যে একজন পাকা ও অপর জন ভারত সচিব যতদিন ঐ পদে নিযুক্ত থাকেন, ততদিন তিনিও সহকারি সম্পাদক পদে নিযুক্ত থাকেন। ভারত সচিবের উক্ত সভার সদস্য সংখ্যা দশ হইতে চৌদ্দ ও তাঁহারা

সকলেই সাত বৎসরের জন্য উক্ত পদে নিযুক্ত থাকেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ নয়জন হয় ভারতবর্ষে দশ বৎসরের জন্য চাকরি করিয়াছেন অথবা দশবৎসর বাস করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়াগিয়া পাঁচ বৎসরের অধিক কাটাইলে সদস্যপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়না। ভারত সচিব স্বীয় ক্ষমতার কতকাংশ ভারতবর্ষীয় শাসনকর্ত্তাদিগের উপর অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দায়িত্ব সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিমাণে আছে। তাঁহার সদস্যগণ তাঁহার মতের প্রতিকূলতা করিতে পারেন ও যে বিষয়ে টাকার দরকার সে প্রস্তাব ইচ্ছা করিলেই নামঞ্জুর করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা কার্য্যতঃ প্রায় এরূপ করেন না। বিলাতের মন্ত্রী সমাজ কোন বিষয়ে কিছু স্থির করিলে ভারত সচিবের সদস্যগণ আর তাহাতে আপত্তি করেন না। এদেশীয় রাজপুরুষগণ যেকোন বিষয়ে যে সব প্রস্তাব করিয়া থাকেন, তাহা ভারত সচিবের নিকট অনুমোদনার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। তবে যে সম্বন্ধে ভারত সচিব তাঁহাদিগের উপর নিজের কতকগুলি ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন, সে সব বিষয়ে তাঁহার অনুমোদনের আবশ্যক হয় না। ফলতঃ ভারতশাসন সম্বন্ধে তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। কতকগুলি বিষয় আছে, যাহাতে সদস্যগণের অধিকাংশ সম্মতি না দিলে উহা অনুমোদিত হইতে পারে না। দুইটি বিষয় ব্যতীত আর সকল বিষয়েই ভারত সচিবকে তাঁহার সদস্যদিগের সহিত পরামর্শ করিতে হয়। তিনি সাপ্তাহিক সভায় এই সব প্রশ্নের উত্থাপন করেন, অথবা কোন আদেশ জারি করিবার সাতদিন অগ্রে তাঁহার হুকুম সভার সমক্ষে স্থাপিত করেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে সদস্য দিগের মত অগ্রাহ্য করিতে পারেন। পূর্ব্বে বলাহইয়াছে যে দুইটি বিষয় ভিন্ন অপর সকল বিষয়ে ভারত সচিবকে তাঁহার সদস্য দিগের সহিত পরামর্শ করিতে হয়। যে দুইটি বিষয়ে পরামর্শ করিতে হয় না, তাহার একটি হইতেছে এই যে অত্যন্ত শীঘ্র কোন হুকুম দিতে হইলে তিনি সদস্যদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া হুকুম দিতে পারেন কিন্তু পরে এবিষয় সদস্য গণকে জানাইতে হয় ও দ্বিতীয়টি হইতেছে যুদ্ধ বিগ্রহ শান্তি স্থাপনা ও দেশীয় মিত্ররাজ দিগের ব্যবহার সম্বন্ধে। এই বিষয়ে সদস্যদিগকে সভায় ডাকাইয়া তাঁহাদিগের মত লইবার দরকার নাই।

১৯১৯ সালে ভারত শাসন সংক্রান্ত আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে সদস্যগণ বার্ষিক এক হাজার পাউণ্ড বেতন পাইতেন। ভারত সচিবের আপিস সংক্রান্ত যাবতীয় খরচই তখন ভারত বর্ষের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইত।

এদেশের কথা এই যে গবর্ণর জেনেরেল ও তাঁহার কার্য্যকারি সভার সদস্যগণের হস্তে ভারত শাসনের ভার অর্পিত আছে। গবর্ণরজেনেরালের সভায় এখন সাতজন সদস্য আছেন যথা দেশের আভ্যন্তরীণ বিভাগে, রাজস্ব বিভাগে, আর ব্যয়

বিভাগে, আইন বিভাগে, বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প বিভাগে, শিক্ষা বিভাগে, সৈনিক বিভাগে ও পররাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগে। শেষোক্ত বিভাগটি সম্পূর্ণভাবে কেবল স্বয়ং গবর্ণর জেনেরালেরই অধীন ও সদস্যগণের এই বিভাগের উপর কোন কর্তৃত্ব নাই।

গবর্ণর জেনেরালের কার্যকারি সভার সাতজন সদস্যের মধ্যে অন্ততঃ তিন জন এমন ব্যক্তি হইবেন যাঁহারা ভারতবর্ষে অন্যূন দশ বৎসর চাকরি করিয়াছিলেন। সদস্যদিগের মধ্যে একজনকে ব্যারিষ্টার (কৌসুলি) হইতে হইবে। কোন ভারতবাসিকে এই পদে নিযুক্ত করিবার নিষেধ নাই, ও একজন দেশীয় ব্যক্তি আইন ও আর একজন শিক্ষাবিভাগের কর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন।

এক্ষণে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। ১৯০৯ সালের আইনের দ্বারা এই সভা গঠিত হইয়াছে। গবর্ণরজেনেরালের কার্য্যকারি সভার সদস্যগণ ভিন্ন এই সভার পঁয়ত্রিশ জন সদস্য গবর্ণরজেনারেল কর্তৃক মনোনীত ও পঁচিশ জন সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হন্ ও তিনি স্বয়ং এই সভার সভাপতি। সরকারি সদস্যগণের সংখ্যাই এই সভায় অধিক। ব্যবস্থাপক সভা কেবল আইন প্রনয়ণ কার্য্যেই নিযুক্ত নহেন। বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব ও অন্যান্য অনেক বিষয় যাহাতে জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে, তাহাও এই সভায় আলোচিত হইয়া থাকে। সংবাদ সংগ্রহের জন্য এই সভায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে, কিন্তু যদি গবর্ণরজেনেরল কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সাধারণের স্বার্থ হানি হইতে পারে এরূপ বিবেচনা করেন, তাহাহইলে তিনি উক্ত প্রশ্ন নামঞ্জুর করিতে পারেন। এই সভার সভ্যগণ ইচ্ছা করিলে সভার অনুমোদনের জন্য কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে বিচার ও আন্দোলন করিতে পারেন, কিন্তু কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলেই যে গবর্ণমেণ্ট উহা কার্য্যে পরিণত করিতে বাধ্য তাহা নহে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে উক্ত অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। এইত গেল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আইন করণ সম্বন্ধে ক্ষমতা। এক্ষণে রাজ্যশাসন কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা বলা যাইতেছে। শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষ নয়টি বড় ও ছয়টি ছোট প্রদেশে বিভক্ত। বড় প্রদেশ গুলির মধ্যে হইতেছে মান্দ্রাজ, বোম্বাই, বাঙ্গালা, যুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, বর্ম্মা, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ ও আসাম। ছোট প্রদেশ গুলি হইতেছে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থানের ইংরাজ অধিকৃত অংশ, কুর্গ, আজমীর মেড়ওয়ারা আন্দামান দ্বীপ পুঞ্জ ও রাজধানী দিল্লী।

গবর্ণরগণকে বিলাতে ভারত সম্রাট নিযুক্ত করিয়া থাকেন। যদিও এমন কোন নিয়ম নাই যে সিবিল সার্ব্বিশের কোন রাজপুরুষ এই পদে নিযুক্ত হইতে

পারিবেননা, তত্রাচ সচরাচর বিলাতে যাঁহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই এইপদে মনোনীত হইয়া থাকেন। কিন্তু লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরগণের ও আসাম ও মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনারগণের পদে সিবিলসার্বিশের কর্ম্মচারিগণই নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

১৯০৯ সালের আইন অনুসারে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বাঙ্গলা ও বিহার এবং ওড়িষার কার্য্যকারি সভার কাহারই চারিজনের অধিক সভ্য হইতে পারে না ও সভ্যদিগের মধ্যে অন্ততঃ দুইজনকে উক্ত সভার সদস্যপদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে এদেশে বার বৎসর চাকরি করিয়াছেন এইরূপ হইতে হইবে। এক্ষণে কিন্তু প্রত্যেক সভারই তিনজন মাত্র সদস্য আছে, ও তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজন সিবিলসার্বিস ভুক্ত ও একজন দেশীয় ব্যক্তি।

প্রেসিডেন্সির গবর্ণরগণ প্রাচীন স্বাধীনতার কিয়দংশ এখনও ভোগ করিতেছেন। যে সব বিষয়ে কোন ব্যয় হইবার কথা নাই সেসব বিষয়ে তাঁহারা ভারতসচিবের সহিত লেখালেখী করিতে পারেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কোন আদেশের বিরুদ্ধে ভারতসচিবের নিকট আপীল করিতে পারেন, তাঁহাদিগের অধীন প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণকে নিযুক্ত করিতে পারেন, ও রাজস্ব এবং বনবিভাগের কার্য্যে তাঁহাদিগের উপর তত্ত্বাবধারণ করা হয় না। বিশেষ আবশ্যক হইলে গবর্ণর তাঁহার সদস্যগণের মত অগ্রাহ্য করিতে পারেন কিন্তু সচরাচর সদস্যগণের ভোট অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। গবর্ণর জেনেরালও তাঁহার কার্য্যকারি সভার সদস্যগণ মিলিয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু এদেশে দশবৎসর কর্ম্ম না করিলে কেহ এইপদে নিযুক্ত হইতে পারেন না। চীফ কমিশনারগণকেও ইঁহারাই নিযুক্ত করিয়া থাকেন ও যদিও তাঁহারা গবর্ণর জেনারালের নামেই রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন তবু তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রায় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরগণেরই সমান। এক্ষণে মধ্যপ্রদেশে ও আসামে ব্যবস্থাপকসভা স্থাপিত হওয়াতে চিফ কমিসনরের পদের সহিত লেপ্টেনাণ্টগবর্ণরের পদের বৈষম্য অনেক দূর হইয়াছে।

গবর্ণর ও লেফটেনাণ্ট গবর্ণরগণের প্রত্যেকেরই একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে ও সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনারেরও একটি ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হইয়াছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের মধ্যে বেসরকারি সদস্যের সংখ্যাই অধিক। এই সভাগুলির প্রধান কার্য্য আইন প্রণয়ন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় ইহাদিগেরও কেবল পরামর্শ দিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু গবর্ণর কিম্বা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাদিগের মতানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন।

নূতন শাসনসংস্কার প্রস্তাবের মূল ১৯১৭ সালে বিশে আগষ্ট তারিখে কমন্স মহাসভায় ভারতসচিব মণ্টেগু সাহেবের বক্তৃতা। তাহার পর ১৯১৮ সালে জুলাইমাসে ভারতসচিব ও গবর্ণর জেনেরালের স্বাক্ষরিত সংস্কার বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশিত হয়। এই মন্তব্যে ভারতবাসিদিগকে ক্রমশঃ শাসন কার্য্যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইবে ইহা প্রকাশ করা হয়।

ইতঃপূর্ব্বে ভারতবাসিগণের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে যাহা কিছু করা হইয়াছিল, এই নূতন শাসন সংস্কারের প্রস্তাবের সহিত তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর মাত্র। কেননা এই প্রস্তাবে কেবল যে ভবিষ্যতে উন্নতি হইবে তাহা নহে। এখনি কতকটা ক্ষমতা দেওয়া হইবে। সুতরাং ১৯০৯ সালের আইন হইতে গবর্ণমেণ্ট অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছেন। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোডকৃত শাসনসংস্কার প্রস্তাব চারিভাগে বিভক্ত। যথা—প্রথমতঃ, মিউনিসিপালিটি, ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড প্রভৃতিতে সাধারণের প্রতিনিধিগণের উপর সকল ক্ষমতা অর্পিত হইবে ও তাহাদিগের উপর বাহির হইতে কেহ কর্ত্তৃত্ব করিতে প্রায় পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রদেশ সমূহ শাসন ব্যাপারে সাধারণের প্রতিনিধিগণকে ক্ষমতা প্রথমে প্রদত্ত হইবে। তাঁহাদিগকে কতক পরিমাণে ক্ষমতা এখনই দেওয়া হইবে, ও অবশিষ্ট ক্ষমতা যেমন তাঁহারা যোগ্যতা দেখাইতে পারিবেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের উপর অর্পিত হইবে। অর্থাৎ আইনকরণ রাজ্যশাসন ও রাজস্ব নির্দ্ধারণ বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে যতটা সম্ভব স্বাধীন হইবেন। তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পার্লামেণ্ট মহা সভার নিকট ভারত শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে দায়ী হইবেন। কিন্তু তাহার বাহিরে অন্যান্য বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হুকুম অপ্রতিহত থাকিবে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় অধিক সংখ্যক সাধারণের প্রতিনিধিগণ সদস্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন ও তদ্দ্বারা তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর তাঁহাদিগের প্রভাব স্থাপনা করিতে সক্ষম হইবেন। এদিকে যেমন সাধারণের প্রতিনিধিগণের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইবে, তেমনি অন্যদিকে পার্লামেণ্টও ভারতসচিবের কর্ত্তৃত্ব ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদিগের উপর কমিয়া যাইবে।

চেমসফোড-মণ্টেগু কৃত প্রস্তাবের বলে অতঃপর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগণের আয় ব্যয়ের হিসাব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয়ব্যয়ের হিসাব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে ও তাঁহাদিগের উদ্বৃত্ত অর্থের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে খরচা চালাইবার সাহায্যার্থে দিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এই সাহায্যদান বাদে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগণ তাঁহাদিগের আয়ের অবশিষ্ট অংশ তাঁহাদিগের ইচ্ছানুযায়ী

খরচ করিতে পারিবেন ও তাঁহাদিগকে কর স্থাপন করিবার ও দেনা করিবার ক্ষমতা ও প্রদত্ত হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কার্য্য দুই দল রাজ-পুরুষের হস্তে অর্পিত হইবে। প্রথম দল হইতেছে কার্য্যকারি সভার সদস্যগণ ও তাঁহাদিগের হস্তে কতকগুলি বিভাগ অর্পিত হইবে। এই সব বিভাগ গুলি রিজার্ভড্ বিষয় সংক্রান্ত বিভাগ বলা হইবে। দ্বিতীয় দল হইতেছে যাঁহারা সাধারণের প্রতিনিধি এবং মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদিগের হস্তে যে যে বিভাগ দেওয়া হইবে, সেই বিভাগ গুলির বিষয় গুলিকে হস্তান্তরিত বিষয় বলা হইবে। এই মন্ত্রীগণ জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি গণের মধ্য হইতেই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। কার্য্যকারি সভার সদস্য হইবেন দুই জন তন্মধ্যে একজন হইবেন ইংরাজ রাজপুরুষ ও অপর সদস্য হইবেন একজন বেসরকারি দেশীয় ব্যক্তি। এইরূপে শাসন ক্ষমতা দুই দলের হস্তে অর্পণ করিবার উদ্দেশ্য এই যে দেশীয় মন্ত্রীগণ ক্রমে ক্রমে শাসন কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন ও তাঁহারা যে পরিমাণে যোগ্যতা দেখাইতে পারিবেন সেই পরিমাণে নূতন ক্ষমতা ও নূতন বিভাগের ভার কার্য্যকারি সভার হস্ত হইতে উঠাইয়া লইয়া মন্ত্রীগণের হস্তে অর্পণ করা হইবে। বিভাগ দিগের মধ্যে কোন গুলি কার্য্যকারি সভার হস্তে দেওয়া হইবে ও কোন গুলি মন্ত্রীদিগের হস্তে অর্পিত হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইবে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অবস্থা স্বতন্ত্র বলিয়া সকল প্রদেশেই এক ব্যবস্থা প্রচলিত হইবেনা। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের মধ্যে নির্ব্বাচিত সভ্য দিগের সংখ্যাই অধিক হইবে। এই সভ্যগণ সাধারণের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন, ও ভোট দাতা গণের সংখ্যা ও যতদূর সম্ভব বাড়ান হইবে। কাহাদিগকে ভোট দেওয়া হইবে সে প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ও একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইবে। আবার প্রত্যেক বিভাগের জন্য একটি করিয়া ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি নিযুক্ত করা হইবে। সদস্য গণ রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কোন কোন্ বিষয়ে প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু যদি এমন ঘটে যে কার্য্যকারি সভার অধীনে যে যে বিষয় আছে, তাহা সংক্রান্ত কোন আইন ব্যবস্থাপক সভা অনুমোদন করিতে অস্বীকার করেন এবং গবর্ণমেণ্ট এই আইন পাশ হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহা হইলে এই বিবাদনিষ্পত্তির জন্য একটি গ্র্যাণ্ড কমিটি নিযুক্ত হইবে। সভার সভ্যগণের প্রায় অর্দ্ধেকেই এই গ্র্যাণ্ড কমিটির সভ্য নিযুক্ত হইবেন। গ্র্যাণ্ড কমিটি বিবাদের নিষ্পত্তি করিলে, পুনরায় সেই আইন ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষে পুনরায় বিবেচনা করিবার জন্য উপস্থিত করা হইবে। সভা কিন্তু গ্র্যাণ্ড কমিটি কর্ত্তৃক সংশোধিত এই আইন আর পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। তবে যদি কার্য্যকারি সভার কোন সদস্য প্রস্তাব করেন যে উক্ত

আইন পরিবর্ত্তিত কিম্বা অগ্রাহ্য হউক, তাহা হইলেই সেরূপ হইতে পারিবে। নতুবা আইন পাস হইবে। তবে সভার আপত্তি থাকিলে উক্ত আপত্তি একটি মন্তব্যে প্রচার করা হইবে ও ঐ মন্তব্য আইনের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ভারত সচিবের নিকট প্রেরিত হইবে।

কার্য্যকারি সভা কর্তৃক আয় ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত হইবে। ব্যয়ের তালিকার প্রথমেই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে যে টাকা দিতে হইবে তাহার উল্লেখ থাকিবে। তাহার পর কার্য্যকারি সভার অধীনে যে যে বিভাগ থাকিবে তাহাদিগের জন্য খরচের তালিকা প্রস্তুত হইবে। আর মন্ত্রীদের হস্তে যে যে বিভাগ অর্পিত হইবে তাহাদিগের খরচার তালিকা মন্ত্রীগণ স্বয়ং প্রস্তুত করিবেন। যদি আয়, ব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত কর স্থাপনের বিষয় গবর্ণর ও মন্ত্রীগণ বিবেচনা করিবেন। তাহার পর উক্ত আয় ব্যয় তালিকা ব্যবস্থাপক সভার সম্মুখে বাদানুবাদের জন্য উপস্থিত করা হইবে। প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধীয় খরচার বিচার করা হইবে ও তৎসম্বন্ধে সভা মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন। যদ্যপি কার্য্যকারি সভার অধীনস্থ কোন বিভাগের খরচ ব্যবস্থাপক সভা পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে গবর্ণর উক্ত খরচা সম্পূর্ণ পরিমাণে কিম্বা আংশিক পরিমাণে অনুমোদন করিতে সভাকে বাধ্য করিতে পারিবেন। গবর্ণর তাঁহার এই ক্ষমতার ব্যবহার করিলে আয় ব্যয় তালিকা যেরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে, সভার মত ভিন্ন অন্য কোন রূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারিবেনা।

পূর্ব্বোক্ত সংশোধন ও সংস্কার গুলি কার্য্যে পরিণত হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গণের রাজ্য শাসন, আইন করণ, কর স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে ও ক্রমে ক্রমে শাসন ভার এ দেশীয় দিগের হস্তেই ন্যস্ত হইবে। সভ্য নির্ব্বাচন ক্ষমতা যাঁহারা প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা যত অধিক শিক্ষিত হইবেন, তাহাঁদিগের তত অধিক পরিমাণে দায়িত্ব বোধ হইবে। ইহাও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে দশ বৎসর অন্তর একটি কমিশন নিযুক্ত হইয়া কার্য্যকারি সভার সদস্য গণের হস্ত হইতে কি কি বিভাগ উঠাইয়া লইয়া মন্ত্রীগণের হস্তে প্রদত্ত হওয়া উচিত তাহার বিচার করিবে।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে মণ্টেগু চেম্‌স্ ফোর্ড কৃত রিপোর্টে দুই দল রাজ পুরুষ দিগের হস্তে কর্তৃত্বভার দিবার প্রস্তাব করা হয় নাই। তাঁহাদিগের মতে যত দিন না প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি শাসন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণ পরিমাণে প্রাপ্ত না হইতেছেন, ততদিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে দুই দল কর্তৃক শাসনের ব্যবস্থা করা যুক্তি-সিদ্ধ হইবেনা। সুতরাং শান্তিরক্ষা, সুশাসন প্রভৃতি বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা অপ্রতিহত থাকিবে। সেই জন্য যদিও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য গণের মধ্যে

বেসরকারি প্রতিনিধিই অধিক থাকিবেন, তত্রাচ কাৰ্য্যকারি সভা যে আইন করা আবশ্যক বোধ করিবেন, সে আইন অনুমোদন করিতে যদি ব্যবস্থাপক সভা অস্বীকার করেন তাহা হইলে এই গোলযোগ মিটাইবার জন্য ও পূর্ব্বোক্ত আইন অনুমোদিত করিবার জন্য এই বিষয় আর একটি সভা কর্তৃক বিবেচিত হইবে, এই সভার নাম কাউন্সিল অফষ্টেট অর্থাৎ সরকারি সভা হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারি সভার গঠন সম্বন্ধে রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয় যে তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনের স্থানে দুই জন দেশীয় সভ্য হইবেন ও সভ্য মনোনয়ন সম্বন্ধে কতকগুলি যে নিষেধ আছে তাহা পরিত্যক্ত করিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা হইবে একশত ও তাহার মধ্যে তৃতীয়াংশের দুই অংশ সভ্য জন-সাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন ও অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ সভ্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত বা নিযুক্ত হইবেন। মুসলমান ও পাঞ্জাবের শিখগণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মাবলম্বী ও জাতিদিগের মধ্যেই নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবেন। কাউন্সিল অফ ষ্টেটের সভ্য সংখ্যা হইবে পঞ্চাশ ও তন্মধ্যে একুশজন অধিবাসিদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন ও অবশিষ্ট উনত্রিশ জন সভ্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। এই উনত্রিশ জনের মধ্যে পঁচিশ জন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারি হইবেন।

আইন করণ সম্বন্ধে প্রস্তাব করা হয় যে যদি সরকারি আইন হয় তাহা হইলে উহা প্রথমে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষে বিচারার্থ প্রবর্ত্তিত হইবে। তাহার পর কাউন্সিল অফ্ ষ্টেটে আন্দোলনের জন্য উপস্থিত করা হইবে। কিন্তু যদি দুই সভার মধ্যে মতের অনৈক্য হয় তাহা হইলে উভয় সভার সদস্যগণ একত্রিত হইয়া আইন সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিবেন। বেসরকারি আইন সম্বন্ধেও এই প্রস্তাব করা হয়, তবে আইনের প্রণেতা যদি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন, তাহা হইলে উক্ত সভাতেই আইন প্রবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু যদি তিনি কাউন্সিল অফ ষ্টেটের সভ্য হন, তাহা হইলে উক্ত সভাতেই আইন প্রবর্ত্তনা করা হইবে। যদ্যপি কাউন্সিল অফ ষ্টেট কোন আইনের কোন পরিবর্ত্তন করেন ও ব্যবস্থাপক সভা উক্ত পরিবর্ত্তন অনুমোদন করিতে অস্বীকার করেন, এবং যদি গবর্ণর জেনেরাল বিবেচনা করেন যে দেশে শান্তি রক্ষার জন্য উক্ত পরিবর্ত্তন আবশ্যকীয়, তাহা হইলে তিনি কেবল এই মর্ম্মে এক নিদর্শন পত্র প্রকাশ করিবেন এবং তাহা হইলেই উক্ত পরিবর্ত্তন অনুমোদিত হইবে। ব্যবস্থাপক সভা তখন আর এই পরিবর্ত্তন অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। দুই সভা মিলিত হইয়া ও এই পরিবর্ত্তন পুন র্বিবেচনা করিতে পারিবেন না। তেমনি যদি ব্যবস্থাপক সভা কোন আইন প্রবর্ত্তনা করিতে অনুমতি দিতে অসম্মত হন্ কিম্বা কোন আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর অগ্রাহ্য

করেন, ও যদি গবর্ণর জেনেরালের মতে উক্ত আইন অত্যন্ত আবশ্যকীয় বোধ হয়, তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় নিদর্শন পত্র প্রকাশ করিলে উক্ত আইন কাউন্সিল অফ ষ্টেটে প্রবর্ত্তিত হইবে, ও কাউন্সিল কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে আইন হইয়া যাইবে।

আয় ব্যয় তালিকা ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বিচারার্থ প্রবর্ত্তিত হইবে, কিন্তু সভ্যগণ যে প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন তাহার অনুযায়ী কার্য্য করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইবেন না। উক্ত প্রস্তাব পরামর্শরূপে বিবেচিত হইবে কিন্তু আদেশরূপে পালিত হইবে না। এখানেও কার্য্যকারি সভার সভ্যগণের সাহায্যার্থ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি নিযুক্ত হইবে।

ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির কার্য্য কিরূপ চলিতেছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য দশ বৎসর অন্তর একটি কমিশন পার্লামেণ্ট মহাসভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে যেমন যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাইবে, দেশীয়দিগকে তেমনি অধিক ক্ষমতাও দেওয়া হইবে।

রিপোর্টে আরও প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে ভারতবর্ষের জন্য একটি প্রিভি কাউন্সিল নামে মহাসভা নিযুক্ত করা উচিত। দেশের গণ্যমান্য লোকদিগের ভিতর হইতে এই সভার সদস্যগণ মনোনীত হইবেন। গবর্ণর জেনেরাল ইচ্ছা করিলে কোন কোন বিষয়ে ইহাঁদিগের মত লইতে পারিবেন। এই সভার সভ্যগণ "অনরেবল্" উপাধি প্রাপ্ত হইবেন।

যে পরিমাণে বেসরকারি ব্যক্তিদিগের উপর ক্ষমতা দত্ত হইবে, সেইপরিমাণে ভারত সচিবকে ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর নিজের ক্ষমতা লাঘব করিতে হইবে ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকেও সেই পরিমাণে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট দিগের উপর নিজের ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। আরও প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে বিলাতের ভারত আপিস পুনর্গঠিত করণের জন্য একটি কমিটি তথায় নিযুক্ত করা হউক ও পুনর্গঠন যেন এরূপে সম্পাদিত হয় যে ভারত সচিবের কাজ শীঘ্র শীঘ্র নির্ব্বাহ হইতে পারে। আরও প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে যেহেতু এখন ভারতসচিবকে প্রায়ই অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মত গ্রহণ করিতে হইবে, অতএব এক্ষণে ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষগণও ভারত আফিসের কর্ম্মচারিগণ পরস্পরের সহিত পদ বদল করিতে পারিবেন।

সরকারি বিভাগ দিগের কর্ম্মচারিগণ সম্বন্ধে রিপোর্টে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ, সরকারি চাকুরি সম্বন্ধে জাতিগত কোন পার্থক্য করা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশে নিয়ম করা হইবে

যে এখন যেসব চাকরির জন্য বিলাতে লোক নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহাদিগের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সংখ্যার জন্য এদেশে লোক লওয়া হইবে। ভারতবর্ষীয় সিবিলিয়ানের পদের জন্য প্রতিবৎসর যতলোক নিযুক্ত হইবে, তাহার প্রথমে এক তৃতীয়াংশ দেশীয় হইবে ও তাহার পরে প্রতিবর্ষে শতকরা দেড়ের হিসাবে বাড়িতে থাকিবে, ও তাহার পর দশ বর্ষান্তে যে কমিশন বসিবে তদ্দ্বারা এবিষয়ে তদন্ত করা হইবে ও তখন যদি দেশীয় সিবিলিয়ানের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা সঙ্গতবোধ হয়, সেইরূপ কার্য্য করা হইবে। তাহা ছাড়া এক্ষণে ভারত সচিবের বেতন বিলাতের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে, ও সে জন্য বিলাতের অধিবাসিগণ ও তাঁহাদিগের পার্লামেণ্টে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভারতবর্ষের ব্যাপারে আরও অধিক মনোযোগী হইবেন। যাহাতে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অভিজ্ঞ এমন কতকগুলি পার্লামেণ্টের সভ্যগণ সভার অধিবেশন কালে প্রায়ই উপস্থিত থাকিতে পারেন. তজ্জন্য কমন্স মহাসভা ভারত শাসন সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিবেন।

মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টে কেবল মূল সূত্র গুলিই ব্যাখ্যা করা হইয়া ছিল। সুতরাং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলির বিচারের জন্য তিনটি কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল। প্রথমটির নাম ভোট সংক্রান্ত কমিটি, দ্বিতীয়টি বিভাগ হস্তান্তরিত করিবার কমিটি ও এই দুইটি কমিটিরই সভাপতি ছিলেন লর্ড সাউথবরো। ইহাঁরা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই লোকের মতামত গ্রহণের জন্য ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের কাজে পাঁচমাস সময় লাগিয়াছিল। তৃতীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন লর্ড ক্রু ও ইহার অধিবেশন লণ্ডন নগরে হইয়াছিল। ভোট সংক্রান্ত কমিটির প্রস্তাবগুলি এই :—যাঁহারা কিঞ্চিৎ সম্পত্তির অধিকারি ও এলাকার মধ্যে বাস করিয়া থাকেন, কেবল তাঁহাদিগকেই ভোটের অধিকার দেওয়া হইবে। যে সৈন্যগণ পেনসন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পদ যাহাই হউক না কেন, তাহাদিগকেও এই অধিকার দেওয়া উচিত। স্ত্রীগণ কিম্বা একুশ বঁছরের কম বয়স্ক যুবকগণকে কিম্বা বিদেশী ব্যক্তি বা উন্মাদকে এই অধিকার দেওয়া হইবে না। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন অতঃপর আর প্রতিনিধির দ্বারা হইবে না, এক্ষণে সাক্ষাৎ ভাবেই হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেক ভোটারই নির্ব্বাচন করিতে পারিবে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কাউন্সিল অফ ষ্টেটের সভ্যগণের সম্বন্ধে কমিটি প্রস্তাব করেন যে সাক্ষাৎ নির্ব্বাচন না হওয়াই ভাল। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কাউন্সিল অফ ষ্টেটের সভ্যগণের সংখ্যা কত হইবে, রিপোর্টে সে সম্বন্ধেও প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

গবর্ণমেন্টের চাকরি হইতে পদচ্যুত হইলে কেহ সভ্যপদের জন্য প্রার্থী হইতে

পারিবেনা; এনিষেধ এখনই আছে। যদি উক্ত পদচ্যুতি নৈতিক দোষের জন্য ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে কমিটীও এই নিষেধের সমর্থন করিয়াছিলেন। কমিটী আরও প্রস্তাব করেন যে দেশীয় রাজাগণের প্রজাগণ যাহারা ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিয়া থাকে, তাহাদিগকেও ভোটের অধিকার দেওয়া উচিত।

জাতি বা ধর্ম্ম হিসাবে নির্ব্বাচনের বিষয়ে কমিটী প্রস্তাব করেন যে ঐরূপ নির্ব্বাচন কেবল মুসলমানদিগের পক্ষে, পাঞ্জাবের শিখজাতির পক্ষে, মান্দ্রাজের দেশীয় খৃষ্টানদিগের পক্ষে, বোম্বাই, বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের ইউরোপিয় দিগের পক্ষেও মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালা প্রদেশে ইউরেশিয়ান দিগের পক্ষে চলিবে। তাঁহারা মহারাষ্ট্রও মান্দ্রাজি অব্রাহ্মণ দিগের পক্ষে এ ব্যবস্থার বিপক্ষে মত দিয়া ছিলেন। এক্ষণে যদি গবর্ণর বিবেচনা করেন যে কোন ব্যক্তির নির্ব্বাচন সাধারণের পক্ষে মঙ্গল জনক হইবেনা, তাহা হইলে উক্ত নির্ব্বাচন বাতিল ও নামঞ্জুর করিতে পারেন। কমিটি প্রস্তাব করেন যে গবর্ণরের এই ক্ষমতা প্রত্যাহার করা উচিত ও সভ্য গণের সম্বন্ধে তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে বোম্বাই, পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশে সভ্যগণের স্থানীয় অধিবাসি হওয়া উচিত।

ভোট সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহাতে দেখা গেল যে অধিবাসি সংখ্যার তুলনায় ভোটারের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে এবং সহরের প্রতিনিধি সংখ্যার সহিত পল্লীগ্রামের প্রতিনিধি গণের সংখ্যার ও অনেক বৈষম্য ঘটিয়াছে। ভোট দিবার অধিকারের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট মূল্যের সম্পত্তির অধিকারি হওয়া চাই বটে, কিন্তু এই সম্পত্তির মূল্য সকল প্রদেশেই এক নহে, এমন কি একই প্রদেশের কোন কোন স্থানে ভোটার হইতে গেলে ও পরিমাণে সম্পত্তির মূল্য বিভিন্ন হইতে পারে।

ভোট সংক্রান্ত কমিটি দুইটি তালিকা প্রস্তুত করেন, একটিতে যে যে বিষয় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকারের মধ্যে ও অপরটিতে যে যে বিষয় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গুলির অধিকারে আসিবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির ভার থাকিবে যথা স্থল সেনা, জলসেনা, ও ব্যোম সেনা বিভাগ, বৈদেশিক রাজন্য বর্গের সহিত ও দেশীয় রাজ্য দিগের সহিত সম্বন্ধ, দুই চারিটি ব্যতীত সব গুলি রেলওয়ে, সৈন্য দিগের যাত্রার জন্য ও সামরিক উদ্দেশ্যে প্রস্তুত রাস্তা, খাল, পুলাদি, ডাক ও তার বিভাগ, মুদ্রা ও টাঁকশাল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সব রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, আইন, বাণিজ্য, ফৌজদারি আইন, ভারতীয় পুলিস বিভাগ, বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা ও আবিষ্কার, এবং ধর্ম্মযাজক দিগের বেতন প্রভৃতি। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গণের উপর নিম্নলিখিত বিষয়ের ভার অর্পিত হইবে। যথা, স্বায়ত্ত শাসন, চিকিৎসা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, প্রাদেশিক বাড়ী ঘর রাস্তা প্রভৃতি, ভূমির রাজস্ব, কৃষিকর্ম্ম, গো, অশ্বাদি পশু চিকিৎসা, মৎস্যের চাষ, যৌথ সমাজ,

বন বিভাগ, আবকারি, বিচার বিভাগ, শ্রমশিল্পের উন্নতি, পুলিশ, জেল, সংশোধন বিভাগ, ছাপাখানা ও সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের জন্য দেনা করা।

প্রাদেশিক বিষয় গুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। তাহাদিগের কতকগুলি কার্য্যকারি সভার সদস্য গণের হস্তে থাকিবে ও অপর গুলি দেশীয় মন্ত্রি দিগের হস্তে সমর্পিত হইবে। আইন করণ সম্বন্ধে কমিটি প্রস্তাব করেন যে প্রাদেশিক বিষয় সম্বন্ধে আইন করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট দিগকে সম্পূর্ণ রূপে প্রদত্ত হইবে। কিন্তু যে আইনের দ্বারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা খর্ব্ব হইতে পারে কিম্বা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এরূপ আইন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গণ প্রণয়ন করিতে যাইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হইবে। কমিটি আরও প্রস্তাব করেন যে কোন গবর্ণর নিম্ন লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবিত আইন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার হস্ত হইতে উঠাইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনারলের বিবেচনার্থ রাখিতে পারিবেন। যথা যে আইনের দ্বারা ভারতবর্ষের অধিবাসি গণের মধ্যে কোন কোন শ্রেণীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ হইতে পারে, কিম্বা কোন বিশ্ব বিদ্যালয় গঠন বা পরিচালন সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন হইতে পারে কিম্বা যে সব বিষয় মন্ত্রীদিগের এলাকার বহির্ভূত তাহা তাঁহাদিগের হস্তে আসিতে পারে কিম্বা মিউনিসিপালিটির ট্রামওয়ে ভিন্ন অন্য কোন রেলওয়ে গঠন বা কার্য্য সম্পাদন প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

বস্তুতঃ কমিটি দেশীয় মন্ত্রীদিগের হস্তে অনেক বিষয়ের ভার অর্পণ করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা দিগের মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জন্ম, মৃত্যুর রেজিষ্টারি, দলিল রেজেষ্টারি, ধর্ম্মের ও দাতব্যের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তির সুবন্দবস্ত, ভেজাল খাদ্য বিক্রয় নিবারণ প্রভৃতি। পূর্ব্বোক্ত দুইটি কমিটি তাঁহাদিগের মন্তব্য ১৯১৯ সালে মার্চমাসে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। উক্ত গবর্ণমেণ্ট তদুপরি তাঁহাদিগের নিজের মত ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। কি এদেশে, কি বিলাতে অনেক সংবাদ পত্র উক্ত মত গুলির মধ্যে কতকগুলির আদৌ সমর্থন করে নাই। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মতের কতক গুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। যে পাঁচটি প্রদেশের শাসন কর্ত্তা দিগের পদে এ তাবৎ সিবিলিয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন, এখন ও তাহাই হইবে, কোন পরিবর্ত্তন হইবেনা।

২। যে প্রদেশের গবর্ণরগণ বিলাত হইতে আসিবেন ও ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তাঁহাদিগের কার্য্যকারি সভার দুইজন সাহেব সদস্য থাকিবেন। পূর্ব্বে এক জন মাত্র সাহেব সভ্য নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

৩। কার্য্যকারি সভার সভ্যগণের হস্তে যে যে বিভাগ অর্পিত হইবে তাহাদিগের জন্য

যে টাকা আবশ্যক তাহার জন্য স্বতন্ত্র রাজস্ব তাঁহাদিগের হস্তে প্রদত্ত হইবে ও তেমনি মন্ত্রী গণের অধীন বিভাগ গুলির ব্যয়ের জন্য তাঁহাদিগকে ও স্বতন্ত্র রাজস্ব দেওয়া হইবে। সুতরাং উভয় দলেই তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে উৎসুক হইবেন। যদি একদলের পৃথক রাজস্বে তাঁহাদিগের ব্যয় সংকুলন না হয়, তাহা হইলে অন্য দলের রাজস্ব হইতে সাহায্যের দ্বারা উক্ত অভাব মোচন করা হইবে। উভয় দলের প্রত্যেকেই আবশ্যক হইলে নূতন কর স্থাপন কিম্বা দেনা করিতে পারিবেন। কিন্তু গবর্ণর দুই দলের সহিত পরামর্শ করিয়া যদি ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া উহাতে সম্মতি দেন, তাহা হইলেই নূতন করস্থাপন কিম্বা দেনা করণ সম্ভব হইবে। যদি দুই দলের স্বতন্ত্র রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট না করা হয় ও একই তহবিল হইতে উভয় দলেরই খরচ সংকুলন করা হয়, তাহা হইলে উভয় দলের মধ্যে টাকা লইয়া বিতণ্ডা হইবার সম্ভবনা।

চতুর্থতঃ, গবর্ণর আবশ্যক মনে করিলে উভয় দলের সহিত মিলিত হইয়া কোন বিষয়ে পরামর্শ করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহাতেও উভয় দলের পরস্পরের দায়িত্ব সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে। ভোট কমিটির প্রস্তাব গুলির মধ্যে নিম্ন লিখিত বিষয়ে ভারত বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত মতের মিল হয় নাই।

১। তাঁহাদিগের মতে দেশীয় রাজ্যের প্রজা গণকে ভোটের অধিকার দেওয়া কিম্বা তাহাদিগকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে দেওয়া বিধেয় হইবেনা।

২। সম্পত্তির অধিকারি না হইলে কাহাকেও ভোটের অধিকার দেওয়া হইবেনা।

৩। ভোটের অধিকার সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে ভোটারের সংখ্যা পঞ্জাবে কিয়ৎ পরিমাণে ও মান্দ্রাজে অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে পারে এবং বাঙ্গালা আসাম ও যুক্ত প্রদেশে এক তৃতীয়াংশ কমিতে পারে। পতিত জাতি দিগের দ্বারা সভ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের মতে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে ও বিশ্ব বিদ্যালয় কে নির্ব্বাচনের যে অধিকার দিবার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতেও গবর্ণমেণ্ট আপত্তি করিলেন।

জাতি বা ধর্ম্ম বিশেষে নির্ব্বাচনের মধ্যে মুসলমান দিগের সম্বন্ধে কমিটি যে প্রস্তাব করিয়া ছিলেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বাঙ্গালা প্রদেশ সম্বন্ধে তাহা যথেষ্ট নহে এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। অব্রাহ্মণ দিগের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের প্রস্তাব কমিটি অগ্রাহ্য করিয়া ছিলেন। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কমিটির মতের অনুমোদন করিলেন না। সহর ও মফস্বলের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য কমিটি যাহা প্রস্তাব করিয়া ছিলেন গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও আপত্তি করিলেন। কমিটি এখন যেমন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার

সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারেন, কমিটি সেই ব্যবস্থাই বাহাল রাখিয়া ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট দুঃখের সহিত এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন কিন্তু বলিলেন যে এ ব্যবস্থা কিছু দিনের জন্য বাহাল থাকিবে চিরকালের জন্য নহে। কাউন্সিল অফ ষ্টেট সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ নির্ব্বাচনের পক্ষে মত দিলেন।

বিভাগ কমিটি কৃত প্রস্তাবগুলির অধিকাংশই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মত নিম্নে উল্লিখিত হইল।

১। গবর্ণমেণ্টের মতে কমিটি আইন করণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত জটিল।

২। দেশীয় মন্ত্রীদিগের হস্তে বিশ্ববিদ্যালয়, মধ্যশিক্ষা ও শ্রমশিল্প শিক্ষার ভার অর্পণ করিবার প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট আপত্তি করিলেন।

৩। গবর্ণরের সহিত মন্ত্রীর কোন বিষয় সম্বন্ধে মতের মিল না হইলে উক্ত বিভাগ মন্ত্রীর হস্ত হইতে কার্য্যকরি সভার সভ্যগণের হস্তে ন্যস্ত হইতে পারিবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই মন্তব্য প্রকাশিত হইলে, দেশে ঘোর আপত্তি উঠিল। কেহ কেহ বলিলেন যে কমিটি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট উদার নহে। অপর কেহ কেহ আপত্তি করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য অনুযায়ী কার্য্য হইলে দেশীয়দিগের স্বার্থে ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য কারিসভার অন্যতম সদস্য সার সংকরণ নেয়ার উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছিলেন ও লোকে তাঁহার প্রতিবাদের প্রশংসা করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বর্ষের প্রারম্ভে, ভারতবর্ষে যে কয়টি রাজনৈতিক দল আছে তাহারা সকলেই নিজ নিজ মত যাহাতে গৃহীত হয় সেই উদ্দেশ্যে বিলাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। এই প্রতিনিধিগণের মধ্যে মধ্যমপন্থীদলের ও কন্‌গ্রেশের প্রতিনিধিগণই প্রধান ছিলেন। তাহারা প্রত্যেকেই মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড প্রণীত মূল প্রস্তাবের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। মধ্যমপন্থীদলের প্রতিনিধিগণ মোটের উপর সংশোধিত প্রস্তাব প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অনুমোদন করিলেন, তবে কোন কোন বিষয়ে আরও অধিক উদার নীতির পরিচায়ক কয়েকটী পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু চরমপন্থী দলের প্রতিনিধিগণ এরূপ মৌলিক পরিবর্ত্তন প্রার্থনা করিলেন, যদ্দ্বারা আইনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে, ও উভয় প্রস্তাবের মধ্যে এতদূর পার্থক্য ঘটিবে যে ইহা একেবারে নূতন আইন হইয়া দাঁড়াইবে। তবে একটি বিষয়ে সকল প্রতিনিধি একমত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই প্রার্থনা করেন যে প্রাদেশিক

গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে যেমন কার্য্যকারি সভা ও মন্ত্রীসভা দুই দলের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করা হইতেছে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে ও সেইরূপ দুই দলের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু এই একটি বিষয় ছাড়া প্রায় আর কোন বিষয়েই প্রতিনিধি গণের মধ্যে মতের মিল ছিল না।

সংস্কার প্রস্তাব গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয় ও উহা জুলাই মাসের প্রারম্ভে ভারত সচিব কর্ত্তৃক কমন্স মহাসভায় প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইনে কেবল স্থূল বিষয় গুলি সম্বলিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় গুলি নিয়ম বিধানের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত করণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে ১৯০৫ সালে একটি আইন পাশ করা হইয়াছিল, নূতন আইনে কেবল পূর্ব্বের আইন যে যে অংশে পরিবর্ত্তন করা হইতেছে তাহাই সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই আইন সম্বন্ধে সাধারণে যে সব মত প্রদান করিয়াছিল তাহার আলোকের সাহায্যে আইন বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। কমন্স ও লর্ডস্ মহাসভা দ্বয়ের সভ্যদিগের মধ্য হইতে কয়েক জনকে নির্ব্বাচিত করিয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছিল ও লর্ড সেলবোর্ণ এই কমিটির সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। এই কমিটি সত্তরটি ব্যক্তির মত গ্রহণ করিয়াছিলেন ও এই সত্তর জন সাক্ষীর মধ্যে সকল দলের লোকই ছিলেন। কমিটি অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন ও এই সব পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়া আইনে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল। কমিটি কর্ত্তৃক সংশোধন গুলি পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল।

কমিটির সভ্যগণের মতে, প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন কার্য্যে পরিণত হইলে, ভারত সচিবের দায়িত্ব যে অংশে লাঘব হইবে তদ্ব্যতীত অন্যান্য অংশে পার্লামেণ্ট মহাসভার নিকট তাঁহার দায়িত্ব এখন যেমন আছে তেমনি থাকা উচিত। ১৯১৭ সালে ২৭ এ আগষ্ট তারিখে কমন্স সভায় ভারত সচিব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে আইন বিশেষ উপযোগী হইবে কমিটির ইহাই বিশ্বাস। কমিটি অনুরোধ করেন যে মন্ত্রীদিগের হস্তে যে যে বিভাগের ভার অর্পিত হইবে সে সব বিষয়ে যেন তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় ও মন্ত্রী গণের সহিত কার্য্যকারি সভার সভ্যগণের মধ্যে মধ্যে পরামর্শ করা উচিত। প্রাদেশিক আয় কি পরিমাণে কোন জেলায় কতদেওয়া হইবে, সে বিষয়ে কমিটি বিশেষ বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে উভয় দল যদি সুবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হন তাহাহইলে আর বণ্টন লইয়া বিবাদ, বিতণ্ডার সম্ভাবনা অল্পই হইবে, তবে অবস্থা বিশেষে যে এরূপ বিতণ্ডা একেবারেই হইবেনা, এরূপ বলা যায় না। সেই জন্য আয় বণ্টন সম্বন্ধে

এখন নিয়ম করিতে হইবে যাহাতে বিতণ্ডার সম্ভাবনা না হইতে পারে। এই জন্য তাঁহারা পরামর্শ দেন যে যদি গবর্ণর প্রথম বর্ষে কিম্বা তাহার পরে কোন বর্ষে আয় ব্যয় তালিকা প্রস্তুত করিতে দেখেন যে উভয় দলে বহুদিনব্যাপী বিতর্ক হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাহইলে তিনি উভয় দলের মধ্যে আয় বণ্টন করিয়া দিবেন ও তাহা এই ব্যবস্থাপক সভা যতদিন জীবিত থাকিবে, তত্দিন বাহাল থাকিবে। গবর্ণর কতকগুলি বিষয়ে গৃহীত রাজস্ব একদলকে দিবেন ও অবশিষ্ট বিষয়ে গৃহীত রাজস্ব অন্যদলকে দিবেন, এপ্রস্তাব কমিটি অনুমোদন করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে গৃহীত রাজস্বের এবং উদ্বর্ত্তের কতক অংশ এক দলকে ও অবশিষ্টাংশ অন্য দলকে দেওয়া বিধেয় বোধ করেন। আর এই বণ্টনের জন্য যদি গবর্ণর কাহারও সাহায্য আবশ্যক বোধ করেন তাহাহইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন, তিনি যেমন বণ্টন করিবেন গবর্ণর ইচ্ছা করিলে তাহাই গ্রাহ্য করিতে পারিবেন। কমিটি আরও প্রস্তাব করেন যে যতদিন না উভয় দলে এই আয় বণ্টন বিষয় সম্বন্ধে একটা চুক্তি হয়, কিম্বা গবর্ণর আয় বণ্টনের কোন ব্যবস্থা না করেন, ততদিন গত বর্ষে ব্যয় সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই বাহাল থাকিবে।

জএণ্ট কমিটি সাউথবরোকমিটির প্রস্তাব গুলি মোটের উপর অনুমোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে কতকগুলি সূক্ষ্ম বিষয়ে পুনর্বিবেচনা আবশ্যক, যেমন স্থান বিশেষে ভোটারের সংখ্যা, সহরের ও মফস্বলের সদস্য সংখ্যা, জমীদার, পণ্ডিত জাতি, অব্রাহ্মণ, মাহাট্টা ও বাঙ্গালার ইউরোপীয় সমাজ কর্ত্তৃক সভ্য নির্বাচন।

প্রথমে আইনের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে গ্র্যাণ্ড কমিটি নিয়োগের কথাছিল। জয়েণ্ট কমিটির মতে এই গ্র্যাণ্ড কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থা দ্বারা গবর্ণরের বিশেষ সাহায্য হইবেনা ও উভয় দলে আরও মনোমালিন্য ঘটিবার সম্ভাবনা হইবে। তজ্জন্য তাঁহারা এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। তাঁহাদিগের মতে ইহা খুলিয়া বলা ভাল, যে গবর্ণর ও তাঁহার সদস্য গণেরই উপর দায়িত্ব ন্যস্ত আছে ও পার্লামেণ্টের নিকট তাঁহারা এই দায়িত্ব পালনে যাহাতে সমর্থ হন, তজ্জন্য একটি আইন পাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহাকে দেওয়া উচিত। যদি তাঁহার ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক এই আইন পাশ করাইতে না পারেন, তাহাহইলে নিজের উপর দায়িত্ব লইয়া এই আইন পাস করিবেন, কিন্তু গবর্ণরের নিজের দায়িত্বে যে আইন পাস হইবে তাহা গবর্ণরজেনেরল কর্ত্তৃক ভারত সম্রাটের দ্বারা অনুমোদিত করাইতে হইবে ও উক্ত আইনের লিপি পার্লামেণ্ট মহাসভার সম্মুখে স্থাপিত করিতে হইবে। অবশ্য সম্রাটের অনুমোদন ভারত সচিবের পরামর্শ অনুযায়ী হইবে, কিন্তু যখন পার্লামেণ্টের কয়েকটী সভ্য লইয়া একটি ষ্ট্যাণ্ডিং

কমিটি ভারত শাসন সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে, এই সব আইন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ও মত লওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে। তবে যদি আইন এত শীঘ্র পাস করা আবশ্যক বোধ হয় যে সম্রাটের অনুমতি লইবার সময় না থাকে তাহাহইলে গবর্ণরজেনেরাল নিজেই উক্ত আইন মঞ্জুর করিতে পারিবেন। কিন্তু এরূপ অবস্থার পরে উক্ত আইন সম্রাটের আদেশে নামঞ্জুর হইতে পারিবে।

জএণ্ট কমিটি আরও প্রস্তাব করেন যে গোড়া হইতেই কাউন্সিল অফ ষ্টেটকে একটী দ্বিতীয় ব্যবস্থাপক সভারূপে পুনর্গঠিত করিতে হইবে ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদের জন্য প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাদিগের বেসরকারী সভ্যদিগকে নির্ব্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া উচিত হইবেনা। এ বিষয়ে ভোট সংক্রান্ত কমিটির প্রস্তাব তাঁহারা অগ্রাহ্য করেন ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মতের পোষকতা করেন। বিলাতী গবর্ণমেণ্টের সহিত, ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট গুলির কি সম্বন্ধ হইবে, ও ভারত সচিবের সহিত তাঁহার সদস্যগণের কি সম্বন্ধ হইবে, এ বিষয়েও জএণ্ট কমিটি কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে লর্ড ক্রু প্রমুখ একটি কমিটি তদন্ত করিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের মন্তব্য জএণ্ট কমিটি দেখিতে পাইয়াছিলেন। লর্ড ক্রুর প্রস্তাবগুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল।

(১) যদ্যপি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারি সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি কোন আইনের পোষকতা করেন, তাহাহইলে যদি ভারত সচিব বিবেচনা করেন যে ভারতবর্ষে শান্তি রক্ষার জন্য পার্লামেণ্টের নিকট তাঁহার যে দায়িত্ব আছে তজ্জন্য অথবা সাম্রাজ্যের রাজনীতি অনুসরণের জন্য উক্ত আইন ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক পুনর্বিবেচিত হওয়া উচিত, তাহাহইলে তিনি উক্ত আইন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(২) যদ্যপি কোন বিষয়ে কোন কারণে ভারত সচিবের মত আবশ্যক হয়, তাহাহইলে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্কের পর কোন বিষয়ে যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও সভার অধিকাংশ বেসরকারি সভ্য একমত হন, তাহাহইলে উক্ত মীমাংসা, আইন সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে যেরূপ বলবান হইয়া থাকে, সেই রূপই হইবে।

(৩) ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উপর ভারত সচিব নিজের দায়িত্ব যে পরিমাণে ন্যস্ত করিবেন, তাহার ভিত্তি হইবে এই যে পূর্ব্বে যে সব বিষয়ে ভারত সচিব ও তাঁহার সদস্যগণের পূর্ব্বাহ্লে অনুমোদন আবশ্যক হইত, এক্ষণে সে সব বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ভারত সচিব উভয়ের পরস্পরের সহিত পরামর্শ আবশ্যক হইবে। তবে ভারত সচিব কি কি বিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার সহিত পূর্ব্বাহ্লে পরামর্শ করা বিধেয় বোধ করিবেন, তাহার তালিকা মধ্যে মধ্যে সংশোধন করিবেন ও তাহা ভারতবর্ষীয়

গবর্ণমেণ্টকে অবগত করাইবেন। লর্ড ক্রুর কমিটি কর্ত্তৃক আরও প্রস্তাব হইয়াছিল যে এক্ষণে ভারতসচিব ও তাঁহার সদস্যগণের হস্তে যে ক্ষমতা আছে তাহা কেবল মাত্র ভারত-সচিবের উপরই অর্পিত হইবে ও ভারতসচিবের একটি পরামর্শ করিবার জন্য কমিটি নিযুক্ত হইবে, ও কোন বিষয়ে ইচ্ছা করিলে, ভারতসচিব এই কমিটির সহিত পরামর্শ করিতে পারিবেন। এই কমিটির সভ্য সংখ্যা বার জনের অধিক হইবে না, ও ছয় জনের কম হইবে না ও সভ্যগণকে ভারতসচিব নিযুক্ত করিবেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষের অধিবাসী হইবেন। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারি সদস্যগণ একটী নামের তালিকা প্রস্তুত করিবেন ও সেই তালিকা হইতে ভারতসচিব পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণকে মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন। সভ্যগণের বেতন হইবে বার্ষিক বারশত পাউণ্ড, তবে ভারতবাসী সভ্যগণ বার্ষিক আরও ছয়শত পাউণ্ড অধিক পাইবেন। অতঃপর ভারত-সচিবের বর্ত্তমান সভার অস্তিত্ব লোপ হইবে ও তাহার স্থলে পরামর্শদাতা সভা স্থাপিত হইবে। লর্ড ক্রুর কমিটি আরও প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষের জন্য বিলাতে একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত হইবেন, তাঁহার কার্য্য হইবে এদেশের জন্য বিলাতে মাল খরিদ করা, যথা রেলওয়ের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি। ভারত সচিবের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত এদেশীয় রাজ পুরুষগণের চাকুরি বদল করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, কমিটী তাহার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। আর ভারত শাসন সম্বন্ধে, পর্য্যবেক্ষণ ও পরামর্শ দিবার জন্য কমন্স সভার সভ্যদিগের মধ্যে যে একটী সিলেক্ট কমিটী নিয়োগ করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, লর্ড ক্রুর কমিটী তাহারও বিপক্ষে মত দিলেন। কমিটী কিন্তু প্রস্তাব করেন যে ভারতসচিবের আফিসের রাজনীতি ও শাসন সংক্রান্ত বিভাগগুলির খরচা বিলাতের রাজস্ব হইতে বরাদ্দ করা উচিত, তবে হাই কমিশনারের দরুণ যে খরচা হইবে তাহা ভারতের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে।

ভারত সচিবের সদস্যগণের বেতন ও চাকুরির সর্ত্ত সম্বন্ধে ক্রু কমিটি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, জএণ্ট কমিটি তাহার অনুমোদন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিয়োগ ও বর্ত্তমান ভারতসচিবের সভার পরিবর্ত্তে একটি কেবল পরামর্শ দাতা সভার স্থাপনা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, জএণ্ট কমিটি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহারা ভারত সচিবের সভার সভ্যগণকে এক এক বিভাগের ভার অর্পণ করিবার প্রস্তাবের কিন্তু আপত্তি করিলেন না। তবে ভারতবর্ষীয় সভ্য সংখ্যা বাড়াইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। জএণ্ট কমিটি হাই কমিশনার নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

ভারত সচিব ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট দিগের কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে, তদ্বিষয়ে কমিটি এই মত দেন যে প্রাদেশিক বিষয় সম্বন্ধে যে

গুলির ভার কার্য্যকারি সভার হস্তে থাকিবে যদি সেই সব বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা একমত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে এইরূপ বিষয়ের মধ্যে কতক গুলির সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উদাসীন থাকিতে পারেন না। তবে যে সব বিভাগ প্রাদেশিক মন্ত্রীগণের হস্তে ন্যস্ত হইবে, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ভারতসচিব অতি সংকীর্ণ পরিমাণে হস্তক্ষেপ করিবেন ও এ সম্বন্ধে আইনের মধ্যে কতকগুলি নিয়ম করা হইবে।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারি সভার সদস্যগণের মধ্যে তিন জন এদেশীয় হইবেন, জএণ্ট কমিটি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষে আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক স্থাপনা ভারতসচিবের আদেশানুযায়ী ও বিলাতস্থ বণিকদিগের স্বার্থেই হইয়া থাকে, এই অন্যায় ধারণা ভারতবাসি দিগের মন হইতে দূর করিবার জন্য ভারতসচিবের সহিত এইরূপ বন্দবস্ত করিতে হইবে যে শুল্ক স্থাপনা সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবে যদি এদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপক সভা একমত হন, তাহা হইলে তিনি আর সে বিষয়ে আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। তবে বিলাতের গবর্ণমেণ্ট যদি কোন শুল্ক সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত ইতিপূর্ব্বে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহাতে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকে কেবল তাহা সিদ্ধ করণের জন্যই তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। কমিটি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে দশবৎসর অতিবাহিত হইলে ভারতবাসি দিগকে প্রদত্ত ক্ষমতা আরও কিরূপে ও কোন দিকে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তাহার তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে হইবে ও এই দশ বৎসরের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হইবে না। তাঁহাদিগের আর একটি প্রস্তাব ছিল যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিকে গবর্ণর জেনেরাল নিযুক্ত করিবেন ও এমন লোককে নিযুক্ত করিবেন, যাঁহার কমন্স সভার কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহাদিগের মতে যদি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সভাপতিদিগের পদের জন্যও এইরূপ যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইবে। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সহকারি সভাপতি প্রথম হইতেই নির্ব্বাচিত হইবেন ও সভাপতিগণও চারি বৎসর পরে নির্ব্বাচিত হইবেন। তাঁহারা আরও প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয় তালিকা ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাই বিচার ও মঞ্জুর করিবেন। তাঁহাদিগের মতে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই নির্ব্বাচন ব্যাপারে কতকগুলি অপকর্ম্ম যাহাতে আচরিত হইতে না পারে সেই বিষয়ে আইন করা কর্ত্তব্য। কমিটি

আরও একটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহা এই যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের উচিত এমন বন্দোবস্ত করা যাহা দ্বারা তাঁহাদিগের মত বা সংকল্প জন সাধারণকে জানান যাইতে পারিবে। অনেক সময় লোকে প্রকৃত ঘটনা ও সত্যকথা না জানার দরুণ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকেন।

জএণ্ট কমিটির মন্তব্য পার্লামেণ্টের সমক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন গুলি কার্য্যে পরিণত হইলে ১৯১৯ সালে ডিসেম্বর মাসে আইন পাস হয়। বিলাতের পার্লামেণ্ট মহা সভার সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এরূপ বৃহৎ ব্যাপার কখন ঘটে নাই। সেইজন্য এই আইনের কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

প্রথমতঃ, ভারতবাসিগণকে তাহাদিগের দেশের শাসন কার্য্যে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইবে ও ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন অংশীদারের পদে উন্নীত করা হইবে এই উদারনীতি পার্লামেণ্টে যে ঘোষিত হইয়াছিল, এই আইন সেই রাজনীতির সম্পূর্ণ সমর্থন করিল। রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিভাগে ভারতবর্ষীয়গণকে অধিক সংখ্যায় ও উচ্চতরপদে নিযুক্ত করা আবশ্যক ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগণকে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রভাব হইতে যতটা সম্ভব স্বাধীন করিতে হইবে, একথা ও আইন দ্বারা সমর্থিত হইল। আইনের ভূমিকায় প্রকাশ ছিল যে উন্নতি ক্রমে ক্রমে সম্ভব হইবে, ও কখন কি পরিমাণে উন্নতি হওয়া উচিত, তাহার বিচার কেবল একমাত্র পার্লামেণ্ট মহাসভাই করিতে পারিবেন ও ভারতবাসিগণকে নূতন যে সুবিধা দেওয়া হইতেছে, তাহারা কতদূর তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে, তাহা দেখিয়াই সেই পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে। আইনের প্রথম অংশে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার কি কি কর্ত্তব্য ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার কি কি কর্ত্তব্য ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা কি কি করিবেন ইত্যাদি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাদেশিক বিষয়গুলির মধ্যে কার্য্যকারি সভার সদস্যগণের হস্তেই বা কি কি বিভাগ অর্পিত হইবে ও মন্ত্রীগণের হস্তেই বা কোন কোন বিভাগের ভার দেওয়া হইবে, এসবও উল্লিখিত আছে। বাঙ্গালা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসাম এই প্রত্যেক প্রদেশেই একজন গবর্ণর ও তাঁহার কার্য্যকারি সভা নিযুক্ত হইবে। এক্ষণে যে নিয়মে গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া থাকে, সেই নিয়মই বাহাল থাকিবে তবে শেষে যে পাঁচটী প্রদেশের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদিগের জন্য গবর্ণর নিযুক্ত করিতে হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে।

প্রত্যেক গবর্ণরেরই একটি করিয়া কার্য্যকারি সভা থাকিবে, ও তাঁহাদিগের হস্তে কতকগুলি বিভাগ ও দেশীয় মন্ত্রীগণের হস্তে অবশিষ্ট বিভাগের ভার দেওয়া হইবে। এই মন্ত্রীগণ ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন। গবর্ণর ইচ্ছা করিলে ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারি সদস্যগণের মধ্য হইতে সেক্রেটারি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তাঁহাদিগের চাকুরির মেয়াদ গবর্ণরের ইচ্ছামত ধার্য্য হইবে। তাঁহারা কার্য্যকারি সভার সদস্যগণকে ও মন্ত্রীগণকে সাহায্য করিবেন। কার্য্যকারি সভার সদস্যগণের মধ্যে একজন এমন লোক হইবেন, যিনি দ্বাদশবর্ষ এদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবেন, কার্য্যকারি সভার সদস্যগণ ও নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্যগণ ও তাহাদিগের সংখ্যা আইন সংক্রান্ত তালিকার মধ্যে নির্দিষ্ট থাকিবে। সাধারণতঃ ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মেয়াদ তিন বৎসরের জন্য হইবে। গবর্ণর এই সভার সভাপতি হইবেন না, তবে ইচ্ছা করিলে সভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন। সভাপতি চারিবৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন ও গবর্ণরই তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন। প্রথমবারের পর সভাপতি ও প্রথম হইতেই সহকারি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। প্রদেশের আনুমানিক আয় ব্যয় তালিকা প্রতিবৎসর সভার সমক্ষে স্থাপিত করিতে হইবে ও কতকগুলি বিষয় ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে ভোটের দ্বারা ব্যয় মঞ্জুর করা হইবে। তবে যদি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন যে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালনের জন্য কার্য্যকারি সভার হস্তে ন্যস্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন রকম ব্যয় আবশ্যক তাহা হইলে উক্ত ব্যয় ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইবেন।

যখন কোন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক কোন আইন পাস হইবে তখন গবর্ণর যদি ইচ্ছা করেন, উক্ত আইনে সম্মতি দিতে পারেন, কিন্তু যদি তিনি সম্মতি দান করিতে ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে তিনি আইন পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভাকে উহা ফিরাইয়া দিতে পারিবেন। তিনি যে পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন তাহা সভা বিবেচনা করিবেন। অথবা গবর্ণর উক্ত আইন গবর্ণর জেনেরালের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। যগুপি কার্য্যকারি সভার সদস্য গণের হস্তে ন্যস্ত কোন বিষয় সম্বন্ধে গবর্ণর কোন আইন পাশ করাইতে চাহেন ও ব্যবস্থাপক সভা উক্ত আইনের পাণ্ডু লিপি প্রবর্ত্তিত করণের অনুমতি দিতে কিম্বা উহা পাস করিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে গবর্ণর যদি বলেন যে তাঁহার কর্ত্তব্য পালনের জন্য উক্ত আইন পাস করা অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা হইলে তিনি স্বাক্ষর করিলেই উক্ত আইন পাস হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। গবর্ণর তখন উক্ত আইনের একখণ্ড নকল গবর্ণর জেনেরালের নিকট প্রেরণ করিবেন

ও গবর্ণর জেনেরাল উহা সম্রাটের মতের জন্য প্রেরণ করিবেন। সম্রাটের সম্মতি প্রাপ্ত হইলে তাহা প্রকাশ করিবেন ও তখন আইন মঞ্জুর হইবে। কিন্তু এই ধরণের আইন পার্লামেণ্ট মহা সভার সমক্ষে আট দিন রাখিতে হইবে ও পরে সম্রাটের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইবে।

আইনে মকর্দ্দমা নিবারণের উদ্দেশ্যে এই নিয়ম করা হইয়াছে যথা—

১৬ (২) এই আইনের পঁয় ষষ্টি ধারায় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার উপর যে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা অক্ষুন্ন থাকিবে ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক যে আইন পাস হইয়াছে, তাহা প্রাদেশিক বিষয় সম্বন্ধীয় অথবা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা যে আইন পাস করিয়াছেন তাহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন বিষয় সম্বন্ধীয়, এই হেতু উক্ত আইন, কোন মকর্দ্দমায় অগ্রাহ্য হইবেনা। যদি গবর্ণর কোন আইন করেন তাহা হইলে উহা কার্য্যকারি সভার অধীন কোন বিষয় সম্বন্ধীয় এই হেতু কোন আপত্তি করিতে পারা যাইবেনা।

(৩) যদি গবর্ণর ও তাঁহার কার্য্যকারি সভা কোন ব্যবস্থা করিয়া থাকেন বা হুকুম দিয়া থাকেন তাহা হইলে কোন মকর্দ্দমা উপলক্ষে তাঁহাদিগের কার্য্য উক্ত বিষয়টি মন্ত্রী দলের অধীন কোন বিষয় সম্বন্ধীয় বলিয়া বেআইনি হইবে না, অথবা উক্ত বিষয়ের ভার কোন মন্ত্রীকে দেওয়া হয় নাই বলিয়া ও বেআইনি হইবেনা।

আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট, ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কাউন্সিল অফ্ ষ্টেটের কথা আছে। এই কাউন্সিলের গঠন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে।• আইনে কেবল সভ্য সংখ্যা কত গুলি হইবে ও তাহাদিগের মধ্যে রাজপুরুষ কয় জন থাকিবেন ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধে ও সভ্য সংখ্যা ও তাঁহাদিগের মধ্যে কয় জন সরকারি সভ্য হইবেন, ঠিক করা হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ইহার গঠন, আইনানুযায়ী যে নিয়মাবলি করা হইবে তাহা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি গবর্ণর জেনেরাল কর্ত্তৃক চারি বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। পরে তিনি নির্ব্বাচিত হইবেন। সহকারি সভাপতি কিন্তু প্রথম হইতেই নির্ব্বাচিত হইবেন। কাউন্সিল অফ ষ্টেটের সভ্যগণ পাঁচ বৎসরের জন্য ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ তিন বৎসরের জন্য বাহাল থাকিবেন। আইন অনুসারে যে নিয়মাবলী প্রস্তুত হইবে, তদ্দ্বারা নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হইবে ও কি প্রণালীতে ব্যবস্থাপক সভায় ও কাউন্সিল অফ ষ্টেটে কার্য্য করা হইবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইবে। বার্ষিক আয় ব্যয় তালিকা সম্বন্ধে কাউন্সিল অফ ষ্টেট ভোট দিতে পারিবেন কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক কোন প্রস্তাব অনুমোদিত না হইলে ও গবর্ণর জেনেরালের

উক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। তবে কতকগুলি বিষয়ে যে রাজস্ব সংগৃহীত হইয়া থাকে তাহার ব্যয় সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার উপর আর ব্যবস্থাপক সভা কোন মত প্রকাশ করিতে পারিবেন না। এমন কি ব্যবস্থাপক সভা যদি কোন খরচ মঞ্জুর না করেন তাহা হইলে ও আবশ্যক বোধে গবর্ণর জেনেরালের হুকুমেই উহা মঞ্জুর হইবে।

যদ্যপি ব্যবস্থাপক সভা অথবা কাউন্সিল অফ ষ্টেট কোন আইনের প্রস্তাব সভায় কিম্বা কাউন্সিলে প্রবর্ত্তিত করিতে অনুমতি দানে অস্বীকৃত হন কিম্বা কোন আইন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মতানুযায়ী পাশ করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধে যাহা নিয়ম করা হইয়াছে, সেই নিয়ম মত গবর্ণর জেনেরাল কার্য্য করিবেন। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের মধ্য হইতে সেক্রে-টারি নিযুক্ত করিবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণরগণকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, গবর্ণর জেনেরাল ও সেইরূপ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মধ্য হইতে সেক্রেটারি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতসচিব ও তাঁহার সদস্যগণের কথা আছে। ভারত সচিব ও তাঁহার সদস্য ও কর্ম্মচারিগণের বেতন বিলাতের রাজস্ব হইতে দেওয়া হইবে ও সভা বজায় থাকিবে। সদস্যদিগের সংখ্যা বার জনের অধিক ও আট জনের কম হইবেনা। অর্দ্ধেক সদস্যগণ এরূপব্যক্তি হইবেন যাঁহারা দশ বৎসর ভারতবর্ষে চাকরি করিয়াছেন অথবা বাস করিয়াছেন ও পাঁচবৎসরের অধিককাল ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন নাই। সদস্যদিগের চাকরির মেয়াদ পাঁচ বৎসর ও বেতন বার্ষিক বারশত পাউণ্ড কিন্তু ভারতবর্ষীয় সদস্যগণ আরও অধিক বার্ষিক ছয়শত পাউণ্ড পাইবেন, কেননা তাঁহাদিগকে দেশ ছাড়িয়া থাকিতে হইবে। পঁয়ত্রিশ ধারা মতে বিলাতে একজন ভারতবর্ষের জন্য হাই কমিশনার নিযুক্ত হইবেন, কিন্তু তাঁহার বেতন, ক্ষমতা, কার্য্য ইত্যাদি পরে স্থির করা হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সিবিল কর্ম্মচারিগণের কথা আছে। তাঁহারা প্রত্যেকেই সম্রাটের ইচ্ছামত চাকরি ভোগ করিবেন ও এক কর্ম্ম হইতে অন্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে যিনি চাকরি দিয়াছেন তাঁহা অপেক্ষা নিম্নপদস্থ কেহ তাঁহাদিগকে জবাব দিতে পারিবেন না। তবে যিনি ভারতসচিব কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার যদি কিছু নালিস করিবার থাকে, তাহা হইলে তিনি গবর্ণর জেনেরালের নিকট তাহা নিবেদন করিতে পারিবেন এবং তাহা করিলে তাঁহার প্রতীকারের অন্য যাহা কিছু উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

সিবিল বিভাগস্থ কর্ম্মচারিগণের সম্বন্ধে ভারতসচিবের ও নিয়ম করিবার ক্ষমতা থাকিবে। সিবিল কর্ম্মচারিগণের নিয়োগ ও চাক্‌রির সর্ত্ত সম্বন্ধে পাঁচ বৎসরের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হইবেন ও ভারত সচিব তাঁহাদিগকে যে ক্ষমতা দিবেন তাহা তাঁহারা ব্যবহার করিবেন। পূর্ব্বে যে যে পদে, কেবল মাত্র সিবিলিয়ান নিযুক্ত করিতে হইত, এক্ষণে সেই তালিকা সংশোধিত হইয়াছে ও অতঃপর অণ্ডার সেক্রেটারির পদের জন্য সিবিলিয়ান নিযুক্ত করিতে হইবে না।

শিক্ষাবিভাগ, পররাষ্ট্রবিভাগ ও বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারি, সহযোগী সেক্রেটারি ও ডেপুটি সেক্রেটারির পদে কেবল সিবিলিয়ানই নিযুক্ত করিতে হইবে, এই নিয়ম উঠিয়া গেল। অতঃপর ব্যবস্থাপক বিভাগের সেক্রেটারির কিম্বা ডেপুটি সেক্রেটারির পদের জন্য সিবিলিয়ান নিযুক্ত করিতে হইবে না। একাউণ্টাণ্ট জেনেরাল দিগের মধ্যে কেবল তিন জন মাত্র সিবিলিয়ান হইবেন।

আইনের পঞ্চম অধ্যায়ে দশবৎসর পরে পার্লামেণ্ট মহাসভার সম্মতি ক্রমে এক কমিশন নিযুক্ত করিবার কথা আছে। এই কমিশন নূতন সংস্কার আইনের দ্বারা কিরূপ কার্য্য হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিবেন, ও এদেশীয়দিগের হস্তে কোন কোনদিকে আরও অধিক ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে তদ্বিষয়ে মত প্রকাশ করিবেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য যে কোন বিষয়ে কমিশনকে তদন্তের জন্য অর্পণ করা হইবে, সে সব বিষয়েও মত প্রকাশ করিবেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সম্রাটের অনুজ্ঞার বিষয় আছে। এই অনুজ্ঞা ভারত সচিবকে দিয়া ব্যক্ত করা হইবে।

ডিসেম্বর মাসের ২৩এ তারিখে এই আইন সম্রাটের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। সেই সময় সম্রাট একখানি ঘোষণা পত্র প্রচার করেন, যাহাতে এই আইনের ইতিহাস উল্লেখ করিয়া, তিনি আশা করেন যে যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রবর্ত্তিত হইতেছে তাহা যেন সিদ্ধ হয়। তিনি বলেন এক্ষণে ভারতবাসিগণকে তাঁহার এই আশায় যোগদান করিবার জন্য তিনি সাদরে আহ্বান করিতেছেন। ঘোষণাপত্রে সম্রাট আরও প্রকাশ করিলেন যে যেদিন হইতে ভারতের মঙ্গল ইংলণ্ডীয় রাজ পরিবারের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে তাঁহারা এই কর্ত্তব্যটি পবিত্রভাবে বিবেচনা ও বংশানুক্রমে ভারতের মঙ্গলের জন্য নানাপ্রকার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার করিয়া আসিতেছেন। ঘোষণাপত্রে পার্লামেণ্ট মহাসভা, ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ ও সম্রাটের ভারতে নিযুক্ত রাজপুরুষগণের যথেষ্ট ধন্যবাদ করা হয়, কেননা ভারতবাসিগণের মঙ্গল ও উন্নতিকল্পে তাঁহারা যথেষ্ট অনুরাগী ও যত্নবান হইয়া ছিলেন। সম্রাট আরও বলেন যে ভারতবাসিগণ অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য যে বিশেষ প্রয়াসী হইয়াছেন, সে বিষয় তিনি বিলক্ষণ অবগত

আছেন, ও সেই প্রয়াস ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে। সেই সম্বন্ধ হেতু ভারতবাসিগণ মানবজাতির চিন্তার ও ইতিহাসের গভীরতম তত্ত্বগুলির বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। যদি এই জ্ঞান না লাভ হইত, এই স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের ইচ্ছা ভারতবাসিদিগের অন্তঃকরণে উদিত না হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে যে গৌরব জনক কাজ করিয়াছেন তাহা অসম্পূর্ণ হইত। সুতরাং কিছুকাল হইল এদেশে যে শাসনের অধিকার প্রদানের বীজ রোপিত হইয়াছিল, তাহাতে সুবুদ্ধিরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল। এই শাসনাধিকারের প্রয়াস ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে ও এক্ষণে ভারতবাসিগণ সম্পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভের পথে অগ্রসর হইতে চলিলেন।

ভারতবাসিগণ কি পরিমাণে এই পথে অগ্রসর হন, সম্রাট তাহা মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে হইলে অনেক অন্তরায় যে অতিক্রম করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে মহামান্য সম্রাট ঘোষণাপত্রে বলিয়াছিলেন—"দেশের নায়কগণ ও ভবিষ্যতে যাঁহারা মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইবেন তাঁহারা যে দেশের মঙ্গলের জন্য দায়িত্ব গ্রহণে ও ক্ষতি স্বীকার করণে প্রস্তুত হইবেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা দলাদলির গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ নহে। ভবিষ্যতে যাঁহারা মন্ত্রিত্বলাভ করিবেন তাঁহারা একদিকে যেমন ব্যবস্থাপক সভায় জয়লাভ করিতে যত্নবান হইবেন, তেমনি যেন রাজপুরুষ দিগের সহিতও মিলিত হইয়া সদ্ভাব ও একতার সহিত কার্য্য করেন ও সামান্য বিষয় লইয়া মতভেদ উপস্থিত না করেন। রাজপুরুষগণকেও বলিতেছি যে তাঁহারা যেন তাঁহাদিগের দেশীয় সহযোগীগণের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করেন ও তাঁহাদিগের সহিত বন্ধুভাবে কাজ করেন, ও ভারতবাসিগণকে শাসন সংক্রান্ত অধিকার ক্রমে ক্রমে পূর্ণমাত্রায় লাভ করিতে সহায়তা করেন। আগের মত এখনও যেন তাঁহারা ভারতবাসিদিগের মঙ্গলের জন্য সেবা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রশংসা অর্জ্জন করিতে থাকেন।" পরিশেষে সম্রাট প্রচার করেন যে তিনি আশা করেন যে রাজপুরুষগণের ও অধিবাসিগণের মধ্যে যে বিদ্বেষ পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল, তাহার যেন চিহ্ন মুছিয়া যায় ও এই উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয় তজ্জন্য রাজনৈতিক অপরাধে যাহারা কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে কিম্বা যাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তিদানের আজ্ঞা প্রচার করিলেন। অনন্তর সম্রাট প্রকাশ করিলেন যে ভারতীয় দেশীয় রাজন্য বর্গের একটি কাউন্সিল গঠিত হইবে ও যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস শীতকালে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। সর্ব্বশেষে সম্রাট বলিলেন—"আমি জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে

যেন তাঁহা দ্বারা চালিত হইয়া ভারতবাসিগণ অধিক পরিমাণে সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করিতে ও ক্রমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে পারেন।"

দেশীয় রাজ্যদিগের সহিত ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই বটে কিন্তু তথাচ শেষোক্ত স্থানে শাসন সংক্রান্ত যে পরিবর্ত্তন হইতেছে দেশীয় রাজ্য সমূহে তাহার প্রভাব একেবারে পরিহার্য্য হইতে পারেনা। সুতরাং আলোচ্যবর্ষে কতক গুলি দেশীয় রাজ্যে যে যে ঘটনা হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। বরোদো, বিকানীর, মহীসুর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রজা প্রতিনিধি সভা ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে কর্পূরতলা রাজ্যেও এইরূপ একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল ও তাহার সভ্যগণের মধ্যে কয়েকজন ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। নবনগরে ও পরামর্শ দাতা একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে ও ডেওয়াস (কনিষ্ঠ শাখা) নাভা, এবং পাতিয়ালা রাজ্যেও এইরূপ সভা স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। হায়দরাবাদের নিজাম সম্প্রতি একটি কার্য্যকারি সভা স্থাপনা করিয়াছেন ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত সংস্কার প্রবর্ত্তনার জন্য বিবেচনা করিতেছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দেশীয় রাজন্য বর্গকে লইয়া একটি মন্ত্রণা সভা গঠিত হইবে ও ইহার সম্বন্ধে সম্রাট তাঁহার ঘোষণা পত্রে বলিয়াছেন যে তিনি আশা করেন যে ইহা স্থাপিত হইলে দেশীয় রাজাগণ এবং তাঁহাদিগের রাজ্যের চিরস্থায়ী মঙ্গল হইবে। যে যে বিষয়ে ইংরাজ শাসিত রাজ্যের ও দেশীয় রাজ্যদিগের স্বার্থ এক তাহার উন্নতি হইবে ও এমন কি সমগ্র সাম্রাজ্যের পক্ষেই শুভ ফল প্রসূত হইবে। এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে ১৯১৫ সালের আইনানুযায়ী দেশীয় রাজ্যের অধিবাসিগণ বিলাতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ও এ সম্বন্ধে তাহাদিগের সহিত ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের অধিবাসি গণের কোন প্রভেদ নাই।

১৯১৯ সালের প্রারম্ভে যুদ্ধে ইংলণ্ড বিজয়ী হইলেন, ইহার শেষে ভারতবর্ষে শাসন প্রণালী সংক্রান্ত সংস্কারের ও উন্নতির পত্তন হইল। ইংলণ্ডে এই যুদ্ধের পরিণামে নানা দিকে নানা রকম পরিবর্ত্তন হইল। ভারতবর্ষে শাসন সংক্রান্ত নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হওয়াতে এমন একটী মহৎ উদ্যম অনুষ্ঠিত হইল যাহার তুলনা আসিয়া মহাদেশের ইতিহাসে ইতি পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। বিদেশীয় দিগের শাসনে ভারতবর্ষে শাসন সংস্কার কিম্বা ভারতবর্ষীয় দিগের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ সম্ভব নহে, কেহ কেহ এই মত পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা যে ভ্রান্ত তাহা এক্ষণে প্রমাণ হইল। সম্রাটের সুমহান ঘোষণা পত্রে যে আশার কথা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা হইতে কেবল যে একটী জটিল প্রশ্নের সন্তোষ জনক সমস্যা হইয়াছে তাহা নহে। ইহা ভারতবাসিদিগের স্বাধীনতার ও স্বার্থরক্ষার সনন্দও বটে। ফলতঃ এই সনন্দে

যে উদারতারও মহান্ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, সেরূপ ইতি পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট হয় নাই। ইহা দ্বারা ভারত বাসিগণের রাজ ভক্তি আরও দৃঢ় ও সবল হইয়াছে।

এই ঘোষণা পত্র দ্বারা মধ্যমপন্থী দলের প্রভাব অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহারা এই ঘোষণা পত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদিগের স্বদেশীয় গণকে শাসন সংস্কার আইনের দ্বারা দেশের কত উপকার হইবে তাহা বুঝাইতে পারিবেন। তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে যদিও তাঁহাদিগের স্বদেশীয়গণ যে পরিমাণে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্ত হন নাই, তথাচ তাহার জন্য বিষণ্ণ কিম্বা নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই ও যাহাতে আইনের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহাদিগের সকলেরই আন্তরিক চেষ্টা করা বিধেয়। সত্যবটে চরমপন্থী দলকে এই আইনের দ্বারা বিশেষ সন্তুষ্ট করা যায় নাই। দিনের পর দিন কন্‌গ্রেস এই আইন সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করা উচিত ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কন্‌গ্রেস এআইন কোন কাজেরই নয় ও প্রতারণা মাত্র ইহাই বলিয়া উঠিয়া ছিলেন। কিন্তু পরে যে এই মত কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন দেখা গিয়াছিল।